Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

(Title)

‘ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’

(Women Politics in Islam: Bangladesh Perspective)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

তাজমুন নাহার বেগম
রেজি: নং- ২০১/২০১৭-১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

(Title)

‘ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’

(Women Politics in Islam: Bangladesh Perspective)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

তাজমুন নাহার বেগম
রেজি: নং- ২০১/২০১৭-১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ভাদ্র, ১৪২৮ বাংলা
আগস্ট, ২০২১ ইংরেজি
১৬/ডি/২, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে, **'ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** (Women Politics in Islam: Bangladesh Perspective) শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ এর সযত্ন ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন করি এবং অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে আমি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য বা প্রকাশের নিমিত্তে এই অভিসন্দর্ভ সম্পুর্ণ বা এর কোন অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

তাজমুন নাহার বেগম
রেজিঃ নং- ২০১/২০১৭-১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখঃ ভাদ্র, ১৪২৮ বাংলা
আগস্ট, ২০২১ ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, **'ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** (Women Politics in Islam: Bangladesh Perspective) শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি তাজমুন নাহার বেগম কর্তৃক রচিত একটি মৌলিক রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এই এম.ফিল গবেষক কর্তৃক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত হয়। এটি সম্পুর্ণরুপে এই গবেষকের একটি একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এই অভিসন্দর্ভটি সম্পুর্ণ কিংবা এর কোন কোন অংশবিশেষ কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের নিমিত্তে উপস্থাপন করা হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। গবেষক তাজমুন নাহার বেগম চমৎকার একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছেন বলে আমি মনে করি। উপস্থাপিত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, তা অন্য কোন ধর্ম ও সভ্যতা করেনি। অন্য অনেক বিষয়ের মতো রাজনৈতিক অধিকার চর্চার ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। ইসলামের সেই উদার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনুপস্থিত দেখতে পাই। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশ। এদেশে রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পিছিয়ে থাকলেও এখন অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম মানসে এ ব্যাপারে নানা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। বাংলাদেশে নারীর রাজনীতি, জনমানস, বাস্তব অবস্থা এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে **'ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'** (Women Politics in Islam: Bangladesh Perspective) শিরোনামে এম.ফিল অভিসন্দর্ভ রচনা করি। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অবশেষে এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শেষ করতে পেরেছি বলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার এম.ফিল গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন। তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধানের ফলে কাজটি সুন্দরমতো সমাপ্ত করতে পেরেছি। শ্রদ্ধেয় এই শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্থতাসহ দীর্ঘায়ু কামনা করছি। অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ শেষ হওয়ার আগে গত ১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং তারিখের প্রথম প্রহরে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাষ্টার সালিক আহমদ। তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন। যদি এম.ফিল ডিগ্রী লাভ করি, সবচেয়ে বেশি তিনি খুশি হতেন। আমার পিতাকে যেন আল্লাহ জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান করেন। এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সব সময় পাশে থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার স্বামী এহসানুল হক জসীম। তাঁর সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে এই কাজটি শেষ করা মুশকিল হয়ে যেতো। তাঁকে ধন্যবাদ।

এই গবেষণাকর্মটি যদি চলমান প্রেক্ষাপটে নারীর রাজনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখে তাহলে আমার কষ্ট ও শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

তাজমুন নাহার বেগম
তারিখ: ভাদ্র, ১৪২৮ বাংলা
আগস্ট, ২০২১ ইংরেজি

Dhaka University Institutional Repository

‘ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’

সূচীপত্র

ভূমিকা	**০৭-১০**
প্রথম অধ্যায়: ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর মূল্যায়ন	**১১-৪৫**
খ্রিস্টধর্মে নারী	১২
ইহুদী ধর্মে নারী	১৪
বৌদ্ধধর্মে নারী	১৯
হিন্দুধর্মে নারী	২০
গ্রীক সভ্যতায় নারী	২৪
রোমান সভ্যতায় নারী	২৭
মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় নারী	২৯
পারস্য সভ্যতায় নারী	৩১
মিশরীয় সভ্যতায় নারী	৩২
বৃটিশ সভ্যতায় নারী	৩৩
চীনা সভ্যতায় নারী	৩৫
ভারতীয় সভ্যতায় নারী	৩৬
জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থান	৩৮
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়: নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	**৪৬-১২০**
নারী নেতৃত্ব আসলেই কি হারাম?	৪৭
কুরআনে নারী নেতৃত্বের ইতিবাচক বর্ণনা	৪৮
নারী নেতৃত্ব হারাম সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল	৫২
বিশেষ প্রেক্ষাপটে নারী নেতৃত্ব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া	৫৫
নারী নেতৃত্ব আসলে কি ব্যর্থ হয়?	৫৮
পর্দা কি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায়?	৬০
পর্দা কী, পর্দার বিধান নাজিলের প্রেক্ষাপট	৬৩
মুখ ঢেকে রাখা কি ফরজ?	৬৮
হিজাব-নিকাব-বোরকার উৎপত্তি মুসলিম সমাজে নয়	৭৩
বাংলাদেশে বোরকা ও নিকাবের প্রচলন যেভাবে	৭৬
পর্দাপ্রথা ও অবরোধপ্রথা এক নয়	৮২
নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কী ও কেন?	৮৭
ইসলামে নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ভিন্নমত পোষণ	৯০
অন্যায়ের প্রতিবাদে নারীর অংশগ্রহণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	৯৪
খেলাফতের দায়িত্ব ও নারীর রাজনীতি	৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে সংসদে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ৯৬
রাজনীতিতে নারী-পুরুষের সমবেত অংশগ্রহণ কি বৈধ ১০১
শরীয়তের বিধানে নর-নারীর সমতা ১০৭
ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনীতি ও বহিঃস্থ কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ১০৮
মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান ১১২

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান ১২১-১৬২
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ১২১
নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অবস্থান ১২৪
রাজনৈতিক দলে নারীর প্রতিনিধিত্ব ১২৬
সংসদে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ ১২৮
একাদশ সংসদের সাধারণ আসনের নারী সদস্য ১২৯
প্রথম থেকে দশম সংসদের সাধারণ আসনের নারী সদস্য ১৩৭
সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ও বাস্তবতা ১৩৯
স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র ১৪৩
ইসলামী দলগুলোতে নারীর বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান ১৪৪
বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণ ১৪৭
বিভিন্ন আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীসমাজ ১৬১

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ১৬৩-১৯২
পরিবারের অনাগ্রহ ও চাপ ১৬৫
সাংসারিক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা ১৬৭
নারীর নিজেরও আগ্রহের ঘাটতি ১৬৯
দরিদ্রতা ১৭১
আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা ১৭২
পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পেশীশক্তির প্রভাব ১৭৪
ধর্মের অপব্যাখা, কট্টরপন্থা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ১৭৮
পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধ ১৮১
সহিংসতা ১৮২
আইনগত সীমাবদ্ধতা ১৮৫
পরিবারতন্ত্র ১৮৭
নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি ১৮৯
রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব ১৯১

সুপারিশমালা ১৯৩-২০১
কট্টর ধর্মীয় মনোভাব ও ধর্মীয় অপব্যাখা পরিহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ১৯৩
পাঠ্যপুস্তকে ও উচ্চশিক্ষায় নারী বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভূক্তি ১৯৪
নারীর উচ্চশিক্ষার উপর জোর দেওয়া ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে সরাসরি নির্বাচিত করিয়ে নিয়ে আসা ১৯৬
নারীর জন্য উপরাষ্ট্রপতি, ডেপুটি মেয়র ও ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা ১৯৭
নারীর জন্য দলে পদ সৃষ্টি করা ১৯৮
নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করা ১৯৮
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ১৯৯
ইসলামী দলগুলোকে কট্টরপন্থা পরিহার করতে হবে, নারীর জন্য জায়গা দিতে হবে ১৯৯
নারীকে তার মতো কাজ করতে দেওয়া, রাজনীতির জন্য চাপ সৃষ্টি না করা ২০০

উপসংহার ২০২-২০৪
গ্রন্থপঞ্জী ২০৫-২১১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১. প্রস্তাবনা (Introduction):

নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে এখন বেশ আলোচিত একটি ইস্যু। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব এই ইস্যুতে বেশ সোচ্চার। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নারীর অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, কালক্রমে এই অধিকার আরো বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে নারী হয়েছে আরো দুর্বল ও বৈষম্যের শিকার। রাসূল (সা.) এর সময় সমাজে নারীর অবস্থান যতটুকু দৃঢ়, স্বাধীন এবং সম্মানজনক ছিল; আজকের মুসলিম সমাজে সেটা লক্ষণীয় নয়। ইসলাম সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণার ফলে এমনটি হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে অনুসরণ না করার কারণে অন্যান্য সমস্যার মতো নারীরও অধিকার অনেক ক্ষেত্রে খর্ব হচ্ছে। আর এই কারণে কেউ কেউ বলতে সাহস পায় যে, ইসলামে নর-নারীর মাঝে সমতার বিধান করা হয়নি। আসলে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার, রাজনৈতিক অধিকারসহ সবক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্য কোনো ধর্ম বা সভ্যতায় নারীকে এমন মর্যাদা ও সমান অধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু ইসলাম প্রদত্ত নারীর সে অধিকার মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রেও অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারী তার অধিকার আদায়ে আজ অনেকটা সোচ্চার হয়েছে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছে। অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই; ইসলাম সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণা দুর করে কুরআন-হাদীস থেকে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে পাওয়া যাবে সমাধান।

২. উদ্দেশ্য (Purpose):

জ্ঞানের জগতে নতুন কিছুর সৃষ্টিই হচ্ছে গবেষণা। সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হচ্ছে গবেষণা। পুনঃ অনুসন্ধান, অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যবেক্ষণ ও বাড়তি জ্ঞান সংযোজনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে **'ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতিঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ'**- শীর্ষক গবেষণাকর্ম। রাজনীতিতে নারীর অবস্থান, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই গবেষণা। ইসলাম নারীকে যে রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে- মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নারীরা সে অধিকার কি ভোগ করছে? কতটুকু ভোগ করছে? নারীর ইসলাম স্বীকৃত বিভিন্ন অধিকার নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে জানা না থাকার কারণে অনেকে ইসলামের নামে অনেক অপবাদ আরোপ করে বসে, যার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এমন একটি বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ। সেই ভুলসমূহ অপনোদনের একটি চেষ্টা হচ্ছে এই গবেষণা। তাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে:

(ক) কুরআন-হাদীসের আলোকে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা ও বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি মূল্যায়ন করা;

(খ) নারী বাস্তবে কতটা সে অধিকার ভোগ করছে, তা তুলে ধরা। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর উন্নয়ন ও নারী ইস্যুতে তাদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন;

(গ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরা এবং সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনা করা;

(ঘ) রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী ও সমাজের লাভ-ক্ষতি তুলে ধরা;

(ঙ) কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা।

৩. পরিধি (Scope):

নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে গবেষণা হয়েছে এবং এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর রাজনৈতিক কার্য্যক্রম নিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি। জানামতে বর্ণিত শিরোনামে ইতোমধ্যে কোন গবেষণাকর্মও সম্পাদিত হয়নি। ফলে এমন একটি শিরোনামে গবেষণা গুরুত্বের দাবীদার। তাই গবেষণা পদ্ধতিসমূহের অনুসরণে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের উদাহরণ, বিভিন্ন যুগে মুসলিম নারীর রাজনীতিতে অনুপস্থিতির বিষয় ও তার কারণসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস হচ্ছে এই গবেষণা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান, নারী প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতির লাভ-ক্ষতি, দেশে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের নানা সীমাবদ্ধতা এবং সর্বোপরী নারীর রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে আলেম-উলামা ও দেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ গবেষণায়।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Research):

বাংলাদেশের নারীরা আজো অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্য আর অবহেলার শিকার। রাজনৈতিক অধিকার চর্চার দিক বিবেচনায় আজো তারা অনেক পিছিয়ে। দেশ, সমাজ, সভ্যতার অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং উন্নয়ন-অগ্রগতির

Dhaka University Institutional Repository

সংস্পর্শ নারীও পেয়েছে। তবুও অনেক ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধতা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কথা বেশি প্রযোজ্য। পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা ভীষণভাবে উপেক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে যেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এসব দিক বিচেনা করলে গবেষণাকর্মটির যৌক্তিকতার দাবীদার। নারী উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এই গবেষণাকর্মটি ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

৫. গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology):

'ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণধর্মী, চিন্তামূলক, বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। অন্যদিকে, আমাদের বর্তমান সমাজের যে কোন রীতি-নীতি, জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির মূল নিহিত রয়েছে অতীতে। সে অতীতের আলোচনা রয়েছে এই গবেষণাকর্মে। প্রাক ও প্রাথমিক ইসলামী যুগে নারীর অবস্থান, বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান ও মূল্যায়ন এবং বর্তমান সময়ে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী, চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক এই কারণে যে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ ও বর্ণনার পাশাপাশি উপলব্ধির আলোকে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানুষ ধর্মের অনুসরণ করে আসছে; আবার ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যাও করে আসছে। নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন-হাদীসের আলোকে এই গবেষণাতে বর্ণনা করা হয়েছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলাম নারীকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছে। সেই মর্যাদা, বিশেষ করে রাজনৈতিক মর্যাদা দানের বিষয়টি গভীর চিন্তার আলোকে বর্ণনা করা করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণধর্মী, চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক।

৬. উৎস (Sources):

অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা মৌলিক উৎস হিসেবে রয়েছে কুরআন ও হাদীস। ইন্টারনেটসহ এরকম বিভিন্ন সাইট থেকেও তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণা সম্পাদন করতে গিয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরী ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় বই এর সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও জার্নালে নারীর অধিকার ও রাজনৈতিক কার্য্যক্রম সংক্রান্ত কলাম, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনও দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে।

পাশাপাশি নারী সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময় যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা করে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন; সেসব অভিসন্দর্ভও দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে। এসব অভিসন্দর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত থাকার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও সাম্প্রতিক বছরগুলোর অনেকগুলো অভিসন্দর্ভ প্রদত্ত রয়েছে। এছাড়া ব্যবহৃত লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য লাইব্রেরী। গবেষণাটি সম্পাদন করতে যেসব গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, গ্রন্থপঞ্জীতে সেসব গ্রন্থের একটি তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

৭. সীমাবদ্ধতা (Limitations):

এ গবেষণা সম্মাদন করতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ থাকলেও এই গবেষণার জন্য সহযোগিতা নেওয়ার মতো বই তুলনামূলক কম। কারণ, ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে যেসব বই পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই নারীর আধ্যাত্মিক অধিকারের আলোচনায় ভরপুর আর রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল অবস্থান থেকে লেখা। ফলে বলা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি নিয়ে ভাল গ্রন্থ কম। ফলে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে রচিত এসব গ্রন্থ গতানুগতিক এবং নির্ভর করার মতো নয়। অন্যদিকে, নারীবাদ ও নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত প্রচলিত গ্রন্থগুলোর বেশিরভাগেই নারীর রাজনৈতিক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে লেখালেখি ও বইয়ের সংখ্যা খুব একটা নেই বললেও চলে।

সময় ও প্রেক্ষাপটেরও একটা বড় সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং সে আলোকে অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। অভিসন্দর্ভ রচনাকালীন সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক জায়গায় ঠিকমতো যাতায়াত করা সম্ভব হয়নি। বহু প্রতিষ্ঠান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন লাইব্রেরী বন্ধ ছিল মাসের পর মাস। ফলে এই অভিসন্দর্ভ লেখা প্রয়োজনে গবেষণা কর্ম শুরুর দিকে কিছুদিন লাইব্রেরীতে যাওয়ার সুযোগ হলেও করোনাকালীন সময়ে সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে যথাসময়ে সাক্ষাত করা যায়নি করোনা পরিস্থিতির কারণে। অন্যদিকে সাংসারিক ব্যস্ততা এবং সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের মতোও বাস্তবতা ছিল। এসব সীমাবদ্ধতার মোকাবেলা করেই শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভ রচনা শেষ হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর মূল্যায়ন

সমাজের বহু নিয়ম-নীতি, প্রথা ও সংস্কৃতি ধর্ম ও সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। একটি রাষ্ট্রের অধিকাংশ আইনও ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিধানের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। বিশেষ করে নারী অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলো সাধারণত ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অনুসরণ করেই প্রণীত হয়। সুদুর অতীতে এবং বর্তমানেও ধর্ম মানবসমাজের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। গ্রীক, রোমান, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, মিশরীয়, চীনা ইত্যাদি বিভিন্ন সভ্যতার প্রতিটি ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আবার এটাও সত্য, সেই অতীতে এবং বর্তমান যুগেও ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোষ্ঠিস্বার্থে ধর্মকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছে। অনেকে আবার সময়ের চাহিদার আলোকে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা না করে গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার আশ্রয় নেয় এবং ধর্মকে হীন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ব্যবহার করে মানব জাতির অকল্যাণ করে। এভাবে ধর্ম ও সভ্যতা যেমন মানব জাতির সমৃদ্ধির পথকে শানিত করেছে, তেমনি অনেক সময় অন্ধকারের দিকেও ঠেলে দিয়েছে। এই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটি দিক হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর প্রতি চরম অবহেলা ও অবমূল্যায়ন এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্যমূলক আচরণ। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় বিধানে নারীকে দেখা যায় প্রধানত কন্যা, পতিব্রতা স্ত্রী ও জননীরূপে। এরা সকলেই ছিলেন অর্থকরী বৃত্তিহীন ও পুরুষের অধীন। ধর্মীয় সমর্থনেই রূপ ও যৌবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল এদের অর্থকরী বৃত্তি বা জীবিকা[১]। তবুও সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

চরম অবহেলা ও অযত্নে থেকেও পরম মমতায় এই পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত গড়ার ক্ষেত্রে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আজো করে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতা যেখানে নারীর প্রতি চরম অমানবিক ও অন্যায় আচরণ করেছে; ইসলাম সেখানে নারীকে পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার আসন দিয়েছে। ইসলাম নারীকে দিয়েছে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, আইনগতসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ অধিকার। আর তাইতো পশ্চিমা মিডিয়ার ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বৈরিতা এবং ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর মূল্যায়নের বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন ও নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও ইসলাম পুরুষদের চাইতে পশ্চিমা নারীর মন জয়

[১]. সা'দ উল্লাহ, *নারী: অধিকার ও আইন* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৩), পৃ. ৫০

করছে বেশি। আমেরিকায় নওমুসলিমদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি, ব্রিটিশ নওমুসলিমদের মধ্যেও নারীর সংখ্যাই বেশি[২]। ইসলামে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা নেওয়া যাক।

খ্রিস্টধর্মে নারী

সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই ধর্মের অনুসারী। বর্তমান সময়ে খ্রিস্টান অধ্যুষিত বহু দেশ নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য সোচ্চার। এসব দেশে নারীর ক্ষমতায়ন কতটা হয়েছে-- সেটা একটা দিক; কিন্তু খ্রিস্টধর্মে নারী উপেক্ষিত। মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের সময় পৃথিবী ঘোর তমাশায় নিমজ্জিত ছিল এবং সে সাথে নারীও ছিল চরম অবহেলিত। এই সময় খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরা নারী জাতিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে তাদেরকে মনুষ্যত্বের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল[৩]। অন্য অনেক ধর্ম ও সভ্যতার মতো এই ধর্মেও পুরুষের রয়েছে একচেটিয়া আধিপত্য। নারী, শিশু ও পাগল– এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন বলে পরিগণিত ছিল খ্রিস্টধর্মের আইনে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীদের স্বার্থে আইন সংশোধিত হয়[৪]।

খ্রিস্টানধর্মে অবশ্য তাত্ত্বিক পর্যায়ে নারীকে আধ্যাত্মিক সাম্যের এক নতুন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাস্তবে পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষপ্রধান এক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে যার ভিত্তিতে নারীসমাজকে রাজনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ অবস্থা আজো বজায় আছে[৫]।

আসমানী কিতাবের এই ধর্মমতে নারী থেকে পাপের সূচনা, নারী হচ্ছে শয়তানের বাহন। এই নারী হচ্ছে ঈশ্বরের মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক ও মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। মানব জাতির স্বর্গ হতে পাপ-পংকিল দুনিয়ায় আগমনের জন্যে নারীকে দায়ী করা হয়েছে এই ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য সর্বপ্রথম ভঙ্গ করেন

---

২. জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী, *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*, মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকা: বইঘর, ২০১৮), পৃ. ১৯

৩. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৭), পৃ. ১৪৫

৪. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী*, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম সংস্করণ: ১৯৯৮), পৃ. ১৪-১৫

৫. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, নূরুল ইসলাম খান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৩৩

বিবি হাওয়া বা Eve। বলা হয়, গন্দম খাওয়ার কারণে আল্লাহ হাওয়া (আ.)-কে আলাদা শাস্তি দিয়েছিলেন। সেই শাস্তি আজো ভোগ করছে নারী। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব এক ধরণের শাস্তি। (Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.[৬])

টারতুলিন নামে খ্রিস্টধর্মের প্রাথমিক যুগের এক পাদ্রী বলেন, নারী হচ্ছে শয়তান আগমনের দ্বার স্বরূপ, সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের আকর্ষণকারিণী আল্লাহর আইন ভঙ্গকারিণী এবং আল্লাহর প্রতিমূর্তি পুরুষের ধ্বংসকারিণী[৭]। অন্য এক পাদ্রী বলেন, নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত কু-প্ররোচনা, একটি আনন্দায়ক বিপদ, একটি পারিবারিক আশংকা, একটি ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী এবং একটি সজ্জিত দুর্ঘটনা। আরেক পাদ্রী বলেন, নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই উচিৎ। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেকারী, ঘরে ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় তারই কারণে।

বাইবেলে বলা হয়েছে, পুরুষকে নারীর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু নারীকে পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (For the man is not of the woman; but the woman of the man.[৮]) আমরা অনেকে বলে থাকি, নারীকে পুরুষের বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরকম একটা বিশ্বাস ও কুসংস্কার ইসলাম ধর্মের অনেক অনুসারীও লালন করে থাকেন। কিন্তু কথাটি বাইবেলে বলা হয়েছে, 'Then the LORD God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man[৯].'

খ্রিস্টধর্মে নারীর ধর্মীয় অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। চার্চগুলোতে বেশীর ক্ষেত্রে নারীর জন্য বরাদ্দ থাকে সেবার কাজ। নারী উপাসনালয়ে যেতে পারবে, কিন্তু পুরুষের চাইতে আলাদা কিছু নিয়ম মানতে হবে। চার্চের মধ্যে নারীদেরকে চুপচাপ থাকতে হবে। রোমান ক্যাথলিক চার্চে নারীর অবস্থান নির্ধারণের প্রশ্নে John

---

৬. Genesis 3:16

৭. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, ভাবানুবাদঃ খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান (ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী, জ্ঞান বিতরণীর প্রথম সংস্করণঃ ২০১২), পৃ. ২৮২

৮. Corinthians, 11:8-9

৯. Genesis 2:22

Paul II বলেন, জেসাস পুরুষকে বেছে নিয়েছেন, নারীকে নয়। বহু ধর্ম নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। খ্রিস্টধর্মেও এটা করা হয়েছে। এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী, পরিবারে পুত্র সন্তান থাকলে কন্যা সন্তান কোনো সম্পত্তি পাবে না। নারীকে আরো অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার মধ্যে আরেকটি, তালাকপ্রাপ্তা নারী পুনরায় বিয়ে করতে না পারা। মেয়ে শিশুর জন্মকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়নি।

বাইবেল খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ। অবশ্য ইসলাম ধর্মে 'বাইবেল' বলে কোন ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কুরআনে 'ইঞ্জিল' কিতাবের কথা আছে[১০], যা হযরত ঈসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ হয়। মূল ইঞ্জিলে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়নি। সেই আসমানী কিতাব বিকৃত করে অনেক কিছু ঢুকানো হয়েছে, যেখানে নারীর জন্য অপমানজনক বহু কথা নিয়ে আসা হয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মে ও ধর্মগ্রন্থে বিকৃতি নিয়ে কিছু কাজ করেছেন বিখ্যাত ফরাসি চিকিৎসাবিদ ড. মরিস বুকাইলি। তিনি বাইবেলে মানুষের হস্তক্ষেপের বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান* গ্রন্থে। মরিস বুকাইলি লিখেন, 'আসমানী কিতাব হিসেবে পরিচিত বাইবেলের বাণী বিকৃত হয়েছে এবং সেই বিকৃতি সাধিত হয়েছে মানুষের দ্বারাই[১১]।' কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এতে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক তথ্য রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের একজন অধ্যাপক তাঁর গবেষণা প্রবন্ধে লিখেন, খ্রিস্টধর্মে ও বাইবেলে নারীকে যেভাবে অপমানের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, তা মূলত হয়েছে বাইবেলের মূলরূপ না থাকার ফলে। মূলরূপ থাকলে কুরআনের সাথে এর বৈপরীত্য হতো না[১২]।

ইহুদী ধর্মে নারী

মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে দুরত্ব আছে। এই দুরত্ব থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের সাথে ইহুদী ধর্মের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এত সাদৃশ্য সাধারণত অন্য কোন ধর্মের সাথে দেখা যায় না। মুসলিমগণ তাওহীদে বিশ্বাসী, ইহুদীরাও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তাদের ধর্মে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। মুসলিমগণের এবং ইহুদীদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.), যাকে ইহুদীরা আব্রাহাম বলে। আদি পিতা হযরত আদম (আ.), যাকে ইহুদীরা অ্যাডাম বলে। এই দুই ধর্মেই কেবলার বিষয়টি রয়েছে। মুসলিমগণের কেবলা কা'বা আর ইহুদীদের কেবলা জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস। ইসলামের শুরুর দিকে মুসলিমগণেরও কেবলা

---

[১০]. আল-কুরআন; ৫:৪৬

[১১]. ড. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*, আখতার উল আলম অনূদিত (ঢাকা: রংপুর পাবলিকেশন্স লি., ১৯৮৮), পৃ. ৬৩

[১২]. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আল-কুর'আন ও বাইবেলে উল্লেখিত নারীগণ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ সংখ্যা, পৃ. ২৬

ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে একদিন নামাজের মধ্যে মুসলিমগণের কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এলো এবং তখন থেকেই বায়তুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা হয়ে যায় মুসলিমগণের কেবলা[১৩]।

ইসলাম ও ইহুদী উভয় ধর্মেই পুরুষদের জন্য খতনা (circumcision) এর বিষয়টি রয়েছে। সম্পদ দান করার বিষয়টি অত্যাবশ্যক দুই ধর্মেই। মুসলিমরা সম্পদের একটি অংশ দেয় যাকাত হিসেবে আর ইহুদীরা দেয় চ্যারিটি হিসেবে। দুই ধর্মেই নির্দিষ্ট খাবারের অনুমতি আছে। মুসলিমগণের জন্য হালাল খাবার; ইহুদিদের জন্য কোশার খাবার। দুই ধর্ম মতেই পশুর রক্ত ও শুকরের মাংস নিষিদ্ধ। একজন মুসলিম ইহুদিদের কোশার[১৪] খাবার খেতে পারবে আবার একজন ইহুদী মুসলিমগণের হালাল খাবার খেতে পারবে। তবে মুসলিমগণের জন্য কোশারের মধ্যে অ্যালকোহল খাওয়ার অনুমতি নেই; যে কোনো ধরনের অ্যালকোহল ইসলাম ধর্মে হারাম। নারীদের ক্ষেত্রে দুই ধর্মেই মাথায় কাপড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মাথায় কাপড় দেওয়ার বিধান, আর ইহুদী ধর্মে বিয়ের পর। নারী ও পুরুষের জন্য শালীন পোশাক পরার কথা বলা হয়েছে দুই ধর্মেই। পুরুষের টুপি পরার বিষয়টি দুই ধর্মেই আছে। দুই ধর্মেই সুদ নিষিদ্ধ। ধর্মীয় দিন পঞ্জিকায় মাস নতুন চাঁদ দেখে ঠিক করা হয় এই দুই ধর্মেই।

মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মতো ইহুদীরাও আসমানি কিতাবধারী। তাদের মাঝে অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। তাদের আসমানী কিতাবের নাম তাওরাত, যার কথা কুরআনেও আছে। অবশ্য ইহুদীরা তাদের কিতাবকে বাইবেল বলে থাকে, যেমনটি খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরাও বলে থাকে। সময়ের পরিক্রমায় এই কিতাবে তারা অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ উল্লেখ করেন, যুদ্ধসহ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বিনষ্ট ও পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার ফলে ইহুদী পন্ডিতগণ নিজদের খেয়াল ও আবশ্যক মতে সময় সময় কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে সেগুলোকে ধর্মগ্রন্থরূপে উপস্থিত করতেন। এভাবে কালক্রমে প্রকৃত তাওরাত সম্পুর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়[১৫]। ফলে মূল তাওরাতের বাণী ও শিক্ষা এখন আর নেই। হযরত মুসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাতে নারীর প্রতি অমর্যাদাকর কিছু ছিল না। সেখানে নারীর ব্যাপারে চমৎকার কিছু নির্দেশনা

---

১৩. আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: নাকিব পাবলিকেশন্স, ১৯তম প্রকাশ-২০০৭), পৃ. ৮৮-৮৯

১৪. ইহুদি ধর্ম অনুযায়ী যা খাওয়া অনুমোদিত, সেটাকে বলা হয় কোশার। আর এই ধর্মে যা খাওয়া নিষিদ্ধ, সেটাকে বলা হয় ত্রেফা। কোশার হলো সেসব প্রাণী, যাদের পায়ের খুর পুরোপুরি চেরা এবং যারা জাবর কাটে, যেমন গরু, ছাগল, মহিষ. ভেড়া ইত্যাদি। ঘোড়া কিংবা শূকর এই কারণে কোশার নয়। মাছের মধ্যে কোশার হচ্ছে যে মাছের আঁশ ও পাখনা আছে।

১৫. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

আছে[১৬], যা ইহুদীদের কর্তৃক পরিবর্তিত ও বিকৃত ধর্মগ্রন্থে নেই। নিজেদের ধর্মশাস্ত্র হারিয়ে ইহুদীরা হযরত মুসা (আ.) এর মূল উপদেশ বিস্মৃত হয়[১৭]। ফলে তাদের ধর্মও অনেক পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সে সাথে নারীর অধিকারও খর্ব হয়।

লিঙ্গগত পার্থক্য ইহুদী পন্ডিতগণ কর্তৃক পরিবর্তিত তাওরাতে বা বাইবেলে পাওয়া যায়। বাইবেলের কথা অনুযায়ী নারী পুরুষের অধীনস্থ। নারী পুরুষের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করতো। ইহুদী ধর্মের নারীর ছিল না পিতার সম্পত্তিতে অধিকার। যে পিতার পুত্রসন্তান ছিল না, কেবলই সেই পিতার কন্যাসন্তান পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অংশীদার হতো। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ওই নারীকে নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ছিল না। এই বিধান এই কারণে যে, যাতে সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস না পায়।

ইহুদি সমাজে নারীকে সেবিকা ও দাসীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়। প্রাচীন আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছাড়াও শর্তসাপেক্ষ ও অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল[১৮]। নারী পাপী এবং সৃষ্টির সূচনায়ও যে নারী পাপ করেছে, খ্রিস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থের মতো এমন কথা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থেও লেখা আছে। খ্রিস্টধর্মের মতো ইহুদী ধর্মের অনুসারীদেরও বিশ্বাস, প্রথম নারীর পাপের শাস্তি গোটা নারী জাতি ভোগ করছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে, আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছো'? আদম বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গিনী হিসেবে যে স্ত্রী দিয়েছেন, সেই স্ত্রী তথা হযরত হাওয়া (আ.) আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছিল, তাই আমি তা খেয়ে ফেলি।' এরপর আল্লাহ হাওয়াকে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভবেদনা বৃদ্ধি করে দেব। তুমি সন্তান প্রসবকালে বেদনাতে আক্রান্ত হবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে। সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব খাটাবে[১৯]।' এরকম কথার প্রচলন ও বিশ্বাস পোষণ নারীর প্রতি খুবই অমর্যাদাকর। নারী গর্ভধারণ না করলে পৃথিবীতে প্রাণ ও প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই থাকতো না। গর্ভধারণ ও গর্ভবেদনা নারীর প্রতি কোন শাস্তি নয়, এটা সৃষ্টির নিয়ম। ইসলাম নারীকে এই অপবাধ থেকে রক্ষা করেছে[২০]।

---

[১৬]. রওশন আরা বেগম, *বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধিনের সম্পাদিত পিএইচডি থিসিস, ২০১৫), পৃ. ২৫১

[১৭]. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[১৮]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

[১৯]. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ: ২০১০), পৃ. ১৭

[২০]. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ. ৪৯৭

নারীর প্রতি বিরূপ ও চরম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে এই ধর্মে এবং এই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা) ফিতুম নামক এক ইহুদী বাদশাহ আইন জারি করেছিল, যে মেয়েকে বিয়ে দেয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার (বাদশাহ) সঙ্গে এক রাতযাপন করতে হবে[২১]। এটা ইহুদী ধর্মের ধর্মীয় বিধান না হলেও ধর্মের অনুসারী বাদশাহর পক্ষ থেকে এমন ফরমান জারি করা তখন কোন ব্যাপারই ছিল না। ধর্মীয় বিধান এবং ইহুদী সমাজে নারীর বিষয়ে এমন অনেক প্রথা ছিল, যা নারীর জীবনকে বিষিয়ে তুলতো।

ইহুদীদের বিশ্বাস, ইসরাইলী সম্প্রদায় এবং নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে আল্লাহর একটি চুক্তি হয়েছিল। তাওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, সিনাই পর্বতে সেই চুক্তির সময় ইসরাইলের নারী ও পুরুষ উভয়েই উপস্থিত ছিল। সেই চুক্তিতে নাকি পুরুষের আধিপত্য দেওয়া হয়েছিল এবং নারীকে পরোক্ষভাবে আবদ্ধ করা হয়েছিল। বাইবেলের ঘোষণা অনুযায়ী, বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ে নারীর উপর পুরুষের একক কর্তৃত্ব ছিল। যেমন কোন স্বামী চাইলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো, কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামীকে তালাক দিতে পারতো না। মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করার বিধান ছিল। সেই বিধানে বলা হয়েছে, নিঃসন্তান ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করতে হবে। যদি সে বিবাহ করতে রাজি না হয় তবে 'চালিতজাহ' বা 'হালিজাহ[২২]' নামে এক প্রকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে মূলত বিধবা তার দেবর বা ভাসুরকে জুতাপেটা করে, থুতু দেয় এবং তিরস্কার করে।

আদালতের রায়ে তালাক হলেও গোঁড়া ইহুদীরা সহজে এই বিবাহবিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদের সনদ না দেয়, তবে ধর্মীয় আইনে বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইহুদী-আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ বৈধ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারিনী বলে গণ্য হতো এবং সেই বিবাহের ফলে জন্ম নেওয়া সন্তান বংশানুক্রমে 'জারজ' বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হতো। ইহা তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইহুদিদের বিশ্বাস, এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ মূসা (আ)-কে দিয়েছিলেন[২৩]।

---

[২১]. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬২

[২২]. Chalitzah (or Halizah) is the process by which a childless widow and a brother of her deceased husband may avoid the duty to marry. The process involves the widow making a declaration, taking off a shoe of the brother, and spitting on the floor. The ceremony releases the man from the obligation of marrying the woman, and she becomes free to marry whomever she desires.

[২৩]. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা* (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫), পৃ. ১৯

ইহুদী নারীদের শিক্ষার অধিকার খুবই সীমিত ছিল। তাদের ততটুকু পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানো হতো যতটুকু লেখাপড়া করলে পরিবারের সাংসারিক কাজ-কর্ম সম্পাদন করা যায়। তাদেরকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ততটাই শেখানো হতো যা তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। নারী ও পুরুষকে পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বিষয়টি এখনো গোঁড়া ইহুদীদের মধ্যে আছে। বছর কয়েক আগে ইহুদীদের সাথে পুলিশের একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে জেরুজালেমের কাছে বেইত শেমেশ শহরে। গোঁড়া ইহুদীরা নারীদের জনসমক্ষে আনার বিরোধি। এই প্রেক্ষাপটে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে[২৪]। এই শহরের অসংখ্য স্থানে নারীদের শালীনতা বজায় রেখে পোশাক পরা এবং আরো বিভিন্ন নির্দেশনা সম্বলিত সাইনবোর্ড রয়েছে।

ইসরাইলের জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগই গোঁড়া ইহুদী এবং এই সংখ্য দিন দিন বাড়ছে। বিবিসির ২০১১ সালের প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, গোঁড়া ইহুদী অধ্যুষিত এলাকায় নারীদেরকে বাসের পেছন দিকে বসতে বাধ্য করা হয়। এমনকি কখনো কখনো বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার মতোও ঘটনা ঘটে। হাতা-কাটা পোশাক পরে মেয়েরা স্কুলে গেলে গোঁড়া ইহুদীরা এসব মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বাজে মন্তব্য করে। ২০১৭ সালে নারীকে কেন্দ্র করে জেরুজালেমে একটি প্রার্থনার স্থানে দ্বন্ধ বাঁধে। নারীদের উচ্চকণ্ঠে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ নিষেধ, প্রার্থনার চাদর গায়ে জড়ানো নিষেধ এবং উচ্চকণ্ঠে ধর্মীয় গান করাও নিষেধ। উদারপন্থীরা এসব নিয়মের পরিবর্তন চায়। সেই পরিবর্তনের জন্য তারা পুরোহিতদের নেতৃত্বে প্রার্থনায় অংশ নেয়। এমন উদ্যোগ বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং এই নিয়ে কট্টরপন্থী ও উদারপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ওয়েস্টার্ন ওয়াল নামক এই উপাসনালয় দেখাশোনা করেন গোঁড়া একটি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ। সংঘর্ষের ঘটনার পর একজন নারী মিডিয়াকে বলেছিলেন, 'আমার গায়ে পুরুষদের অংশ থেকে চেয়ার ছুড়ে মারা হয়েছে। ব্যাগে ভরে মল ছুড়ে মারা হয়েছে। চিন্তা করুন, কেউ একজন ব্যাগে ভরে মল নিয়ে এসেছে যাতে তারা সেটা মেয়েদের গায়ে ছুড়ে মারতে পারে[২৫]।'

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নারী ও পুরুষদের একসাথে প্রার্থনার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা থেকে পিছু হটতে হয় গোঁড়া ইহুদীদের প্রতিবাদের মুখে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন থেকে আগত অভিবাসী ইহুদীদের বিক্ষোভের মুখে। ইসরাইলের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিশাল

[২৪]. বিবিসি, ২৭ ডিসেম্বর ২০১১
[২৫]. বিবিসি, ২৭ আগস্ট ২০১৭

অংশই আসে এই অভিবাসী ইহুদীদের নিকট থেকে। নারী-পুরুষের একসাথে প্রার্থনার বিষয়টিকে এসব গোঁড়া ইহুদীরা পুরো ধর্মের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে।

বৌদ্ধধর্মে নারী

খ্রিস্টপুর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তন করেন। নারী অধিকার ইস্যুতে তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে কথা আছে। অনেকে বলে থাকেন, গৌতম বুদ্ধ বিয়ে-প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং লোকজনকে সংসারত্যাগী হওয়ার এবং সন্ন্যাসব্রতের প্রতি আহ্বান করে গেছেন[২৬]। তিনি নারীকে মানবাত্মার নির্বাণ[২৭] লাভে বিঘ্ন মনে করতেন[২৮]। অনেকে আবার গৌতম বুদ্ধকে নারীর মুক্তিদূত মনে করেন।

প্রতিষ্ঠার পর পর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ধর্ম বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে। বিশ্বব্যাপী আবেদন সত্ত্বেও এই ধর্মে নারীর ভূমিকা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। যদিও অনেক বৌদ্ধ নারী নান[২৯] ও মাদার হিসেবে গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, কিন্তু ধর্মীয় স্থান এবং বিধানে নারীর অবস্থান ও প্রবেশাধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ে পুরুষের বিপরীতে নারীকে কঠোর আধ্যাত্মিক নির্দেশাবলীর মধ্যে রাখা হয়েছে, যা তার সন্ন্যাস জীবনকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড় করায়। ধর্মগ্রন্থে উপাসনার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি অতিরিক্ত কিছু নিয়ম আরোপ করা হয়েছে।

অনেকের মতে, প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করা হয়নি। এই ধর্মে নারীকে যথেষ্ট সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ নারী-বিরোধি ছিলেন না। তিনি নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। নারীদের বিষয়ে এই ধর্মের বিকৃত ঘটানো হয়েছে[৩০]। ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে গৌতম বুদ্ধকে ভারতীয় নারীর জন্য একজন মুক্তিদূত এবং বৌদ্ধ ধর্মকে নারী-বান্ধব ধর্ম হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি লিখেন, 'বুদ্ধের আবির্ভাব ভারতীয় নারী সমাজের জন্য একটি স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ..বুদ্ধ একজন সমাজ

---

[২৬]. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী* (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ, ২১-২২

[২৭]. নির্বাণ হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের একটি পরিভাষা। বৌদ্ধ ধর্মের মতানুসারে সাধনার চরম পরিণতি বা পরম প্রাপ্তি হচ্ছে নির্বাণ লাভ। দীর্ঘ সময় সাধনার পরেই কেবল এমন স্তরে পৌছা যায়। বৌদ্ধমতানুসারে নির্বাণ হলো মোক্ষলাভের শর্ত। দীর্ঘ সাধনা করে সব ধরণের লোভ-মোহ ও চাওয়া-পাওয়াকে ত্যাগ করে সকল প্রকার দুঃখ ঘোচন করে চিরমুক্তি লাভ করে যে বিমুক্ত লাভ করে তাই নির্বাণ।

[২৮]. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭), পৃ. ৫

[২৯]. 'নান' যাকে ইংরেজিতে 'নুন' বলা হয়। নান বলতে বৌদ্ধ ধর্মের ধমীয় অঙ্গিকারের অধিন জীবিত কোন পুরোহিত বা এরকম অন্য কোন নারীকে বুঝায়। বৌদ্ধ নানরা সব সময় নিজেদের 'নান' বলে ডাকেন না, তারা অনেক সময় নিজেদের 'মনাসমাজ' বা 'শিক্ষক' বলে অভিহিত করে থাকেন।

[৩০]. রওশন আরা বেগম, *বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

সংস্কারক এবং তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে ঘৃণিত জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার উপর কুঠারাঘাত করে নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর বাণী প্রচার করেন। ..ভারতের নারীরা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করল। বুদ্ধ নারী জাতিতে তাঁর ধর্মে আশ্রয় দিয়ে ভিক্ষুণী সংঘ গঠন করেন। ..এর পূর্বে সমাজে নারীদের পণ্য হিসেবে গণ্য করা হত[৩১]।' ড. জিনবোধী ভিক্ষু এরকম আরেকটি প্রবন্ধে একইভাবে বৌদ্ধ ধর্মকে নারী-বান্ধব হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিখেন, 'বুদ্ধযুগের ভারতীয় নারীগণ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। পুরুষের ন্যায় নারীরা সংঘ জীবন-যাপনের অধিকারিনী হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন[৩২]।'

হিন্দুধর্মে নারী

বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান ও পরিচিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্মই প্রাচীনতম ধর্ম[৩৩]। তাই হিন্দুধর্মের অনুসারী তাদের ধর্মকে সনাতন ধর্মও বলে থাকেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে হিন্দু ধর্মের বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশেও এই ধর্মের বিস্তার ঘটে। ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দুরা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। পৃথিবীতে হিন্দু জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বাংলাদেশ তৃতীয় দেশ।

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে ইসলামের যখন আবির্ভাব ঘটে তখন ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রবিদরা সকল শ্রেণির নারী সমাজের প্রতি আমানুষিক আচরণ করে গেছেন। এই অন্যায় আচরণ যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণির শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও পুরাণ-ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ আজো বিদ্যমান। নারী তখন ছিল সমাজের দুর্বহ বিপদ অথবা কাম চরিতার্থ করার সম্বল মাত্র[৩৪]। তখন, তার আগে এবং তারপরেও ভারতের হিন্দু সমাজে নারীরা অভিশপ্ত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং এখনো বঞ্চিত আছে।

হিন্দু ধর্ম ও সমাজ নারীকে পুরুষের সেবিকা ও ভোগের সামগ্রী হিসেবে জানতো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও হিন্দু মেয়েরা আজো অবহেলিত এবং অবলা। তাদের আলাদা কোনো পরিচয় নেই। এ দেশের অন্ধকার আইনে হিন্দু

---

৩১. ড. বেনু প্রসাদ বড়ুয়া, *বৌদ্ধধর্ম ও নারী* (প্রবন্ধ), (অধ্যাপিকা রাশিদা খানম সম্পাদিত 'সমাজ ও নারী', এ এইচ ডেভেলাপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১০), পৃ. ৪৯

৩২. ড. জনবোধী ভিক্ষু, *বৌদ্ধধর্মে নারীর ভূমিকা* (প্রবন্ধ), ('সমাজ ও নারী', প্রাগুক্ত), পৃ. ৭১

৩৩. রওশন আরা বেগম, *বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

৩৪. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত*, প্রাগুক্ত

নারীরা দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হচ্ছে। একজন হিন্দু নারী আক্ষেপ করে লিখেন, 'একজন রাণী রাসমনী, একজন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, একজন রাজা রামমোহন এদের কারোই এত বছরে পুনর্জন্ম হয়নি। তাই হিন্দু মেয়েদের মানুষ হিসেবে প্রকাশ করার মতো দু'টি কথা কেউ বলেনি[৩৫]।'

হিন্দু সমাজে নারীকে এতটাই অবমাননার সাথে দেখা হতো যে, নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হতো। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনু বলেন, সন্তান (পুত্র) প্রজননের জন্যই নারীর জন্ম হয়[৩৬]। মনুর বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু তথা সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার নারীর নেই। হিন্দু আইনের মূল উৎস মনুসংহিতায় নারীকে দাসী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে আর স্বামীকে দেবতার আসনে সমুন্নত করা হয়েছে। স্বামী যতই দুশ্চরিত্র, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও পরনারী আসক্ত হোক না কেন; স্ত্রী হিসেবে স্বামী দেবতার পদসেবা করাই নারীর ধর্ম এবং এতেই রয়েছে নারীর মুক্তি ও স্বর্গবাস। এভাবে নারী সম্পর্কে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে সমগ্র মনুসংহিতা জুড়েই।

মহাভারতেও নারী সম্পর্কে অনেক হীন বক্তব্য রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, মানুষের চরিত্রে যত রকমের দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। এমন বক্তব্য থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, হিন্দু ধর্ম ও সমাজে নারীকে কেমন দৃষ্টিতে দেখা হয়। অবশ্য অনেকে বলে থাকেন যে, হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ গীতায় ও বেদে নারীর যথেষ্ট মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে কুসংস্কারই হিন্দুধর্মে ধর্ম ও নিয়ম-নীতি হিসেবে বেশি বিবেচিত হচ্ছে এবং চর্চা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীতে এই ধর্ম নারী নির্যাতনের এক বিশাল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ও হিন্দু সমাজে নারীরা যুগ যুগ ধরে অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। বেদ ও গীতাকে সেভাবে পর্যালোচনা করতে কেউ এগিয়ে আসে না। রাজা রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা বেদ ও গীতা পর্যালোচনা করেই সতীদাহ প্রথা বিলোপ ও বিধবা বিবাহ চালুর উদ্যোগ নেন[৩৭]।

বর্ণ বিভক্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীতে নারী পুরুষের মানবিক মর্যাদা অনেক বৈষম্যমূলক[৩৮]। এক সময় বিধবা হওয়ার সাথে সাথে নারীকে চিতায় পুড়ে মরতে হতো। বাল্য বধুকেও স্বামীর একই চিতায় দগ্ধ হয়ে সহমরণে শরীক হয়ে

---

৩৫. ইরানী বিশ্বাস, *বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার আইন*, জাগো নিউজ, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

৩৬. সা'দ উল্লাহ, *নারী: অধিকার ও আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৩৭. রওশন আরা বেগম, *বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

৩৮. ইসরাত আহমেদ ও আনিসুর রহমান, *নারীর অবস্থান ও অধিকার: একটি রূপরেখা (প্রবন্ধ)*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ৫৮

স্বর্গবাসের সনদপত্র দিতে হতো; আর এটাই ছিল এ ধর্মের অনুমোদিত নিষ্ঠুর প্রথা যা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এক সময় পুণ্যলাভের আশায় আর নারীর সতীত্ব রক্ষায় অসংখ্য হিন্দু নারীকে সতীদাহ প্রথার নামে আগুনে পুড়ানো হয়েছিল।

হিন্দু সমাজে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ নেই। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর বয়স যতই কম হোক না কেন তার অন্যত্র বিবাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণেই প্রাচীন যুগে কোনো হিন্দু নারীর স্বামী মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ নারীও আত্মহত্যা করে এরূপ করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতো[৩৯]। অন্যদিকে, একজন পুরুষ যে কোন সংখ্যক বিবাহ করতে পারে[৪০]। হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা অসঙ্গতি এবং নারীর প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ দুর করার অভিপ্রায়ে হিন্দু ধর্মের বর্তমান পারিবারিক আইনসমূহ সংস্কারের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। আইন সংস্কারের সুপারিশ করে ২০১২ সালে আইন কমিশন একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিন্দু সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ না থাকায় কিছু হিন্দু নারী মানবেতর জীবন-যাপন করছে[৪১]। প্রতিবেদনটিতে হিন্দু সমাজের আরো বহু অসঙ্গতি তুলে ধরা হয়।

হিন্দু ধর্মে নারীদের অধিকারের ব্যাপারে কোনো লক্ষ্যই রাখা হয়নি। এ ধর্মের আইন নারীদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বেশি অভাব ঘটিয়েছে। এ ধর্মের মতো এতো কঠোর বিধান অন্য কোনো ধর্মে নেই। পিতামাতার সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না এবং বাংলাদেশে আজো নেই। বৈবাহিক সূত্রে স্বামীর বাড়িতেও স্থাবর-অস্থাবর কোন সম্পত্তির অধিকার নেই। এমনকি সন্তানের কোন সম্পত্তির অধিকারও তাদের নেই। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, নারী সম্পত্তিতে অধিকার না পেলেও ভারতের প্রচলিত আইন অনুযায়ী পিতার সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ের অধিকার রয়েছে। ভারত ১৯৫৬ সালে 'হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট' পাশ করে। পরবর্তীতে ২০০৫ ও ২০০৭ সালে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে আরও যুগোপযোগী করা হয়। নেপালেও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কয়েক বছর আগে এমন উদ্যোগ নেওয়া হলেও হিন্দুর সম্প্রদায়ের লোকজনই বড় বাঁধা সৃষ্টি করেন। তারা যুক্তি তুলে ধরেন, হিন্দু নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া হলে দেশের হিন্দু মেয়েদেরকে মুসলমানরা বিয়ে

---

৩৯. গাজী শামছুর রহমান, *হিন্দু আইনের ভাষ্য* (ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৯), পৃ. ৯০৮

৪০. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬), পৃ, ১৪৬

৪১. হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ক আইন কমিশনেন চূড়ান্ত প্রতিবেদন, ২০১২

করে ফেলবে এবং এক সময় দেশ হিন্দুশূণ্য হয়ে যাবে। বর্তমানে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী যদি কারো পুত্র সন্তান থাকে, তাহলে কন্যা সন্তানরা তাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায় না। তবে পুত্র না থাকলে পুত্র রয়েছে এমন কন্যারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। যদিও নারীর অর্জিত সম্পত্তির অংশ তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ঠিকই পেয়ে থাকেন। আইনের এই অসম প্রেক্ষিতে এবং হিন্দু নারীকে দুর্বহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে খসড়া হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দুদের বড় একটি একটি অংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে আইনটি পাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে আইন মন্ত্রণালয়[৪২]।

সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার নেই বলে পণ ও যৌতুক প্রথা হিন্দু ধর্মে প্রবল ছিল। নারীদের যেহেতু জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্বামীগৃহে থাকতে হয় তাই পিতৃগৃহ থেকে যা কিছু পণ যায় তাই নারী সম্পত্তি[৪৩]। অবশ্য এই নারী সম্পত্তিও নারী ঠিকমতো ভোগ করতে পারতো না। যৌতুক ও পণের পুরো টাকাটাই পাত্র পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ হতো। মেয়েটি শুধু কিছু সোনার গহনা উপহার হিসাবে পেতো। এগুলোই তার নিজের সম্পত্তি হিসেবে থাকতো। 'সরকার যৌতুকপ্রথা বন্ধ করার পর মেয়েরা সে সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এখন এ দেশের হিন্দু মেয়ে মানে সস্তা, কানাকড়িও মূল্য নেই। জন্মের পর থেকে একটি হিন্দু মেয়ে শোনে, বাবার সংসারে তার কোন সম্পত্তির ভাগ নেই। তাই বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব বাবা বা ভাইয়ের। আবার বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পর সেই মেয়েটি শুনতে পায়, আমৃত্যু ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব নেবে স্বামী। হিন্দু সমাজে, একটি মেয়ে মানে একটি গলগ্রহ[৪৪]।'

প্রাচীন হিন্দুসমাজে কন্যাসন্তান ছিল খুবই অপছন্দনীয়। পিতামাতার মৃত্যু হলে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনা করার দায়িত্ব এবং অধিকার পেতো পুত্র সন্তানেরা। হিন্দুসমাজে ভাইয়ের দীর্ঘ জীবন কামনা করে ভাইফোঁটা নামে প্রার্থনা অনুষ্ঠান, জামাতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক জামাইষষ্ঠী অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সবই পুরুষকেন্দ্রিক। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য যুবতী নারীকে বলি দেওয়া, গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া কিংবা বৃষ্টি অথবা ধনদৌলত লাভের আশায় বলিদান করা হতো। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে দিনাজপুরের 'রামসাগর' দিঘী একটি। বিরাট ও গভীর এই দিঘী খননের পর এখানে পানি উঠানোর জন্য রাম নামে

---

৪২. Daily Bangladesh Post, 20 April 2021 (https://bangladeshpost.net/posts/move-to-rejig-hindu-succession-law-58388)

৪৩. ইসরাত আহমেদ ও আনিসুর রহমান, *নারীর অবস্থান ও অধিকার: একটি রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪৪. ইরানী বিশ্বাস, *বাংলাদেশে হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার আইন*, প্রাগুক্ত

এক যুবককে বলি দেওয়ার কারণে এই দিঘীর নাম 'রামসাগর' বলে লোকমুখে প্রচারিত। দেশে এরকম আরো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে, যেখানে এক সময় মানুষ বলি দেওয়া হতো।

গ্রীক সভ্যতায় নারী

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে গ্রীক সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। কয়েক হাজার বছরের পুরোনো এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভূমধ্য সাগরকে কেন্দ্র করে। আজকের গ্রীস দেশটি ছিল এই সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গ্রীকরা অনেক অবদান রাখে। বিশেষ করে দর্শন চর্চায় তারা সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এসব বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গ্রীসের। মহাকবি হোমার, ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস, গণিতবিদ পিথাগোরাস, এরকম জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আরো বিখ্যাত মানুষগুলোও গ্রীসের। একই সাথে এত জ্ঞানী-গুণীর আবির্ভাব বিশ্বের আর কোথাও ঘটেনি। ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, স্থাপত্য, শিল্পকর্ম ইত্যাদি জ্ঞানের অনেকগুলো শাখায় তাদের বিচরণ।

বহু বিখ্যাত দার্শনিক ও মনীষীর এক সময়ের পৃথিবী কাঁপানো এই সভ্যতায়ও নারীকে নিয়ে রয়েছে বহু অন্ধকারের গল্প। সেথায় নারীর মর্যাদা খুবই অধঃপতিত ছিল। গ্রীস পুরাণে নারী 'পান্ডোরাকে' মানবের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে[৪৫], যেরূপ হযরত হাওয়া (আ)-কে ইহুদী পুরাণে দায়ী করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করা হতো[৪৬]। বিয়েতে নারীর মতামত দেয়ার কোন অধিকার ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর কেবল ছেলেরা সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা কখনো বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতো না। তখন সমাজে নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। মোটকথা, নারীর সমগ্র জীবনটাই দাসত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে অতিবাহিত হতো[৪৭]।

গ্রীক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র এথেন্স ছিল অনেক দিক থেকে এগিয়ে। সেখানে নারী তুলনামূলক কম অবহেলিত ছিল গ্রীক সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রের চাইতে। তবুও সেই এথেন্সে নারীর অবস্থা খুব একটা সুখকর ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন, 'প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য ও সংস্কৃতিমান এথেন্সবাসীদের ভেতরে স্ত্রী

---

৪৫. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূদিত (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ: ১৯৯৭), পৃ. ২৩

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

পণ্যবিশেষ, যা অন্যের কাছে বিক্রয়যোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য এবং উইলযোগ্য। নারীকে অনিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হতো; তবে গৃহের পরিপাট্য ও সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী ছিল অপরিহার্য। একজন এথেন্সবাসী যে কোন সংখ্যক স্ত্রী রাখতে পারতো[৪৮]।'

নারী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল এবং স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বেশি কিছু ছিল না। তার যেন কাজই ছিল কেবল সন্তান প্রসব, লালন-পালন আর সেবিকা হিসেবে পরিবারের লোকজনের সেবা করা। পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখতো। এমনকি নারী বাধ্য হতো একাধিক পুরুষের যৌন চাহিদা নিবৃত্ত করতে। গ্রীকদের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা কেমন ছিল, তা তাদের একটি প্রবাদ বাক্য থেকেই অনুমান করা যায়, 'আগুনে জ্বলে গেলে ও সাপে দংশন করলে প্রতিবিধান সম্ভব; কিন্তু নারীর দুস্কৃতির প্রতিবিধান অসম্ভব।'

পুরো সময়জুড়ে না হলেও একটা সময়ে বেশ্যা সম্প্রদায় গ্রীক সমাজের একটি অভিন্ন অংশে পরিণত হয়। এদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন পুরুষের জন্য দূষণীয় কিছু ছিল না। নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ব্যভিচার দোষণীয় মনে হতো না[৪৯]। ফলে একটা সময়ে গ্রীক সমাজে বেশ্যা-সম্প্রদায় বেশ উন্নত মর্যাদা লাভ করে। বেশ্যালয় বা পতিতালয় গ্রীক সমাজের আপামর-সাধারণের কেন্দ্র ও আড্ডাখানায় পরিণত হয়। কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞরা সবাই নির্দ্ধিধায় বেশ্যালয়ে যেতো। বেশ্যাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রীর আসনও অলংকৃত করতো। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনাও তাদের সামনে সম্পাদিত হতো। জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেও তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হতো। বেশ্যালয় বা পতিতালয় যেন এক প্রকার উপাসনালয়ে পরিণত হয়েছিল[৫০]।

নারীর প্রতি গ্রীক সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে অনেক গ্রীক দার্শনিক ও সাহিত্যিকের লেখা ও উক্তিতেও। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দু'টি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ হয়; এক হচ্ছে তার বিয়ের দিন এবং দুই তার মৃত্যুর দিন[৫১]। কী ভয়ংকর উক্তি নারী সম্পর্কে। বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the great source of chaose and disruption in the world.' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ

[৪৮]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১
[৪৯]. আসমা জাহান হেমা, *ইসলামের ছায়াতলে নারী* (ঢাকা: আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ৩১
[৫০]. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
[৫১]. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

উৎস'[৫২]। নারী সম্পর্কে সক্রেটিসের আরো ভাষ্য, 'আমরা যৌন তৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি।' জেনোফোন মনে করতেন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর ভূমিকা শিক্ষকের ও স্ত্রীর ছাত্রের[৫৩]। অ্যারিস্টটল নারীকে দুর্বল, কর্তৃত্বহীন ও তাদের স্বামীর মুখাপেক্ষি বলে আখ্যায়িত করেছেন[৫৪]। এভাবে গ্রীক সভ্যতার কোন দার্শনিকই কখনো নারীকে নিয়ে ইতিবাচক কোন মন্তব্য করেনি। গ্রীক সভ্যতায় সর্বপ্রথম অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করতো এই বলে যে, একই সূর্যের নীচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হল, নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই।

একটা পর্যায়ে গ্রীক সভ্যতায় নারীর স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচিত হয়। মানব জাতিকে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার আলো সর্বপ্রথম তারাই দেখিয়েছিলো। উপশহরের দর্শন সর্বপ্রথম তারাই পেশ করেছিল এবং নিজেদের অঞ্চলে স্থাপন করে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েও ছিলো। নারীকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। ফলে একটা সময়ে নারী স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ারও সুযোগ পেয়েছিল। নারীর উন্নতি-অগ্রগতিতে তারা আরো কিছু ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে স্পার্টায় নারীর জন্য বেশ কিছু ভূমিকা রাখা হয়। ফলে একটা সময়ে গ্রীক সভ্যতার অন্যান্য নগররাষ্ট্রের চেয়ে স্পার্টার নারীরা একটু ভিন্ন হয়।

গ্রীক সভ্যতা চরম উন্নতির শিখরে পৌছার ক্ষেত্রে স্পার্টার পুরুষদের পাশাপাশি এই নারীদেরও অবদান আছে। সেই সময় নারীরা বিভিন্ন চিত্রকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ও ভাস্কর্যে পুরুষদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করতো[৫৫]। তাদের কর্মচঞ্চলতা পুরুষশাসিত স্পার্টান সমাজে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেতো। স্পার্টার নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতো, খেলাধুলায় যেতো, যুদ্ধেও যেতো। তাদের বাক স্বাধীনতাও ছিল। নারীরা জমির মালিক হতো। তারা জমিকে যেকোনো কাজে লাগানোর স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। উত্তরাধিকারী হিসেবেও তারা জমি-জমার ভাগ পেতো। স্পার্টান পুরুষদের মতো নারীদেরও নাগরিকত্ব দেওয়ার নিয়ম ছিল, যা নারী ক্ষমতায়নে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। অবশ্য তাদের ভোটাধিকার ছিল না। পরিবারে পুরুষের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক দিকটা স্পার্টান নারীরাই সামলাতো। কেনাবেচা এবং খরচাপাতির হিসাব-নিকাশ নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী করে তুলেছিল।

---

[৫২]. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৫৩]. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৫৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৫৫]. রওশন হাসান, *সভ্যতায় নারীর অধিকার ও অবদান*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০১৭

রোমান সভ্যতায় নারী

প্রাচীন যে কয়েকটি সভ্যতা নিয়ে মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে, রোমান সভ্যতা তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি। রোম নগরীকেই কেন্দ্র করে এই সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম শতকের প্রথম দিকে ইতালীয় উপদ্বীপে এই সভ্যতার সূচনা হয় এবং ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে বিকশিত হয়। এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল সিরিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামের ইতিহাসে মুতার যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় রোমানদের সাথে। ইয়ারমুকের যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই খলিফা আবু বকর (রা.) এর মৃত্যু হয়[৫৬]। হযরত উমর (রা.) এর আমলে রোম বিজয়ের বাকি কাজ সমাধা করা হয়। এভাবে সেখানে ইসলাম বিজয়ী হয়। বর্তমানে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের বহু এলাকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

এই রোমান সভ্যতায় বহু অন্ধকারের গল্প আছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে নিষ্ঠুর স্বৈরশাসন। বর্তমান এই সময়েও কোন দেশের কোন স্বৈরশাসক যখন জনগণকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নিষ্ঠুর শাসন অব্যাহত রাখে তখন রোমান সাম্রাজ্যের শাসক নিরোকে[৫৭] উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে বলা হয়, 'রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল।' আরো বহু অন্ধকারের গল্পের মধ্যে রোমান সভ্যতায় নারী নির্যাতন নিয়ে রয়েছে বহু বিষাদগাঁথা।

রোমান আইন অনুসারে দীর্ঘদিন যাবত নারীর মর্যাদা ছিল যারপর নাই অধ:পতিত[৫৮]। রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, নারী হল অপবিত্র এক জানোয়ার যাতে আত্মার অস্তিত্ব নাই[৫৯]। রোমান সমাজে নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝামাঝি কোন বিশেষ শ্রেণী বা প্রজাতি মনে করা হতো। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীর মালিকানার অধিকার ছিল না। নারীর উপার্জনেও নিজের মালিকানা ছিল না। তার উপার্জন গণ্য হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে। এমনকি মেয়ের বয়োপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না। পরিবারের পুরুষ প্রধানের ছিল নারীকে বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করারও অধিকার। স্বামীও চাইলে স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতো[৬০]।

---

[৫৬]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৫৭]. রোমান সম্রাট নিরো ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও পাগলাটে শাসকদের একজন। তিনি তার মা, ভাই, স্ত্রীকেও হত্যা করেছিলেন। নিরো রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন ৫৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ৬৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

[৫৮]. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৫৯]. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মা'রেফুল-কোরআন (প্রথম খন্ড)*, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৬০৯

[৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

পরিবার প্রধানই এককভাবে মেয়ে বিয়ে দিতো। তাদের মতামতের কোন অধিকার ছিল না। একজন নারী শত কষ্ট সহ্য করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো না। স্ত্রীর উপর স্বামীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ছিল[৬১]। সেই সভ্যতার সময় ৫২০ বছর পর্যন্ত কেউ তালাকের নাম পর্যন্ত শুনেনি[৬২]। একটা সময়ে এই কঠিন বিধান ও প্রথার অবসান হয়েছিল।

নারী শিক্ষার বিষয়টি রোমান সভ্যতায়ও ছিল। তবে সবার কাছে নারীদের এই পড়ালেখার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তখন অনেকে মনে করতো, অতিরিক্ত পড়ালেখা একজন নারীকে দাম্ভিক করে তোলে, অবাধ যৌনতার দিকে ধাবিত করে। অবশ্য উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারের লোকেরা তাদের ঘরের মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করতো। এর এক বড় উদাহরণ হয়ে আছেন হর্টেনসিয়া। একজন বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। তখনকার দিনে কেবল পুরুষদেরই একচ্ছত্র অধিকার বলে ধরে নেয়া হতো। ৪২ খ্রিস্টপুর্বাব্দে রোমান ফোরামে বক্তার মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি রোমের ধনী নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ-কর ব্যবস্থার সরাসরি সমালোচনা করেন।

এই সভ্যতার সময়ে শহরকেন্দ্রিক যেসব অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, তাদের দ্বারা পরিচালিত হতো সাম্রাজ্যের শাসনকার্য। দাসপ্রথার বহুল প্রচলন ছিল এই সভ্যতায়ও। রোমানরা এতটাই নীচে নেমে গিয়েছিল যে, দাসদের দ্বারা আয়োজন করতো 'গ্লাডিয়েটর' নামক এক বর্বর খেলা, যেখানে দাসেরা পরস্পর অবতীর্ণ হতো মৃত্যু পর্যন্ত জীবন সংহারী লড়াইয়ে। আর রক্তের এ হুলি-খেলা দেখে আনন্দ পেতো তখনকার অভিজাত শ্রেণির লোকজন। সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে তারা আক্রমন করতো বিভিন্ন রাজ্য ও সম্প্রদায়ের উপর। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য তারা বিনা প্ররোচনায় দুর্বল সম্প্রদায়ের লোকদের উপর হামলা করতো। রোমানরা এতটাই যুদ্ধবাজ ছিল যে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সকল পুরুষকেই সামরিক বাহিনীতে সেবা দিতে হতো। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা তখন রাষ্ট্রের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। নিরীহ জনপদের ওপর আক্রমনে ব্যবহৃত হতো ধর্ম প্রচারের ছুঁতো। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। নারীকে পরিণত করা হয়েছিল পুরুষের মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে। বেশ্যাবৃত্তি, বহুমাগামিতা, অবাধ যৌনাচার তখন অভিজাত শ্রেণির সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এটা ঠিক, রোমানরা একটা পর্যায়ে নারীর উন্নতি-অগ্রগতির জন্য কাজ করে। তারা নারীর কিছু অধিকার দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেনি[৬৩]।

---

[৬১]. ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৬২]. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৬৩]. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় নারী

মেসোপটেমিয়া পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর একটি। এই সভ্যতা খ্রিস্টপুর্ব ছয় হাজার অব্দ থেকে শুরু হয়ে খ্রিস্টপুর্ব তিন হাজার অব্দে পূর্ণতা লাভ করে। এই সভ্যতা বর্তমান উত্তর ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নদীর মধ্যে মূলত বিকশিত হয়েছিল। আধুনিক কালের ইরাক, সিরিয়া, তুরস্ক, ইরানসহ আরো কয়েকটি দেশ প্রাচীন কালের মেসোপটেমিয়া সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, যার প্রধান কেন্দ্র ছিলো ব্যাবিলন। মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় আধুনিক সংস্কৃতির অনেক কিছুর উৎপত্তি। কারিগরি উদ্ভাবন, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বয়ন শিল্প ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল এই সভ্যতা। আমরা এখন যে এক ঘণ্টায় ৬০ মিনিট ধরে সময় গণনা করি, সেটিও মেসোপটেমিয়ানদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি[৬৪]।

এই নামকরা সভ্যতায়ও নারীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। নারী দাম্পত্য বিষয়টি অনেক সময় নিলামে উঠতো, যেখানে অনেক সময় বিবাহের নামে একজন নারী সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রিত হতো। বিবাহের ব্যবসা চালু ছিল। বিবাহের প্রয়োজনে অনেক সময় নারীকে অপরিচিত লোকের সাথে সহবাসেও যেতে হতো, একজন নারী ঐ লোকের সাথে সহবাসে যেতো যে লোক তাকে সেখানে পছন্দ করতো। মেসোপটেমিয়ান সভ্যতায় এমনো প্রথা ছিল, মেয়ের পিতার সাথে অন্য এক লোকের চুক্তি হবে বিবাহের, বর নারীর পিতাকে মূল্য পরিশোধ করে বিয়ে করবে[৬৫]। এটা তখনকার সাধারণ একটি প্রথা ছিল। একজন পুরুষ মনে করলে একাধিক স্ত্রী এবং উপপত্নীও রাখতে পারতো।

বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সন্তান জন্ম দেওয়া। সহজে নারীকে তালাক দেওয়া যেতো না। আর তালাক দেওয়া গেলেও সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের সিদ্ধান্ত আসতো। নারীও তালাক দিতে পারতো যদি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ থাকতো। কোন নারী বন্ধ্যা হলে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারতো কিন্তু তাকে যৌতুক ফেরত দিতে হতো। শিলালিপির রেকর্ড অনুযায়ী, অনেক নারী স্বামীর সংসারে সুখী না হওয়াতে তাদের স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যের বিছানায় যেতো। যদি ধরা পড়তো, তাহলে নারীকে তার প্রেমিকসহ নদীতে ডুবিয়ে মারা হতো। হামুরাবীর আইনে লেখা আছে, যদি কোন নারীর স্বামী বা মালিক মনে করে ওই নারীর প্রেমিককে জীবিত রাখা দরকার, তাহলে রাজা নারীর প্রেমিককে ক্ষমা করতেন।

---

[৬৪]. *আজও অনুকরণীয় মেসোপটেমিয়া*, বাংলানিউজ, ডিসেম্বর ৭, ২০১৬ (https://www.banglanews24.com/offbeat/news/bd/538788.details, visited 25.04.2021)

[৬৫]. *Mesopotamian Women and Their Social Roles,* (https://www.historyonthenet.com/mesopotamian-women-in-mesopotamian-society#:)

সেই সভ্যতায় পুরোহিত বা শিক্ষিতসমাজ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ ঘরের মেয়েরা পড়ালেখা করতে পারতো না। শিক্ষার এই সুযোগ কেবল অভিজাত শ্রেণির পরিবারের মেয়েদের ছিল। মেয়েদেরকে বাড়ির মধ্যেই থাকতে হতো এবং সেখানেই তাদেরকে ঘরকন্নার কাজ শিখতে হতো। বহু ইশ্বরে বিশ্বাসী সেই সমাজে নারী দেবীও ছিল। পরিবার মেয়েদেরকে গির্জায় বিক্রি করতো পারতো। শুধু তাই নয়, পতিতাবৃত্তি ও দাসত্বের জন্যে পরিবার কোন মেয়েকে বিক্রি করে দিতে পারতো[৬৬]। পতিতাবৃত্তি তখন খুব একটা জঘন্য কাজ হিসেবে পরিগণিত ছিল না। বাইরের পতিতাবৃত্তির পাশাপাশি তখন গির্জাগুলোতেও এক ধরণের 'পবিত্র পতিতাবৃত্তি' এর প্রচলন ছিল।

দাসপ্রথার বিষয়টি বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার সাথে জড়িয়ে থাকলেও এই ঘৃণ্য প্রথার উৎপত্তি মেসোপটেমিয়া সভ্যতায়। এই সভ্যতার অ্যাসিরীয় নামক জাতিদের সময়ে এসে তখনকার দুনিয়ায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করেছিলো। সে সময় অ্যাসিরীয়গণ যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত পুরুষ লোকদের দাস এবং নারীদের দাসী ও রক্ষিতা বানাতো। যতটুকু জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ সালে মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় প্রথম ক্রীতদাস প্রথা চালু হয়[৬৭]। বনেদি সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে এই প্রথা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে অভিজাত শ্রেণি তাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য ঠিক রাখতে দুর্বল শ্রেণিকেও দাসে পরিণত করতো। নিঃস্ব ও বিধবা নারীদেরও দাসী বানানো হতো। একটা সময়ে দাস-দাসী পর্যাপ্ত হওয়ায় অভিজাত নারীদের জন্য খাওয়া আর ঘুমানো করা ছাড়া কোন কাজ ছিলোনা। এ সময় নারীদের অভিজাত শ্রেণি হিসেবে মর্যাদাবান করে দাসী, বাদী, পতিতা ও রক্ষিতাদের থেকে আলাদা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকে মেসোপটেমিয়ানরা নারীদের বাইরে যাবার বিষয় আইন করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলো। হিজাব প্রথার প্রচলন সেখান থেকেই শুরু হয়। নারীকে গৃহবন্দি করার উৎপত্তিও সেখানে।

নারীকে নিয়ে এতো অন্ধকারের গল্পের মধ্যেও আলোকিত কিছু গল্পও আছে। এই সভ্যতায় আমরা নারী শাসকেরও অস্তিত্ব দেখতে পাই। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে সেখানে একজন নারী শাসক ছিলেন যার নাম সেমিরাস বা সাম্মু-রামত। তিনি ছিলেন একমাত্র নারী যিনি দাপটের সঙ্গে শক্তিশালী অশূরীয় সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। খ্রিস্টপুর্ব ৯০০ সালের দিকে এই নারী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অনেক রূপবতি ছিলেন, যার রূপ-সৌন্দর্য্য রোমান যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখক এবং চিত্রশিল্পীদেরকে অনেক ভাবিয়েছে।

---

[৬৬]. *Mesopotamian Women and Their Social Roles,* Ibid

[৬৭]. মো. আলী আশরাফ খান, *ক্রীতদাস প্রথা : সভ্যতার অন্ধকার*, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জুন ২০১৬

ইতিহাসবিদদেরও কাছে সেমিরাস আলোচিত, কারণ সেই সময়ে প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে নারী শাসক খুবই বিরল ছিলো। তার রাজত্ব পাওয়া নিয়ে অনেক ইতিহাস প্রচলিত আছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে বিখ্যাত ফরাসি লেখক ভলতেয়ারের লেখা কিছু ইতিহাস। ১৮২৩ সালে ভলতেয়ারের একটি নাটক মুক্তি পাওয়ার পর রাণী সেমিরাসের সম্পর্কে মানুষ আরো জানতে আগ্রহী হয়[৬৮]। ভলতেয়ার এই নাটকে সেমিরাসের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। ইতালীর কবি দান্তেও এই নারী শাসককে নিয়ে লিখে এবং কাল্পনিক ছবি একে সাজাপ্রাপ্ত হন। দান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে যে, তিনি 'কামুক বিদ্বেষ' মূলক ছবি একেছেন[৬৯]। সেমিরাসকে কল্পনা করে দান্তের আঁকা অর্ধ নগ্ন বা নগ্ন ছবিটি সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল। সেমিরাস রাজত্ব করেন ব্যবিলন থেকে। ইতিহাসবিদদের ধারণা, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান এই রাণী সেমিরাস অথবা সম্রাট নেবুচাদনেজার এর যে কোন একজন বানিয়েছিলেন।

পারস্য সভ্যতায় নারী

এক সময়কার পৃথিবীর আরেকটি দাপুটে সভ্যতার নাম হচ্ছে পারস্য সভ্যতা। আজকের ইরান ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত পারস্য নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। এক সময়ের পৃথিবীর পরাশক্তি ছিল এবং সমৃদ্ধ একটি সভ্যতা ছিল। এই সভ্যতা বিকাশে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে পারস্য সম্রাট প্রথম দারায়ুস। সভ্যতায় পারসীয়দের দুটি বড় অবদান হলো দক্ষ প্রশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ ধর্মীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা। সম্রাট দারায়ুস গোটা পারস্য সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য ২১টি প্রদেশে ভাগ করেন। সব প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তৈরি করেছিলেন সড়ক। তিনি ডাকব্যবস্থা চালু করেন।

পারস্য সভ্যতায় ক্ষমতাসীন শ্রেণি জনগণের ভাগ্য নির্ধারকের আসনে সমাসীন হয়েছিল। তাদের নির্দেশ ও বিধিই ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। তারা ছিল অগ্নি উপাসক। অন্য কোনো ধর্ম বা আদর্শ মেনে চলার কোনো এখতিয়ার জনগণের ছিল না। এই সভ্যতায়ও নারীর অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। নারীকে পরিণত করা হয়েছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে। নারীকে সর্ব সাধারণের সম্পত্তি মনে করা হতো। প্রত্যেক পুরুষ যে কারো স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর মত আচরণ করতে পারতো। নারীকে পণ্য রূপে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। দাসপ্রথারও প্রচলন ছিল। যেখানে শক্তিমানরাই ছিল প্রভু, আর দুর্বলরা পরিণত হতো তাদের দাসে।

---

[৬৮]. Marcos Such Gutierrez, *The True Story of Semiramis, Legendary Queen of Babylon*, Published September 12, 2017 (https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/searching-for-semiramis-assyrian-legend, visited 28.04.2021)

[৬৯]. Marcos Such Gutierrez, *The True Story of Semiramis, Legendary Queen of Babylon*, Ibid

প্রথম ব্যবিলন ডাইন্যাস্টির ষষ্ঠ রাজা হাম্মুরাব্বী প্রাচীনকালে মানবাধিকার বিষয়টি আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি আইন কোড লিপিবদ্ধ করে আইন প্রণয়নে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। হাম্মুরাব্বীর শাসনকালে প্রণীত আইনের কোড মানবাধিকার ভিত্তি[৭০]। এই হামুরাবীর (hammurabi) আইনে নারীকে গৃহপালিত জন্তুর মতো মনে করা হতো। কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতো। সে মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে ভোগ করুক, সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের সময় ও এর প্রাক্কালে পারস্য সমাজে নৈতিক অধঃপতন শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। বিবাহ সম্পর্কে কোন স্বীকৃত বিধি ছিল না অথবা কোন বিধি থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হতো[৭১]। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওতের সময় পারস্যের সম্রাট ছিলো নওশেরওয়ার। তার পিতার নাম ছিল কোবাদ। এই কোবাদের সময় বিখ্যাত বিপ্লবধর্মী মজদুকের অভ্যুত্থান ঘটে। মজদুক ঘোষণা করেন যে, কামিনী, কাঞ্চন ও ভূমি নিয়েই মানুষের মধ্যে যত বিপদ-বিসংবাদ আরম্ভ হয় এবং মানুষ সকল প্রকার মহাপাতকে লিপ্ত হয়। অতএব কোন প্রকার বিবেক-বিবেচনা না করেই নিয়ম করতে হবে যে, স্ত্রীলোক মাত্রই পুরুষের উপভোগ্য। সম্রাট কোবাদ যে কারণেই হোক মজদুকের এই জঘণ্য মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করেন[৭২]। অবশ্য নওশেরওয়ার বিভিন্ন ঘৃণ্য প্রথা উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তুলনমূলক ন্যায়পরায়ন শাসক। কিন্তু পুরো সাম্রাজ্যে নারী নির্যাতনসহ অন্যায়-অপকর্ম এতটাই মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, তিনি খুব একটা পেরে ওঠেননি।

মিশরীয় সভ্যতায় নারী

ইতিহাস, ঐতিহ্য আর রহস্যের গভীরে ঘেরা বিশ্বের পরাক্রমশালী এক সভ্যতা হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা। নীল নদকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। সমগ্র মিশরের প্রধান শাসককে বলা হতো ফারাও বা ফেরাউন। মিশরের সাধারণ মানুষ ফারাওকে সূর্য দেবতার পুত্র মনে করতো। তারা মনে করতো, মৃত্যুর পরও নতুন জগতে ফারাও আবার তাদের রাজা হবেন। মিশরীয়রা পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করতো এবং ভাবতো যদি মৃতদেহের ক্ষতি না হয় তাহলে আত্মা একসময় দেহে ফিরে আসবে।

---

[৭০]. নাজমুল হুদা শামিম, *মানবাধিকার ও নারী অধিকার* (ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ২৩

[৭১]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

[৭২]. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ১৪৪

তাই তারা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়, যা মমি নামে পরিচিত। মমি সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা পিরামিড তৈরি করে। পিরামিড অর্থ 'খুব উঁচু'। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হলো ফারাও খুফুর পিরামিড। মিশরীয়রা ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তি তৈরিতেও দক্ষ ছিল। মিশরীয়রা যে চিত্রলিপি আবিষ্কার করে তার নাম 'হায়ারোগ্লিফিক লিপি' (গুঢ়াক্ষরিক)[৭৩]। মিশরীয়রা বিজ্ঞানেও অনেক অবদান রেখেছিল।

মিশরীয় ইতিহাসে নেফারতিতি রাজকার্যের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতেন[৭৪]। মিশরীয় দেয়ালচিত্রে এর প্রমাণ রয়েছে। আবার অনেকের মতে, নেফারতিতি হচ্ছেন প্রাচীন মিশরের এক জনপ্রিয় রাণী। খ্রিস্টপুর্ব ১৪০০ অব্দের দিকে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। এতে মনে হয় যে, সেই সভ্যতায় নারী অনেক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল; আসলে এমন নয়। বর্তমান মিশরের জাদুঘরে যে কুখ্যাত ফেরাউনের লাশ সংরক্ষিত আছে, সেই ফেরাউন এই প্রাচীন মিশরের। এই ফেরাউনের কথা কুরআনে আছে[৭৫]। হযরত আসিয়া (আ.) ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। তাঁর উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল, একটি যুগে নারী নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে হযরত আসিয়া (আ.) এর উপর নির্যাতনের ইতিহাসই যথেষ্ট। হযরত আসিয়ার কথাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে[৭৬]।

বৃটিশ সভ্যতায় নারী

বৃটিশরা আমাদের এই উপমহাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশ শাসন করেছে। বলা হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য ডুবতো না। সেই বৃটিশ সভ্যতায় এক সময় নারী ছিল চরম অবহেলিত ও বঞ্চিত। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরম বেদনাদায়ক এবং আচরণ ছিল চরম নির্মম। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ইংল্যান্ডে নারী ছিল জুলুম-নির্যাতনের শিকার। পুরুষের বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করার মতো শক্তিশালী আইন ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে আইনের বাইরেও সামাজিক প্রথার শিকার হয়ে নারী হতো চরম নির্যাযিত এবং বিষিয়ে উঠতো তার জীবন। নারীর স্বাধীনতা ছিল না। নিজের পছন্দমত বিয়ে করার অধিকার ছিল না। এমন কি

---

৭৩. মিশরীয় চিত্রলিপিকে 'হায়ারোগ্লিফিক্স' বলা হয়। গ্রীক হায়ারোগ্লিফ শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎকীর্ণ পবিত্র স্থান। গ্রিকরা যখন মিশর অধিকার করে তখন তাদের ধারণা হয় যে, যেহেতু পুরোহিতরা লিপিকরের দায়িত্ব পালন করেন, আর মন্দিরের দেয়ালে এই লিপি খোদাই করা আছে, অতএব এই লিপি পবিত্র লিপি। এভাবে এই লিপির নাম হয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি। হায়ারোগ্লিফিকে ছিলো প্রায় ৮০টির মতো দ্বিব্যঞ্জনধ্বণি। এই চিত্রলিপিতে কোন স্বরবর্ণ ছিলো না। এই লিপি কখনো ডান থেকে বামে, আবার কখনো বাম থেকে ডানে যেতো। পিরামিডের দেয়ালে হায়ারোগ্লিফিক দেখা যেতো। মিশরীয় সভ্যতার বিকাশে হায়ারোগ্লিফিক এর ভূমিকা ছিলো।

৭৪. রওশন হাসান, *সভ্যতায় নারীর অধিকার ও অবদান*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০১৭

৭৫. আল কুরআন; ১১ : ৯৭

৭৬. আল কুরআন: ৬৬ : ১১

তালাকপ্রাপ্তিতেও নানা জটিলতার সৃষ্টি হতো। তালাকের চেয়ে স্বামী কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়াটা সহজ ছিল।

স্ত্রী বিক্রির মতো ভয়ংকর অসভ্য প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইংল্যান্ডে চালু ছিল। শুধু স্ত্রী বিক্রি নয়; দাস-দাসী বিক্রিও জমজমাট ছিল এবং এই ব্যবসাটি ছিল বেশ লাভজনক। আফ্রিকার উপকূলের পাশাপাশি দাস বিক্রির হাট বসতো ব্রিটিশ বন্দরেও। উইলিয়ামথিমে নামক এক ব্যবসায়ীর বরাত দিয়ে জানা যায়, ১৬১৭ সালে তিনি একাই চালান দিয়েছিলেন ৮৪০ জন দাস[৭৭]। ১৬৮০ থেকে শুরু করে মাত্র কুড়ি বছরে ইংরেজরা কম করে হলেও ১,৪০,০০০ মানুষকে রূপান্তরিত করেছিল দাসে[৭৮]।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি থেকে জানা যায়, ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্ত্রী বিক্রির অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তৎকালীন নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১৭৩৩ সালে স্যামুয়েল হোয়াইটহাউজ নামের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী ম্যারি হোয়াইটহাউজকে থমাস গ্রিফিথ নামের এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করেন। ঘটনাটি ঘটে বিলস্টন নামের একটি গ্রামে, যেটি ওলভারহ্যাম্পটন ও বার্মিংহামের খুব কাছেই। ১৮৫৫ সালে কটসওল্ড নামে এক ব্যক্তি তার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে ২৫,০০০ ডলারে বিক্রি করেন। সেই ক্রেতা নতুন 'কনে'-কে দিয়ে যৌনাচারসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করান, যা সেই সময়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। ঘটনাটি তখন বহুল আলোচিত হয়। এই ঘটনার পরই বিষয়টি নিয়ে কঠোর অবস্থানে যায় আদালত। অবশেষে ১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে ডিভোর্স করার আইন শিথিল করা হয়। স্ত্রী বিক্রির প্রথাটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের অশান্তি হতে মুক্তি পেতে কোন কোন নারী নিজের ইচ্ছাতেও বিক্রি হতে রাজি হতেন। কম খরচে বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য এমনটি করতেন। প্রথাটি বিশ শতকের গোড়ার দিকেও চালু ছিল। এই প্রথাটি মূলত গ্রামীণ অঞ্চলে চালু ছিল। আইনবিদ ও ইতিহাসবিদ জেমস ব্রাইসের মতে, স্ত্রী বিক্রয় প্রচলিত আইনে ছিল না। আইনগতভাবে এটা অবৈধ ছিল। যেসব স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খারাপ সম্পর্ক ছিল, সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে অসামর্থ্য হলে বিক্রি করে দিতো। ফলে বিয়ে-তালাকের প্রতিকার হিসেবে গরীবদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই প্রথা। এক পর্যায়ে এসে আদালতের ভূমিকায় ক্রমে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

---

[৭৭]. মো. আলী আশরাফ খান, *ক্রীতদাস প্রথা: সভ্যতার অন্ধকার*, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জুন ২০১৬

[৭৮]. প্রাগুক্ত

ইংরেজদের মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ এখনো বিদ্যমান। এটা ঠিক যে, দেশটির সংসদীয় আইনে রাজ্য পরিচালনায় উত্তরাধিকার নির্ধারণে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করা হয় না; কিন্তু পদবি নির্ধারণে বৈষম্য রয়েই গেছে। বৃটিশ রাজপরিবারে একসময় কন্যার চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। পুরুষতান্ত্রিক সে সরকার ব্যবস্থার কিছুটা রয়ে গেছে এখনো[৭৯]।

চীনা সভ্যতায় নারী

এক সময় চীন বেশ এগিয়ে ছিলো। সেই চীনেও নারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল। একটি চীনা প্রবাদ হচ্ছে- তোমরা নারীর কথা শুনো, কিন্তু বিশ্বাস করো না। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে Waters of Woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতো না। এমনকি তার সন্তানদিগের উপরও কোন অধিকার থাকতো না। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হতো। পুনঃবিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল। স্বামীর যখন ইচ্ছা তখন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারতো। ব্যভিচারের অপরাধে কোন স্বামী যদি কোন নারীকে তালাক দিতো এবং এই অবস্থায় যদি বাবা গ্রহন না করতো তাহলে ওই নারীকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হতো[৮০]।

চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। পৃথিবীতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই[৮১]। কনফুসিয়াস চীনের সামাজিক জীবনের ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন। তাঁর দার্শনিক ও নৈতিক মতবাদ পরবর্তী যুগে চীন দেশে ধর্ম হিসেবে বলবৎ হয়ে ওঠে[৮২]। অবশ্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে। কনফুসিয়াসের মতবাদের সাথে এই নবাগত ধর্ম বা মতবাদের সংযোগ ঘটে[৮৩]। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবকালে এই বৌদ্ধ ধর্ম চীনের সর্বত্র তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কনফুসিয়াস বলেন, নারীর মূল কাজ আনুগত্য, শৈশব-কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র।

---

৭৯. *রাজার স্ত্রী রানি হলে রানীর স্বামী রাজা নন কেন*, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর ২০২০
৮০. আব্দুল খালেক, *নারী* (ঢাকা: দীনা পাবলিকেশন, ১৯৯৯), পৃ. ৬
৮১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৫
৮২. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

ভারতীয় সভ্যতায় নারী

ভারতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে ভারতীয় উপমহাদেশে, যা প্রধানত আজকের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বেশি ছিল। বর্তমানে ভারত একটি আলাদা দেশ। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি হিন্দু ধর্মের লোকজনের বাস এই দেশে। এখানে অন্য যে কোনো দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সবসময় বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। অতীতের মতো নারীর অবস্থা ততটা ভয়ংকর না হলেও দেশটিতে নারীর অবস্থান আজো মর্যাদাপূর্ণ নয়। আজো বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাঝে মাঝে নারীর উপর ভয়াবহ নির্যাতনের কাহিনী শুনা যায়।

উনিশ শতকেও ভারতীয় নারীদের অবস্থা বৈষম্যমুক্ত ছিল না। এখানে বিমাতাসূলভ আচরণ কেবল হিন্দু নারীর প্রতিই ছিলনা; ভারতীয় নারী বলতে যাদেরকে বুঝাতো এদের সবারই অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল। হিন্দু ধর্মে ও বিভিন্ন আইনে নারীর প্রতি অমর্যাদাকর আচরণের বিষয়টি থাকলেও ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারপরও ভারতীয় সমাজে মুসলিম, হিন্দু ও অন্য নারীরাও নিগৃহিত ছিল। এই বঞ্চিত ভারতীয় নারীদের মধ্যে বাঙালী নারীও ছিল। গোলাম মুরশিদ তাঁর *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* বইয়ে উনিশ শতকের বাংলার নারীদের শোচনীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেন, উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিলো খুবই নগণ্য[৮৪]।

রামমোহন রায় ভারতীয় নারীমুক্তির জন্য কাজ করেন এবং যুগান্তকারী অবদান রাখেন। তাঁর কথায়ও উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতীয় নারীদের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, 'একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতিত নারীদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না[৮৫]।' সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবাহী ভারতীয় সমাজে গার্হস্থ্য জীবনে জায়া, জননী এবং গৃহিণীরূপে নারীর ভূমিকা অবৈতনিক পরিচালিকা বা পরিচারিকা থেকে বেশি কিছু ছিল না[৮৬]।

সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাজলে কন্যা নিক্ষেপের বিবরণ ইতিহাসে খুব বেশির দিন আগের নয়। হিন্দু নারীর প্রতি সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল এই সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথা অনুসারে বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে হতো।

---

৮৪. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২য় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ২৪

৮৫. প্রাগুক্ত

৮৬. সা'দ উল্লাহ, *নারী: অধিকার ও আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

ভারতীয় সমাজে এরকম অসংখ্য নারীকে জীবন্ত চিতায় পুড়তে হয়েছে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল নারী। পরিকল্পিতভাবেই তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যান্য জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

বৈদিক যুগে[৮৭] নারী ছিল যুদ্ধে লব্ধ লুটের মালের ন্যায় বিবেচিত। স্বামীর কাছে স্ত্রীর অবস্থান ছিল সেবাদাসীর ন্যায়। যে নারী কন্যা সন্তান জন্ম দিতো, তাকে সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হতো। বিবাহে নারীর মতামত দেয়ার কোন অধিকার ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেতো না। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- নারী হচ্ছে পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংশের মূল উৎস। ফলে তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখার নীতি প্রচলিত ছিল। সেই সমাজ মনে করতো, নারীকে সর্বদা কড়া শাসনের মধ্যে না রাখলে সে অবশ্যই বিপদগামী হবে[৮৮]। এই তো সেদিনও ভারতের নারীর প্রতি চরম অন্যায় আচরণ করা হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তি গল্পে এবং আরো বিভিন্ন গল্পে ভারতীয় সমাজে নারীর প্রতি যে চরম অমানবিক আচরণ করা হতো তা ফুটে উঠে।

নারীর প্রতি যে অবজ্ঞা এবং তাকে মানুষ হিসেবে খুব একটা মর্যাদা না দেওয়ার প্রবণতা থেকে উনিশ শতকের ভারতীয় বিখ্যাত রাজনীতিবিদ জওহর লাল নেহেরুও বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহেরু অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন; তারপরও জওহর লাল নেহেরু তাকে অবহেলা করতেন[৮৯]। একবার জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর এক বন্ধু এক রাজনৈতিক সমাবেশে যোগদানের জন্যে ঘর থেকে বেরুবার পুর্ব মুহুর্তে কমলা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। একজন কমলাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর নেহেরু একজন পরিচারিকাকে তাঁর স্ত্রীকে দেখাশোনার জন্য মোতায়েন করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি ঐদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল তো করলেনই না, এমনকি সেদিনের যাত্রাও বিলম্বিত হল না[৯০]।

---

৮৭. বেদবর্ণিত সময়কালকে বৈদিক যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছরের এই সময়কালকে বৈদিক যুগ বলা হয়ে থাকে। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংশের পর বেদকে ভিত্তি করে বৈদিক যুগের সূচনা হয়। সেই সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্য জাতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। স্থানীয় নগরসভ্যতাকে পরাজিত করে তারা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনার্যদের অনেকেই তখন ভয়ে, ভক্তিতে কিংবা লোভে আর্যদের হয়ে কাজ করেছিল। আর্যদের ভারতে প্রবেশের পর থেকে কয়েক শতকব্যাপী চলে হিন্দু ধর্মের আদি শাস্ত্র 'বেদ' রচনার কাজ। এটাকে হিন্দু ধর্মের ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার আকরগ্রন্থ বলা হয়। এই যুগকে এরকম বলার মূল কারণ হলো, এই সময় সমস্ত বেদ ও উপনিষদ লেখা হয়; যা আগে মুখে মুখে পড়তে ও মনে রাখতে হতো।

৮৮. আব্দুল খালেক, *নারী* (ঢাকা: দীনা পাবলিকেশন, ১৯৯৯), পৃ. ৫

৮৯. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

জাহেলি যুগে আরব সমাজে নারীর অবস্থান

জাহেলি যুগের অবসান ঘটে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সেই যুগে আরবে এবং পৃথিবীর অন্য আরো অনেক অঞ্চলে নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয় ও অমর্যাদাকর ছিল। আরবে কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো ভয়ংকর ও অমানবিক প্রথা চালু ছিল। বিচারপতি মাওলানা তকী উসমানী তাইতো বলেন, 'আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্বের প্রথম নারীবাদীদের অন্যতম। তিনিই সর্বপ্রথম শিশুকন্যা হত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং ইসলাম ধর্মে সর্বপ্রথম এ কাজকে মহাপাপ ঘোষণা করেন, যা ছিল সেই সময়ে অতীব সাহসের কাজ[৯১]।'

আবরবা কন্যসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো কারণ তারা কন্যসন্তানকে অপমানজনক ও অমর্যাদাকর ধারণা করতো[৯২]। তৎকালীন আরব সমাজের সেই নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রথাটির কথা কুরআনেও এসেছে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের কাউকে যখন কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যায় এবং সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এই দুঃসংবাদের কারণে সে নিজেকে লোক চক্ষুর আড়াল করে চলতে থাকে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে কি জীবিত থাকতে দেবে, না মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? আহা! কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর তাদের বিচার-বিবেচনা[৯৩]।'

এক লোক রাসূল (সা.)-কে জাহেলি যুগে তাঁর জীবন্ত কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলার কাহিনী শুনায়, 'আমার একটি কন্যাসন্তান ছিল। আমি যখনই তাকে ডাক দিতাম, তখনই সে বড়ই খুশি মনে আমার কাছে দৌড়ে আসতো। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাক দিলাম। সে দৌড়ে আমার কাছে এলো। আমি তাকে সাথে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম। কূপের পাশে গিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার করছিল।' ঘটনাটি শুনে রাসূল (সা.)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল[৯৪]। কী ভয়ংকর কী মারাত্মক ঘটনা। এভাবে বহু লোক জাহেলি যুগে তাদের কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলতো, জীবন্ত কবর দিতো। এই ভয়াবহ প্রথাটি কোরাইশ ও কিন্দাহ গোত্রের লোকদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল[৯৫]।

---

৯১. জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী, *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৯২. Philip Hitti, *History of the Arabs* (London: Sent Martin Press, 1951), P. 28

৯৩. আল কুরআন; ১৬ : ৫৮-৫৯

৯৪. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ দারেমী, *সুনানুদ দারেমী* (করাচী: কাদীমী কুতুবখানা, ১ম খণ্ড), পৃ. ১৪

৯৫. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

জাহেলি যুগে আরবরা যেসব কারণে কন্যাসন্তান লাভ করাকে ক্ষতি ও অপমানজনক মনে করতো:

১. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো। ফলে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য পুরুষ লোকের প্রয়োজন ছিল বেশি। এই কারণে জাহেলী আরবের লোকেরা পুরুষকে নারীর ওপর প্রাধান্য দিতো। মেয়েদেরকে গনীমতের মালের অংশ দেওয়া হতো না। কেননা, তারা ঘোড়সওয়ার হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারতো না।

২. জাহেলি যুগে আরবরা মনে করতো মেয়েরা জীবিত থাকলে তাদেরকে অন্যের সাথে বিয়ে দিতে হবে। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল লজ্জাকর বিষয়। কারণ মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে পিতাকে শ্বশুর হতে হয়। আর শ্বশুর হওয়াকে অনেক লোক অপমানজনক মনে করতো।

৩. অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কন্যাসন্তান জীবিত রাখা ক্ষতিকর। কারণ পুত্রসন্তান লালন-পালন করতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, কন্যাসন্তান লালন-পালন করতেও ঠিক ঐ পরিমাণই অর্থকড়ি প্রয়োজন হয়। অথচ ছেলেরা পিতার জন্য যেরূপ উপকারী হয়ে থাকে মেয়েরা তদ্রূপ হয় না। অতএব, মেয়েদের জন্য খরচ করার মধ্যে কোন ফায়দা নেই, বরং বড় রকমের একটা ক্ষতির ব্যাপার।

৪. কন্যা সন্তান হত্যার আরেকটি কারণ ছিল দরিদ্রতা। অভাব-অনটনের কথা চিন্তা করে যারা সন্তানদেরকে হত্যা করতো তাদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক ছিল যারা প্রকৃতই দরিদ্র ছিল। তাই তারা কন্যা সন্তানকে হত্যার পথ বেছে নিতো। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে তারা পুত্রসন্তানকে হত্যার পথ বেছে নিতো না।

৫. কন্যাসন্তান হত্যার এই নিষ্ঠুর প্রথাটি গোত্রসর্দার, ধর্মযাজক এবং গণকদের থেকে শুরু হয়। তারা নিজেরাও এই অপকর্মে লিপ্ত হতো এবং জনসাধারণকেও এই কাজের জন্য প্ররোচিত করতো। তারা বলতো, মেয়েদের জীবিত রাখা অপমানের কারণ। তাদের দেখাদেখি এবং পরামর্শে অনেকেই উৎসাহিত হয় এবং এই নিষ্ঠুর প্রথা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধু কন্যাসন্তানই মেরে ফেলা নয়, সে যুগে স্ত্রী হিসেবেও নারীর কোনোই মর্যাদা ছিল না। পুরুষ ও জীবজন্তুর মধ্যস্থলে ছিল নারীর অবস্থান। পুরুষ নিজেকে তার স্ত্রীর জান ও মালের মালিক মনে করতো। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল এবং পরিবারে পুরুষের ভূমিকাই ছিল মুখ্য[৯৬]। অন্যদিকে পুরুষের বিয়ের সংখ্যার কোনো সীমারেখা ছিল

[৯৬]. Robartson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arab* (Cambrize University Press, 1903), P. 94

না। যত সংখ্যক ইচ্ছা তত সংখ্যক নারীকে বিয়ে করতে পারতো। হযরত গাইলান সাকাফী (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁরও দশ জন স্ত্রী ছিল[৯৭]। হযরত ওয়াহাব আসাদী (রা.)-এরও দশ জন স্ত্রী ছিল।

আরবদের মধ্যে তালাকের ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখন ইচ্ছা তখন এবং যতবার খুশি ততবার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। ঘরে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্বামী অন্য কোন নারীর সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করতো না। স্ত্রীদের প্রতিবাদ করার কোনো সাহস ও অধিকার ছিল না। স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতো। কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করতো এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর উপার্জন করতো[৯৮]। সে যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ ছিল। ঘটনাক্রমে কোনো সুন্দরী ও সম্পদশালী ইয়াতীম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেতো, তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করে ফেলতো। কিন্তু ঠিকমত মোহরানা দিত না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের পূর্বে নারীর এই লাঞ্ছনার জীবন প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। নবীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বেদুঈন ও অন্যান্য শ্রমবিমুখ আরব সমাজে সুসংঘটিত রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। সুসংগঠিত কোন বিচার ব্যবস্থাও ছিল না সেই সমাজে[৯৯]। ফলে প্রতিকার পাওয়ার জন্য কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। নারীর অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ইসলাম আগমনের পর কুরআনেই নারীর মর্যাদার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে[১০০]। রাসূল মুহাম্মদ (সা.) নারীর সেই মর্যাদা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি নিজে নারীকে সম্মানের চোখে দেখেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও নারীর সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীরা তাদের অধিকার ভোগ করেছেন।

---

৯৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী* (ঢাকা: মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ), পৃ. ২১৪

৯৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ* (ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ১১

৯৯. *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ২০০১, পৃ. ৩২৬-৩২৭

১০০. Rewben Lady, *The Social Structure of Islam* (London: Cambrize University Press, 1971), P. 92

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

প্রাক ইসলামী যুগে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো দুর্যোগময় সময়ে মুহাম্মদ (সা.) দু'টি কন্যাসন্তানের পিতাকে ভাগ্যবান বলে ঘোষণা করলেন। কন্যাসন্তানকে জীবন্ত মেরে ফেলা ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদানের কঠোর প্রথাকে নিষিদ্ধ করেন এবং এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন[১০১]। এভাবে ইসলাম ধর্ম নারী সমাজকে কেবলই জাহেলি যুগের জীবন্ত দাফন করার মত নিষ্ঠুর কুপ্রথা থেকে মুক্ত করেনি; সে সাথে নারীকে খুবই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম ও সভ্যতায় যেখানে নারীর অবস্থান ছিল চরম অপমানজনক, সেখানে ইসলাম নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের পক্ষে কথা বলেছে। ইসলাম নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলে থেমে যায়নি; সেই অধিকার বাস্তবায়নে পুরুষেরও ভূমিকা উল্লেখ করেছে এবং নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় পুরুষের প্রতিও বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ আরোপ করেছে।

ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ উভয়ই সমান অধিকারের দাবীদার। অযথা নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকে ইসলাম ভাল চোখে দেখেনি। সন্তান পুত্র হোক কিংবা কন্যা হোক, এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করেনা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান ও মেয়েদের উপর ছেলেদের অহেতুক প্রাধান্য দানকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন[১০২]। বিদায় হজ্জের ভাষণে 'নারী পুরুষ সম অধিকার' ঘোষণা করেন। সেই ভাষণে নবী মুহাম্মদ (সা.) দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'নারী জাতির কথা ভুলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না[১০৩]।' কুরআনেরও বহু আয়াতে নারী-পুরুষ সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। ঘরে বাইরে নারী একে অপররের পরিপূরক। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তারা (নারীরা) হচ্ছে তোমাদের (পুরুষদের) পরিচ্ছেদ; আর তোমরা (পুরুষরা) তাদের (নারীদের) পরিচ্ছেদ[১০৪]।'

ইসলামে নারীকে আধ্যাত্মিক জায়গা থেকেও বেশ মর্যাদাবান করেছে। ইসলামে বলা হয়েছে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। সন্তান যাতে তাদের মায়ের প্রতি যত্নবান হয় এবং মাতা-পিতাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সেজন্য কুরআনে সন্তানের শিশুকালের সেই অসহায় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'আমি

---

[১০১]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, পাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

[১০২]. জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী, *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ. ৫০

[১০৩]. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ. ৩৩৬

[১০৪]. কুরআন; ২ : ১৮৭

মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তার জননী তাকে (সন্তানকে) কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং স্তন্যপান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস[১০৫]।'

হয়রত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নিজ জীবনে নারীর প্রতি সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করে মানবজাতিকে শিখিয়ে গেছেন কিভাবে মায়ের জাতিকে সম্মান করতে হয়। হযরতের পিতৃব্য আবু লাহাবের সুয়াইবা নামে এক দাসী হযরতের জন্মের পর স্তন্যপান করিয়েছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) সারাজীবন তাঁর প্রতি যারপর নাই কৃতজ্ঞ ছিলেন। খাদিজার সাথে হযরতের বিয়ের পর খাদিজা (রা.) সুয়াইবাকে মুক্ত করার জন্য আবু লাহাবের নিকট থেকে ক্রয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবু লাহাব তাতে সম্মত হয় নাই। হিজরতের পুর্বেও মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সুয়াইবার সাথে দেখা হলে হযরত নিজে ও তাঁর স্ত্রী খাদিজা খুবই সম্মান প্রদর্শন করতেন। হিজরতের পরও প্রায়ই খোঁজ-খবর রাখতেন এবং উপঢৌকন পাঠিয়ে সুয়াইবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতেন।

খায়বার হতে ফেরার পর হযরত জানতে পারেন যে, সুয়াইবা মারা গেছেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র মাছরুহের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন যে মাতার পুর্বেই পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। সুয়াইবার অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনও সন্ধান করে পান নাই। পিতৃব্য পরিবারের একজন লাঞ্চিতা, উপেক্ষিতা, প্রপীড়িতা ক্রীতদাসী জগতের সমস্ত নির্মম ও কঠোর দুর্ব্যবহার সহ্য করার জন্য যার জন্ম, দুই-একদিনের জন্য অথবা দুই-একবার মাত্র স্তন্যপান করানোর কারণে জগত-সংসারের প্রচলিত হিসাবে তাতে কৃতজ্ঞ হবার কিছু নাই। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা.) কৃতজ্ঞতা ও সম্মান দেখিয়েছেন[১০৬]। এখানে নবী মুহাম্মদ (সা.) এর কৃতজ্ঞতাবোধের যেমন প্রমাণ মেলে, তেমনি নারী জাতির প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশেরও প্রতিফলন ঘটে।

আল্লাহ নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তাই পুরুষের যেরকম অধিকার রয়েছে, তেমনি নারীরও অধিকার রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, তিনি, যিনি জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, মানুষকে এবং যা তারা জানে না এমন প্রত্যেককে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন[১০৭]। নারীর স্বাধীন ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন, সমাজ জীবনে তার অংশগ্রহণ এবং আরো বিভিন্ন বিষয় শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং রাসূল (সা.) তা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

---

[১০৫]. কুরআন; ৩১ : ১৪

[১০৬]. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *মোস্তফা-চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

[১০৭]. কুরআন; ৩৬ : ৩৬

ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন নারী শরী'আ মেনে পুরুষের পাশাপাশি বৈধ সকল প্রকারের কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। নারীর অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার বিবরণ দিয়ে পবিত্র কুরআনে 'সূরা নিসা' নামে পূর্ণ একটি সূরাও নাযিল হয়েছে।

নারী প্রায় সকল যুগেই শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে পড়ে মুসলিম সমাজে পুরুষ যতটুকু শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল, নারী তার চাইতে আরো বেশি পশ্চাৎপদ ছিল। অথচ আজকের পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমানতালে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বিভিন্নভাবে তারা অবদান রাখছে। অনেকের ধারণা, ইসলাম নারীর অগ্রগতির সহায়ক নয়, নারীকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটা সময়ে মুসলিম নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উন্নতি করেছিল এবং মুফতি পর্যন্ত হয়েছেন কোন কোন নারী[১০৮]। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষাদীক্ষায় বহু নারীর উন্নতি উল্লেখ করার মতো। উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা (রা.) এর পান্ডিত্য উল্লেখ করার মতো। কুরআন, হাদীস, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, শরী'আ ও ফিকাহ, আরবের ইতিহাস ও বংশতালিকা নির্ণয়ে কেউ হযরত আয়েশার সমকক্ষ ছিলেন না[১০৯]।

নারীর কল্যাণে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম অবদান হচ্ছে উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। যখন পৃথিবীর কোথাও নারীর উত্তরাধিকার যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়নি, সেই সময়ে ইসলাম নারীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে। ইসলামী বিধান মতে, নারী তার পিতা-মাতা ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, উহা অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ[১১০]।' অনেকে বলে থাকে যে, ইসলাম যদিও নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে, কিন্তু ভাইয়ের অর্ধেক করে দিয়ে নারীকে সমমর্যাদা দেয়নি; কম সম্পত্তি দিয়ে পুরুষের তুলনায় নারীকে তুচ্ছ করা হয়েছে। আসলে এমন কথা যৌক্তিক নয়। সম্পত্তিতে নারীর যেটুকু অধিকার ইসলাম ঘোষণা করেছে, তা খুবই যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত। কয়েকটি দিক তুলে ধরছি:

---

[১০৮]. জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী, *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত পৃ. ৬২

[১০৯]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বিশ্বসেরা নারী* (ঢাকা: উত্তরণ, পরিবেশক মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৫১

[১১০]. আল কুরআন; ৪ : ৭

১. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের উৎপত্তির সঙ্গে ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের প্রতি সামাজিক আচরণের এবং সম্পত্তি বন্টনের ঐতিহাসিকতা বিদ্যমান[১১১]। জাহেলি যুগে এবং অন্যান্য অনেক ধর্ম ও সভ্যতায় যেখানে নারীর কোন মর্যাদাই ছিল না, ভোগ্যপণ্যের মতো তার মূল্যায়ন ছিল, জীবন্ত কন্যাসন্তানকে কবরও দেওয়া হতো; সেখানে এমন একটি প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীকে যে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বানিয়েছে, নারীর এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে। সম্পত্তিতে ইসলাম নারীকে যেটুকু অধিকার দিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম তা করতে পারেনি[১১২]।

২. ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিবারের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব এবং স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ পুরুষের উপর বর্তায়। পুরুষকে যেখানে সংসারের হাল ধরতে হচ্ছে, সেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তার অংশ দ্বিগুণ থাকাটা বাস্তবসম্মত। অন্যদিকে, নারীকে যেখানে সংসারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিতে হচ্ছে না, সেখানে যদি সে ভাইয়ের অর্ধেকও পায়, তাতে কম হয় না। কারণ তার উপর ব্যয় করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৩. একজন নারী কেবলই পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায় না, সে স্বামীর সম্পত্তিতেও পায়। ফলে নারী পিতার সম্পত্তিতে অর্ধেক পেলেও স্বামীর সম্পত্তিতে পাচ্ছে। অন্যদিকে, স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে পায় না। এই দিক বিবেচনা করলে ইসলাম নারীকে কম দেয়নি। বরং যথাযথ অধিকার দিয়েছে।

৪. বিয়ের সময় নারী মোহরানা পায়। এই মোহরানা স্ত্রী পায় স্বামী তথা পুরুষের কাছ থেকে। কুরআনে স্পষ্ট করে মোহরানা প্রদানের কথা বলা হয়েছে[১১৩]। প্রাক-ইসলামী যুগে স্ত্রীকে অর্থ দেওয়ার প্রথা থাকলেও সেটা ছিল মেয়ে বিক্রি করার মতো; কারণ সেই অর্থ পিতা বা নিকটাত্মীয় বিক্রেতা হিসেবে 'ক্রয়মূল্য' স্বামীর কাছ থেকে আদায় করতো[১১৪]। কিন্তু ইসলাম মোহরানা ঘোষণা করেছে, যা স্ত্রী পায়। পুরুষ বিয়ের সময় নারীর কাছ থেকে কিছু পায় না। আমাদের সমাজে বা বর্তমান ও অতীতের বিভিন্ন সমাজে যে যৌতুক ও পণ প্রথা চালু আছে বা ছিল, ইসলামে এমন খারাপ প্রথার কথা নেই। মুসলিম সমাজে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথা চালু থাকলেও ইসলামে এটা বলা হয়নি। নারী পিতার সম্পত্তিতে পাচ্ছে, স্বামীর সম্পত্তিতে পাচ্ছে, আবার বিয়ের সময় মোহরানাও পাচ্ছে; আর পুরুষকে মোহরানা দেওয়ার দায় কাঁধে নিতে হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনায় পিতার সম্পত্তিতে নারীর অর্ধেক প্রাপ্তি কোনভাবেই কম বলা যায় না।

---

[১১১]. ড. উম্মে আসমা, *জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার* (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ৫৫

[১১২]. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ. ৪৯৮

[১১৩]. কুরআন; ৪ : ২৪

[১১৪]. সা'দ উল্লাহ, *নারী: অধিকার ও আইন* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩), পৃ. ৩৫

৫. নারীর নিজস্ব উপার্জন থাকতে পারে। কিন্তু সে উপার্জনে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ বা কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। একজন পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য। এমতবস্থায় নারী উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে যে অধিকার পায় সেটা কোন অংশে কম নয়।

৬. বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তান যদি মায়ের কাছে থাকে তাহলে বাবাকে ভরণপোষণ ও খোরপোষ দিতে হবে। তালাকের পরও সন্তানের আর্থিক দায় নিতে হচ্ছে না নারীকে। অতএব, সম্পত্তিতে নারী কম পায়নি।

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে যে অধিকার দিয়েছে, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে নারী সেটা ভোগ করতে পারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, যেসব নারী পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার দাবী করে তাদের বেশিরভাগই বিবাদহীনভাবে সম্পত্তির অধিকার বুঝে পায় না। এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। ইসলাম এমন বিভেদ খুবই অপছন্দ করে। মুসলিম দেশগুলোর ভেতর তিউনিশিয়া, তুরস্ক, মালয়েশিয়ার নারী সমাজ শরী'আ ধর্মীয় বিধান বিষয়ে কাজ করে প্রমাণ করেছে নারী পুরুষের মধ্যে বিভেদ ধর্মীয় বিধানে নেই, সামাজিক রক্ষণশীলতাই নারী-পুরুষের ভেতর বিভেদ জিইয়ে রাখছে[১১৫]।

ইসলামে নারীর অধিকার নজিরবিহীন স্বীকৃত হলেও ইসলামের অপব্যাখা এবং মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সময় বিদ্যমান নানা কুসংস্কারের কারণে নারী ইসলাম প্রদত্ত তার যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কুরআনের নারী সংক্রান্ত কিছু আয়াত, কিছু হাদীস এবং শরীয়তের বিভিন্ন দিকের অপব্যাখা অনেকে করে থাকেন। ফলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা তৈরী হয়। ইসলামের সৌন্দর্য ও মূলবানী ঠিকমতো উপস্থাপন করার ব্যর্থতায়ও অনেকে ইসলামকে নারী-বিরোধি বলে মন্তব্য করে বসে। আসল কথা হচ্ছে, ইসলামে দৈহিক গঠন কাঠামো ব্যতিত সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য স্বীকার করেনা। ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট। আর তা বর্তমান পশ্চিমা চিন্তাধারা জন্মের বহু আগে থেকেই[১১৬]। নারী সম্পর্কিত ইসলামের বক্তব্যগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি, ভুল ও অপব্যাখা না করা এবং মুসলিম সমাজে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঠিকমতো বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নারী নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে তৈরী হয়ে আছে, তার অপনোদন করা সম্ভব। ভুল অপনোদনের সাথে সাথে রাজনৈতিক অধিকারসহ নারীর সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

---

[১১৫]. ড. উম্মে আসমা, *জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[১১৬]. জাস্টিস মাওলানা তকী উসমানী, *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত একটি ইস্যু। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। অনেক নারী পুরুষের পাশাপাশি কিংবা কখনো পুরুষের উর্দ্ধে উঠে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং করছেন। কিন্তু এগুলো একেবারেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এ সবের ফলে সামগ্রিকভাবে নারী সমাজের কোনো উন্নতি হয়নি কিংবা নারী সমাজ পুরুষের সমঅধিকার নিয়ে রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি[১১৭]।

এটা ঠিক যে, আগের তুলনায় রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। অচলায়তন ভেঙে অনেক নারী রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক কার্য্যক্রম ইত্যাদিতে সক্রিয় হচ্ছে। ফলে সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে নারীরা তাদের অবস্থানকে আগের তুলনায় অনেকটা সুসংহত করতে পেরেছে। এটাও ঠিক যে, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সক্রিয় ভূমিকা রাখতে গিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতারও শিকার হচ্ছে। এমন প্রতিবন্ধকতা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কারণেও হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন কিছু নীতি প্রণয়ন করে যা কিনা পুরুষ প্রধান মূল্যবোধ আরোপণ ও স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে[১১৮]।

বিভিন্ন সমাজে নারী বৈষম্য আর অবহেলার শিকার। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার আর নির্যাতন-নিপীড়নের বেড়াজালে তাকে অবদলিত করে রাখা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। নারী সেখান থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার পারেনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করে সামনে এগুতে হচ্ছে। বিশেষ করে রাজনীতিতে নারী অংশ নিতে কিংবা অংশগ্রহণের পর সেখানে জায়গা করে নিতে তাকে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর একটা বিষয় তো আছেই। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে আধিপত্য ও অধীনতার[১১৯]। আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অন্য অনেক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি ধর্ম এবং ধর্মের ভুলব্যাখাও নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে একটি বড়

---

[১১৭]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬), পৃ. ৮৫

[১১৮]. মেঘনা গুহঠাকুরতা, *নারী ও রাষ্ট্র (প্রবন্ধ)*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩), পৃ. ৬৪

[১১৯]. ড. বিলকিস রহমান, *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩), পৃ. ১৫

প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম এবং তাদের জীবন ও প্রাত্যাহিক কার্যক্রম ইসলাম ধর্ম দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়। কাজেই মুসলিম-প্রধান এদেশের নারী অধিকারের প্রশ্নটি প্রত্যক্ষভাবে ইসলামে নারী অধিকারের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ইসলাম নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে কথা বলেছে। সমুদয় আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ভূমিকা পালনে ইসলামের রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন[১২০]। সমস্যামুক্ত পরিবেশে বাঁধাহীনভাবে ইসলাম নারীকে তার নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখে বিভিন্ন অধিকার দিলেও তার অনেকগুলোর চর্চা সহজে হয় না মুসলিম সমাজে। ফলে ইসলাম ধর্মের নামে নারীর বিরুদ্ধে এমন কিছু আচরণ করা হয়, যা প্রকৃত পক্ষে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকারের পরিপন্থি এবং সেগুলো ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়[১২১]। ফলে ইসলামের আলোকে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল ধারণা লাভ করা উচিত। কুরআনকে অনেকে নারী অধিকারের অধিকার বিল (Feminist Bill of Rights) বলে মনে করেন[১২২]। এতে নারীর পূর্ণ অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক অধিকারসহ নারীকে তার পূর্ণ অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে সংকুচিত করা হয় নারী নেতৃত্ব হারাম, নারী বাহিরে যেতে পারবে না, পর্দা করা ফরজ এবং রাজনীতি করলে পর্দা করা যায় না ইত্যাদি কথা বলে। আসলে ইসলাম সম্পর্কে যারা কট্টর মনোভাব পোষণ করেন, তুলনমূলক কম জ্ঞান রাখেন কিংবা নানা কারণে ইসলামের ভুল ও অপব্যাখা করেন; তারাই কেবল এমন যুক্তি ও কারণ হাজির করেন। এসব ধারণা ও যুক্তি সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

নারী নেতৃত্ব আসলেই কি হারাম?

ইসলামে নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ- কথাটি নতুন নয়। এই ধারণাটি শুধু বাংলাদেশে নয়; পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে ও মুসলিম সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত। বাংলাদেশের আলেম সম্প্রদায়ের বড় অংশটি নারী নেতৃত্বের ঘোর বিরোধী

---

[১২০]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, ভাবানুবাদ: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, প্রথম সংস্করণ ২০১২), পৃ. ২৬৫

[১২১]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[১২২]. Tajul Islam Hashmi, *Women and Islam in Bangladesh, Beyond Subjection and Tyranny* (New York: Macmillan Press Ltd, 2000), P. 12

এবং তারা ধর্মপ্রাণ মানুষকে তাদের মতের স্বপক্ষে প্রভাবিত করেন। দেশের নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত সকল ইসলামী রাজনৈতিক দলও নারী নেতৃত্ব এবং রাজনীতিতে নারীর আগমনের বিরোধি। নারী নেতৃত্ব হারাম- এমন ধারণা ও বিশ্বাস থেকে তারা নারীকে রাজনীতিতে ঠাঁই দিচ্ছে না। ২০০৮ সালের ১৩ জুলাই তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে একটি ইসলামী দল লিখিত স্মারকলিপি দিয়েছিল যেন সাংবিধানিকভাবে নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়[১২৩]।

'নারী নেতৃত্ব হারাম' বলতে মূলত কী বোঝানো হয়েছে? এর মানে কি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নারী আসতে পারবে না? নারীর রাজনৈতিক কোন অধিকার কি নেই? নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ আসলেই কি নিষিদ্ধ? এ সংক্রান্ত হাদীসটি বা হাদীসের ভাষ্য শাব্দিক অর্থে কতটা গ্রহণযোগ্য? কয়েকটি পয়েন্টে 'নারী নেতৃত্ব হারাম' সংক্রান্ত হাদীস (মূল হাদীসটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে) নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. হাদীসটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক; কারণ কুরআনে নারী নেতৃত্বের ইতিবাচক বর্ণনা রয়েছে; কুরআনের কোথাও নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোন আলোচনা নেই।
২. নারী নেতৃত্ব হারাম সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল হাদীস হিসেবে চিহ্নিত; উষ্ট্রের যুদ্ধে আয়েশা (রা.) এর নেতৃত্বের প্রেক্ষাপটে হাদীসটির অবতারণা হয়; অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হাদীসটির অবতারণা হয়।
৩. একটি প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট একটি খবর প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (সা.) এর একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া।
৪. হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাথেও সাংঘর্ষিক; কারণ রাসূল (সা.) এবং সাহাবাগণের সময়ে রাজনীতিসহ বহিঃস্থ কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ ছিল।

কুরআনে নারী নেতৃত্বের ইতিবাচক বর্ণনা

কোনো বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে হলে ঐ সম্পর্কে কুরআনের মূল বিধান দেখতে হবে এবং সেটা সব সময় কেবলই শাব্দিক অর্থে গ্রহণ না করে নাযিলের প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে কুরআনের বিধান ও নির্দেশনা বুঝতে হবে। সংশ্লিষ্ঠ বিষয় সম্পর্কে কুরআনে কোন ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত থাকলে তাও দেখতে হবে এবং তারপর দেখতে হবে রাসূল (সা.) এর নির্ভরযোগ্য হাদীসে কি আছে এবং এসবে সমন্বিত ব্যাখা করতে হবে[১২৪]।

---

[১২৩]. হাসান মাহমুদ, *'নেত্রীত্ব' বনাম নেতৃত্ব (নিবন্ধ)*, বিডিনিউজ, ১৭ মে ২০১৭

[১২৪]. ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান, *রাজনীতিতে আলিমসমাজের প্রভাব (বাংলাদেশ: ১৯৭২-২০০১)*, (ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৮), পৃ. ১৬৫

নারী নেতৃত্ব হারাম- হাদীসে এমন একটি ঘোষণা থাকলেও কুরআনের কোথাও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে নিষেধ করা হয়নি, নারী নেতৃত্বের বিপক্ষে কোন একটি আয়াতও নেই। কুরআনে পরোক্ষভাবে নারী নেতৃত্বের পক্ষে কথা আছে, আর হাদীসে বিপক্ষে কথা আছে। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, হাদীসটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক; এমনটি হতে পারে না। আসলে হাদীসটি দুর্বল। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনায় যাচ্ছি।

কুরআনে নারী নেতৃত্বের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় উদাহরণ সাবার[১২৫] রাণী বিলকিসের আলোচনা। বলা হয়েছে, 'আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে[১২৬]।' রাণী বিলকিসের কাহিনী কুরআনে ইতিবাচকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব ও শাসন পরিচালনা পদ্ধতিও ইতিবাচকভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'হযরত সোলাইমান (আ.) এর দরবারে তাঁর দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় পাওয়া যায়[১২৭]।' কুরআনের কথা অনুযায়ী, বিলকিস এমন এক শাসকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, যিনি তার দেশের জনগণের পক্ষে পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতিহাস বলে রাণী বিলকিসের নেতৃত্বে সাম্রাজ্য ব্যর্থ হয়ে যায়নি; বরং প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তিনি। স্বয়ং হুদহুদ পাখি, যে পাখি সোলাইমান (আ.) এর সাম্রাজ্যের শানশওকতে অভ্যস্ত, সেও বিলকিসের নেতৃত্বাধিন সেই সাম্রাজ্যের শৌর্য-বীর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল এবং মুগ্ধ হয়েছিল। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, নারী নেতৃত্বের ইতিবাচক দিক বা নারী নেতৃত্ব জায়েজ, সেটা উম্মতে সোলাইমানের জন্য প্রযোজ্য, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নয়। এমনটি বলা খোঁড়া যুক্তি।

কুরআনের প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি আয়াত নাযিল হয়েছে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য এবং অনাগতকালের মানুষের জন্য। প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য ছাড়া কেবলই কাহিনী বর্ণনা করার জন্য কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি। ফলে রাণী বিলকিসের নেতৃত্ব, রাজত্ব এবং রাজকীয় দাওয়াতে নবী সোলাইমান (আ.) এর দরবারে আগমন, এই বিশেষ ঘটনাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

---

[১২৫]. সাবা বর্তমান ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি স্থান। রাণী বিলকিস হযরত সোলায়মান (আ.)-এর যুগে সাবায় বসবাস করতেন এবং এখান থেকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন।

[১২৬]. কুরআন, ২৭: ২৩

[১২৭]. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্নু কাসীর, *তাফসীর ইব্নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ৪১৯

কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও বিবরণ যেহেতু প্রয়োজনীয় এবং মুহাম্মদী উম্মতের জন্য সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয় রয়েছে; সেহেতু সূরা নামলে পিপীলিকার কাহিনী বর্ণনার মধ্যেও রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় কিছু, যদি আমরা সেই শিক্ষণীয় জিনিসটি খুঁজে নিতে পারি। এখানে রাণী বিলকিসের কথা যেমন ইতিবাচকভাবে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি পিপীলিকাদেরও এক রাণীর কথা ইতিবাচকভাবে এসেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'যখন তারা (হযরত সোলাইমান ও তাঁর বাহিনী) পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সোলাইমান ও তার বাহিনীর অজ্ঞাতসারে তোমরা তাদের পদতলে পিষে যাবে[১২৮]।'

নারীবাচক বিবরণে ওই পিপীলিকার কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই পিপীলিকা সিরিয়া বা শাম দেশের উপত্যকার ওই পিপীলিকা বাহিনীর রাণী বা নেত্রী ছিল এবং সোলাইমান (আ.) এর সৈন্যবাহিনী সে প্রত্যক্ষ করছিল। পিপীলিকাদের রাণীর কথা কুরআনে ইতিবাচক ভাষায় উল্লেখ করাও বিশেষ অর্থবহ। পিপীলিকা বাহিনীর নেত্রীর বাণীর মধ্যে যেমন উপদেশ বাক্য আছে তেমনি নেতৃত্বের জায়গা থেকেও কুরআনে একটি স্ত্রী পিপীলিকার উল্লেখের মধ্যেও গূঢ় রহস্য ও উপদেশ রয়েছে।

হযরত সোলাইমানের দরবারে তাঁরই আমন্ত্রণে রাণী বিলকিস আগমন করেন এবং নবী সোলাইমান বিলকিসকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেন, ভিনদেশের এই নারী শাসকের সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথাও বলেন। নবী সোলাইমান কর্তৃক রাণী বিলকিসকে ভালভাবে দেখার বিষয়টিও কুরআনে এসেছে[১২৯]। নারীর রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিষয়ের জায়গা থেকে এখানে কয়েকটা দিক চলে আসে:

১. 'আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি'- হুদহুদ পাখির কাছ থেকে এমন সংবাদ প্রাপ্তির পর নারী শাসকের কথা শুনে সোলাইমান (আ.) ক্ষিপ্ত হননি বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। রাণী বিলকিস ও তার জাতির অগ্নি উপাসনার বিষয়টি ভালভাবে নেননি নবী সোলাইমান (আ.)। কুরআনে রাণী বিলকিস সংক্রান্ত আলোচনায় নেতিবাচক কথা যেটুকু এসেছে সেটুকু হচ্ছে বিলকিস ও তার

[১২৮]. কুরআন, ২৭: ১৮

[১২৯]. নবী সোলাইমান (আ.) ও রাণী বিলকিসের সরাসরি সাক্ষাত ও কথোপকথনের বিষয়টি সুরা নামলের ৪৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতে রাণী বিলকিসের পায়ের গোছা অনাবৃত হওয়ার কথাটি এসেছে। তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে বলা হয়েছে, বিশেষ কারণে সোলাইমান (আ.) বিশেষ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে বিলকিসের পায়ের গোছা বা বড় বড় চুল দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন বিয়ে করার উদ্দেশ্যে পায়ের লোমগুলো দেখার জন্য কৌশলী হন এবং সোলাইমান (আ.) তা দেখেছিলেনও। এই বড় বড় লোমগুলো ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে ফেলবারও পরামর্শ দেন তিনি।

জাতির ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়টি। সোজা কথায়, কুরআনে সুরা নামলে সাবার রাণী বিলকিস ও তার নেতৃত্বাধিন জাতির অগ্নি উপাসনার বিষয়টি নেতিবাচকভাবে বিধৃত হয়েছে, নারী নেতৃত্ব নিয়ে নেতিবাচক কথা বলা হয়নি।

২. সংবর্ধনার বিষয়টি সাধারণত রাজনীতি ও শাসনক্ষমতায় থাকেই। কেউ নেতৃত্বের চেয়ারে আসীন হলে বা রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী পেলে আজকের যুগেও বিভিন্ন উপলক্ষে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সোলাইমান (আ.) একজন নারী শাসককে সংবর্ধনা দিতে পারলে এবং সেই সংবর্ধনার বিবরণ কুরআনে ইতিবাচক ভাষায় বর্ণিত হলে তাতে কি একথা বলা যায় না যে, নারী তার যোগ্যতাবলে রাজনীতিতে বড় পদে আসতে পারে এবং নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়ার পর কোন উপলক্ষে সংবর্ধনাও পেতে পারে।

৩. রাজনীতি করলে দুর-দুরান্তে সফর এবং কাউকে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের বিষয়টিও থাকে। রাণী বিলকিসকে রাজকীয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সোলাইমান (আ.) এবং সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দুর দেশ সফরেও এসেছিলেন ওই নারী শাসক। কুরআনে এই রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সফরকে নেতিবাচক ভাষায় বর্ণনা করা হয়নি। তাহলে আজকের যুগে একজন রাজনৈতিক নারী কেন দুর-দুরান্তে সফরে যেতে পারবে না? সোজা কথায়, রাজনীতি করলে শুধু ঘরের বাইরেই নয়; বহু দুরেও সফরে যেতে হয় একজন নারীকে। সেই কথা এসেছে কুরআনে বর্ণিত রাণী বিলকিসের এই কাহিনীতে।

৪. একজন নারী যদি রাজনীতি করে, তাকে প্রয়োজনে পুরুষের সাথে কথা বলতে হয়, পুরুষের সামনা-সামনিও বসতে হয়; অন্যকথায় প্রয়োজনে পুরুষও ওই নারীর সাথে বসবেন এবং কথা বলবেন। নবী সোলাইমান (আ.) রাণী বিলকিসের সাথে সরাসরি কথা বলা ও দেখা করার বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন যেখানে নবী সোলাইমান ও রাণী বিলকিসের মধ্যকার বৈঠককে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেনি, আমরা তাহলে কেন একটি দুর্বল হাদীসের প্রেক্ষিতে নারীর রাজনীতি ও নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে আপত্তি জানাবো।

জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় রাণী বিলকিস হযরত সোলাইমান (আ.) এর সমকক্ষ না হলেও তাঁর কাছাকাছি ছিলেন বলে ঐতিহাসিকদের মত[১৩০]। নবী সোলাইমানের দরবারে আসার পর রাণী বিলকিস ইসলাম গ্রহণ করেন; এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর কুরআন নিশ্চুপ। বিলকিসকে সোলাইমান (আ.) কি বিয়ে করেছিলেন কিংবা এরপরও কি বিলকিসের রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা অব্যাহত ছিল? এসবের বিবরণ কুরআনে আর নেই। ফলে এর পরের ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন

[১৩০]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বিশ্বসেরা নারী* (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৬), পৃ. ২৮

ইসলামিক স্কলার বিভিন্ন মত দেন। তাফসিরে জালালাইনে বলা হয়েছে, 'জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সোলাইমান (আ.) এর সাথে বিলকিসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, ব্যাপারটি 'ইসলাম গ্রহণ করা' পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে। কুরআন পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করেছে। অতএব আমাদের এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সোলাইমান (আ.) এর সাথে বিলকিস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়[১৩১]।' নবী সোলাইমানের দরবার থেকে ফেরার পর 'বিলকিস রাজত্ব হারিয়েছেন'- এমন কথাও কুরআনে বলা হয়নি। অতএব, কুরআন নারী নেতৃত্বের বর্ণনায় ইতিবাচক।

নারী নেতৃত্ব হারাম সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল

যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে নারী নেতৃত্বের বিরোধিতা করা হয়, হাদীসটি হচ্ছে, হযরত আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন আমি মহা উপকৃত হয়েছি, যে সময় আমি উষ্ট্রের যুদ্ধে উটওয়ালা লোকদের পক্ষে প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিলাম। তখন রাসূলের কাছ থেকে শোনা সে বাণীটি আমার মনে পড়লো যে, যখন নাবী (সা.) এর কাছে এ খবর পৌঁছল, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের রাণী মনোনীত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষণো সফল হবে না যাদের নেতৃত্বে নারী বসে[১৩২]।'

এটি দুর্বল হাদীস এবং অনেকে বলে থাকেন, এটা জাল হাদীস। হাদীসটি ব্যবচ্ছেদ করলে যা পাওয়া যায়--

১. হাদীসটির বর্ণনাকারী মাত্র একজন এবং এই বর্ণনাকারী হযরত আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ইফকের ঘটনার সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে, অর্থাৎ তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন। তবে অনেক হাদীস বিশারদের মত হচ্ছে, আবু বাকরাহ (রা.) এর বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে; কারণ তিনি অনুশোচনা করেছিলেন।
২. আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুগীরা (রা.) এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছিলেন। অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষী হাজির করতে না পারায় তাঁকে অভিযোগ প্রত্যাহার

[১৩১]. জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী, *তাফসীরে জালালাইন (৪র্থ খণ্ড)*, মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম অনুদিত (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১১), পৃ. ৭২২
[১৩২]. সহিহ বুখারী, হাদিস: ৪৪২৫; সহিহ ইবনে হিব্বান- ৪৫১৬

করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ফলে খলিফা হযরত উমর (রা.) তাঁকে কুরআনে বর্ণিত শাস্তি প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর যে কোনো সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়[১৩৩]।

৩. হাদীসটি উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবতারণা হয়। রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন চিকিৎসা, ইতিহাস ও তর্কশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত নাম। তিনি নবীর সাথে অনেক যুদ্ধে গিয়েছেন। খলিফা আলী (রা.) এর সময় উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন[১৩৪]। এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে নারী নেতৃত্ব হারাম সংক্রান্ত হাদীসটির অবতারণা হয় এবং সেটা হযরত আয়েশা (রা.) এর বিপক্ষে। নবীর স্ত্রী যেখানে একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেখানে এই হাদীসটির অবতারণা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

৪. এই হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে হযরত আয়েশা (রা.) যুদ্ধে পরাজিত হবার পর। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা.) এর বিরুদ্ধে ছিলেন নবীপত্নী আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) এর বাহিনী। এই যুদ্ধে তালহা (রা.) ও জুবাইর (রা.) নিহত হন এবং হযরত আয়েশা (রা.) বন্দিনী হন[১৩৫]। বিশেষ বিবেচনা ও সম্মানের সাথে তাঁকে পরে মদীনায় প্রেরণ করার পর হযরত আলী (রা.) বসরায় প্রবেশ করে শহরের গণ্যমান্য লোকদের ডেকে পাঠান। আবু বাকরাহ ছাকাফী তখন হযরত আলী (রা.)-কে এই হাদিস শোনান[১৩৬]।

৫. আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) দাবী করেছেন, তিনি হযরত আলীকে বলেছেন যে উষ্ট্রের যুদ্ধের আগে তিনি নাকি এই হাদীসের বিষয়টি হযরত আয়েশা (রা.)-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। চিঠিতে এই হাদীসের কথা জানানোর পরেও বিবি আয়েশা (রা.) যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর দাবী যদি সত্যও হয়ে থাকে তাহলে হযরত আয়েশা (রা.) এই হাদীস বিশ্বাস করেননি? তিনি নিজে রাসূলের স্ত্রী ছিলেন এবং সে সাথে একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদও ছিলেন।

৬. এই হাদীস জানার পরও আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) বিবি আয়েশা (রা.) এর পক্ষে যুদ্ধে 'প্রায় যোগ দিয়ে ফেলেছিলাম', অর্থাৎ তিনি বিবি আয়েশার (রা.) পক্ষে যুদ্ধ না করলেও তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত

---

[১৩৩]. জাসের আওদা, *নারী নেতৃত্ব কি হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ (রিক্লেইমিং দ্যা মস্ক গ্রন্থ থেকে)*, অনুবাদ জোবায়ের আল মাহমুদ, সিএসসিএস (সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র) ওয়েবসাইট, এপ্রিল ৭, ২০২০ (https://cscsbd.com/3303)

[১৩৪]. ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ইরাকের বসরায় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উসমান হত্যার বিচারের দাবীতে এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ বা উটের যুদ্ধ অথবা জামালের যুদ্ধ নামে পরিচিত। হযরত আয়েশা (রা.) এই যুদ্ধে এক পক্ষের নেতৃত্ব দেন। তিনি উটের পিঠে চড়ে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে এই যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়।

[১৩৫]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৮), পৃ. ৩৮

[১৩৬]. হাসান মাহমুদ, *'নেত্রীত্ব' বনাম নেতৃত্ব (নিবন্ধ)*, বিডিনিউজ, ১৭ মে ২০১৭

হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কোন কারণে তিনি এই যুদ্ধে যোগ দেননি। নারী নেতৃত্ব বিরোধি একটি হাদীস জানা সত্ত্বেও কেন তিনি আয়েশার পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন? এবং শেষ পর্যন্ত কেন অংশ নেননি। তারপর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭. নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর সুদীর্ঘ ২৪ বছর পর[১৩৭]। এই ২৪ বছরে আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) হাদীসটি আর কারো কাছে বর্ণনা করেননি কেন? উষ্ট্রের যুদ্ধে যদি হযরত আয়েশা (রা.) জিতে যেতেন, তাহলে কি এমন হাদীস তিনি বর্ণনা করতেন? সোজা কথায়, হাদীসটি একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হাদীসটি অবতারণা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৮. অনেক হাদীস নবী (সা.) বর্ণনা করেছেন অনেক সাহাবীর কাছে। কিন্তু এমন একটি হাদীস যার সাথে মুসলিম নারীর সম্মান ও অধিকারের বিষয়টি জড়িত, এমন গুরুত্বপূর্ণ হাদীস রাসূল (সা.) আর কারো কাছে বর্ণনা করেননি। যে বিদায় হজ্জের ভাষণে নারীর সমতার কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি এমন কথা বলেননি। এখানে প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

৯. হযরত মুহাম্মদ (সা.) যা বলেছেন, করেছেন ও অনুমোদন দিয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এর সার্বজনীন আবেদন রয়েছে। 'নারী নেতৃত্ব সফল হয়না'- রাসূলের এমন কথা বা এই হাদীসেরও সার্বজনীনতা দরকার। নারী নেতৃত্ব মানেই কি দুর্বল, ব্যর্থ, অসফল? বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী পালন করলো ২০২১ সালে। পৃথিবীর মানচিত্রে দেশটি অভ্যুদয়ের এই ৫০ বছরের বেশির ভাগ সময় তথা ২৭/২৮ বছর দেশটি নারী নেতৃত্ব কর্তৃক শাসিত হয়েছে এবং এখানো হচ্ছে। ভুলত্রুটি সত্ত্বেও পুরুষ শাসনের চাইতে নারী শাসন ভাল চলছে। নারী নেতৃত্বের কারণে অমঙ্গলের বাঁশি বাজেনি। রাসূলের হাদীসের সার্বজনীনতার দিকটি খেয়াল করলেও এই হাদীসকে জাল বা দুর্বল হাদীস বলা যায়।

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার সূত্র অনুযায়ী এবং হাদীসটি অবতারণার প্রেক্ষাপট এবং অন্য আরো কিছু বাস্তবতার পর্যালোচনায় নারী নেতৃত্ব-বিরোধি হাদীসটি সহজে গ্রহণ করা যায় না। সরাসরি যদি জাল হাদীস যদি না-ও বলা যায়, এটা যে দুর্বল হাদীস-- সে কথা বলা যায়। একটি দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে মুসলিম সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে কেন সরিয়ে রাখা হবে রাজনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র থেকে?

---

[১৩৭]. হাসান মাহমুদ, *'নেত্রীত্ব' বনাম নেতৃত্ব (নিবন্ধ)*, বিডিনিউজ, ১৭ মে ২০১৭

বিশেষ প্রেক্ষাপটে নারী নেতৃত্ব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

দুর্বল হোক আর যা-ই হোক, এই হাদীসটি ছিল বিশেষ একটি প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ সংবাদের প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) এর একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। আবু বাকরাহ ছাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের বিবরণেও সেই প্রসঙ্গ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসেও বলা হয়েছে, পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে বসানোর পর এই ঘটনা জানার পর রাসূল (সা.) এমন মন্তব্য করেন[১৩৮]।

হাদীসটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উপলব্ধি করা উচিত। 'যে জাতি নারীর হাতে তাদের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছে সে জাতি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না'- রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই উক্তির মানে এই ছিল না যে, অগ্নিপূজারী পারসিকরা একজন নারীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে ব্যর্থতার দিকে যাওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; একজন সুযোগ্য পুরুষ ক্ষমতায় বসে সাফল্যের অধিকারী হলে ইসলামের এই দুশমনদের সাফল্যে কি তিনি খুশি হতেন[১৩৯]।

পারস্য এতোটা দাপুটে একটি সাম্রাজ্য ছিল যে, উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে এই সাম্রাজ্য জয় করতে বহু হিমশিম খান এবং অবশেষে জয় করেন। তখন পারস্যের সিংহাসনে ছিল নতুন সম্রাট ইয়াজদ্‌জর্দ। প্রথমে মুসলিম বাহিনী ইয়াজদ্‌জর্দের বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। ফলে পারস্য বাহিনী মুসলমানদের দেশ দখলের দিকে এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্যবাহিনী পরাজিত হয়[১৪০] এবং সময়ের ব্যবধানে আস্তে আস্তে সেই এলাকা মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে। যাহোক, সেদিন রাসূলের জীবদ্দশায় কিসরার কন্যা ক্ষমতায় বসেছিলেন পুরুষ নেতৃত্বের দেউলিয়াত্বের ফলশ্রুতিতে। এটা নারী নেতৃত্বের কোন অপরাধ নয়, বরং জাতির নেতৃত্বে দেউলিয়াত্বের পরিচায়ক[১৪১]। এরূপ অবস্থায় পতিত হলে কোন জাতি সাফল্যের অধিকারী হতে পারে না। পারস্যের সেই জাতির পতন শুরু হয়েছিল পুরুষ নেতৃত্ব ক্ষমতার চেয়ারে আসীন থাকাকালীন। এই আনাড়ি নারীর সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে সেই পতন আরো ত্বরান্বিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উমরের শাসনামলে চূড়ান্ত পতন হয়।

কিসরা বা খসরু পারভেজ পারস্যের সম্রাট ছিলেন। ৫৭৯ সাল থেকে ৬২৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি রাজত্ব করেন। তিনি পারস্যের শেষ সম্রাট যিনি ইরানে মুসলিম বিজয়ের পুর্বে একটি দীর্ঘ সময় রাজত্ব করেন। তার নিহত

---

[১৩৮]. *তাফসীরে জালালাইন (৪র্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

[১৩৯]. নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে* (ঢাকা: কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃ. ২২

[১৪০]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পারস্যে মুসলিম বিজয়ের সূচনা ঘটে। ইসলামের ইতিহাসে খসরু পারভেজের আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার নিকট দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিখানি খসরু পারভেজকে পড়ে শুনানোর পর সে অহংকারের সাথে চিঠিখানি ছিড়ে ফেলে[১৪২]। ইয়েমেনে নিযুক্ত গভর্ণর বাজানকে নির্দেশনা পাঠায় মুহাম্মদ (সা.) কে বন্দি করে নিয়ে আসার জন্য।

কিসরার এই বেয়াদবীর সংবাদ রাসূল (সা.)-এর কাছে যথাসময়ে পৌছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) খসরুকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তার বাদশাহী ছিন্নভিন্ন করে দিন'[১৪৩]। ইতিহাস সাক্ষী, এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তার পতন হয়েছিল। পুত্র শিরোওয়াই পিতা খসরু পারভেজকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে।

কিসরা-কন্যা সিংহাসনে বসার আগে পারস্য সাম্রাজ্যে দীর্ঘদিন কোন নারী শাসক হন নাই। পুরুষরাই ক্ষমতার উত্তরাধিকার হতো। কিসরা নিহত হওয়ার পর পারস্য গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়, যা চলে ৬২৮ থেকে ৬৩২ সাল পর্যন্ত। বুরানদাখত বা পরান্দখত ছিলেন পারস্য সম্রাটের কন্যা। চার শত বছরের ইতিহাসের রেকর্ড ভঙ্গ করে ৬২৯ সালের ৯ জুন তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। এই সিংহাসনে বসার আরেকটু প্রেক্ষাপট আছে।

কিসরা নিহত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে তার পুত্রও নিহত হয় এবং সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয় প্রধান সেনাপতির। তখনকার অভিজাত শ্রেণির লোকজন ও পাদ্রীরা কোনভাবেই চায়নি যে, রাজপরিবারের বাহির থেকে কেউ সিংহাসনে বসুক। যদিও তারা নারী নেতৃত্বের ঘোর বিরোধি ছিল, কিন্তু পুরুষ উত্তরাধিকারের অভাবে তারা তখন বুরানদাখতকে শাসক বানায়। মাত্র এক বছর চার মাসের মাথায় এই নারী শাসক ৬৩০ সালে একজন বিদ্রোহী জেনারেল কর্তৃক নিহত হন বলে কথিত রয়েছে। তার ছোটবোনও সিংহাসনে বসেছিলেন।

ফলে এটা বলতে হবে যে, উক্ত হাদীসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট পারস্যের দুই জন সম্রাটের পর পর নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি। তখনকার পরিস্থিতি এবং গৃহযুদ্ধের কারণে এটা বুঝা যাচ্ছিল যে, পারস্য সাম্রাজ্য আর বেশিদিন টিকবে না। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই সাম্রাজ্য

---

[১৪২]. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতূম*, খাদিজা আখতার রিজায়ী অনূদিত (আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ঢাকা, নবম সংস্করণ ২০০৩), পৃ. ৩৬৪

[১৪৩]. প্রাগুক্ত

রক্ষার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে নিহত সম্রাট কিসরার কন্যাকে সিংহাসনে বসানো হয়। যার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) মন্তব্য করেছিলেন যে, পারস্যবাসীরা তাদের নতুন রাণীর নেতৃত্বে কখনোই সফল হবে না।

শাসক একজন নারী হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের সম্রাট ও রাজপুত্র একের পর এক নিহত হওয়া এবং রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে তারা ব্যর্থ হবে- এটিই ছিলো তাঁর কথার মর্ম[১৪৪]। যে সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলের আগেরই ছিল, সেখানে একজন নারীর সিংহাসনে বসার পর এমন মন্তব্যকে বলা চলে তাঁর আগের মন্তব্যেরই ধারাবাহিকতা। ফলে এটা বলা যায়, রাসূল (সা.) এর এই মন্তব্য পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীর অংশ, নারী নেতৃত্বের বিরোধিতার জন্য নয়।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক, ২০১৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ট ট্রাম ও হিলারী ক্লিনটন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নারী হিলারী ক্লিনটন তুলনামূলকভাবে যোগ্য ছিলেন এবং এর আগে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বলে নেতৃত্বের তার পুর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল। অন্যদিকে, পুরুষ ডোনাল্ট ট্রাম্প পাগলাটে প্রকৃতির লোক। এমন এক লোক শেষ পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের একবছরের মাথায় বিবিসির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা, একগুঁয়ে ব্যক্তিত্ব, এবং কথা বলার এমন এক ভঙ্গি যা আগে ওয়াশিংটনে প্রশাসকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি[১৪৫]।' যাহোক, উদাহরণ হিসেবে ধরুন, ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ একজন বলল, 'যে জাতি একজন পুরুষকে নির্বাচিত করেছে, তারা ভুল করেছে।' এমন মন্তব্যের পুরুষ বলতে নির্দিষ্ট করে আমেরিকার নারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিজয়ী পুরুষ তথা ট্রাম্পকে বুঝাবে, এই মন্তব্যের পুরুষ দিয়ে পুরো পুরুষ জাতিকে বুঝাবে না এবং অন্য কোন দেশকেও বুঝাবে না। কারণ পরাশক্তি হওয়ার কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়টি অন্য যে কোন দেশের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচনের পর পর এমন মন্তব্যের মাধ্যমে যে কেউ আমেরিকাকেই ধরে নেবে। রাসূলের (সা.) সময়ে বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি ছিল পারস্য। ফলে পারস্য কন্যার সিংহাসনে বসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মন্তব্য সেরকমই।

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব যথোপযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পিত হতে হবে। যে কোন পুরুষের উপর নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা অর্পিত হলেই ইসলাম একে বৈধ বলে স্বীকার করে না। অতএব, এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিতর্ক

---

[১৪৪]. জাসের আওদা, *নারী নেতৃত্ব কি হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ*, প্রাগুক্ত

[১৪৫]. বিবিসি (বাংলা সার্ভিস), ৬ জানুয়ারি ২০১৮ (https://www.bbc.com/bengali/news-42590417)

অবান্তর[১৪৬]। নারী নেতৃত্বের বিপক্ষে যারা, তাদের আরেকটি বড় যুক্তি হচ্ছে, কোন নারীকে নবুওতের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নারী নেতৃত্ব বৈধ হলে আল্লাহ নারীদের মধ্য থেকেও নবী পাঠাতেন। আসলে নবুওত এমন একটি দায়িত্ব ও বোঝা, যার সাথে রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের তুলনা মানায় না। এই দায়িত্বের বোঝা ও পরিধি নেতৃত্বের চাইতেও অনেক অনেক বেশি কিছু।

নারী নেতৃত্ব আসলে কি ব্যর্থ হয়?

নানাবিধ বাস্তবতায় অনেক সময় দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের আসনে যেতে পারছে না। যারা নেতৃত্বে আসীন হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। কুরআনে নারী শাসক রাণী বিলকিসের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার বিবরণ আমরা পেয়েছি। কুরআনে তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি যে একজন বিচক্ষণ, মেধাসম্পন্ন, দুঃসাহসী এবং কূটনীতি-জ্ঞানসম্পন্ন শাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই[১৪৭]।

আরো বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন নারী শাসককে বেশ সুযোগ্য ভূমিকা পালন করতে দেখি। সব নারী শাসকই যে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব খুবই যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সাথে দিতে পারে; তা কিন্তু নয়। আবার এটাও সত্য যে, পুরুষ শাসক মানেই যে যোগ্য, তা কিন্তু নয়। বহু পুরুষ শাসক যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন; অনেকে আবার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। ঠিক তেমনি বহু নারীও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারে এবং বর্তমান সময়সহ ইতিহাসের বিভিন্ন সময় শাসক হিসেবে বহু নারী ক্ষমতার চেয়ারে বসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং মার্গারেট থ্যাচার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ক্লিওপেট্রা, ইসাবেলা, চাঁদ সুলতানা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ের পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টো, ইসরাইলের গোল্ডামেয়ার, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও শ্রিমাভো বন্দরনায়েক, ফ্রান্সের এডিথ ক্রেসন, আইরিশ প্রজাতন্ত্রের মেরি রবিনসন, ইন্দোনেশিয়ার মেঘবর্তী সুকর্ণপুত্রী, বাংলাদেশের শেখ হাসিনা, আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন কিংবা মেডেলিন অলব্রাইট, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি; এদের কেউই সমকালীন অন্যান্য পুরুষ নেতা বা শাসকদের চাইতে ব্যর্থ হিসেবে চিহ্নিত হন নাই। রাজনীতিতে তারা বেশ দাপট ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে প্রমাণ করেছেন, নারী মানেই অযোগ্য নয়।

---

[১৪৬]. নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[১৪৭]. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বিশ্বসেরা নারী* (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৬), পৃ. ৩১

রাণী প্রথম ও দ্বিতীয় এলিজাবেথ দাপট ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে দেখিয়েছেন, বহু পুরুষ শাসকের চাইতেও তারা অনেক বেশি এগিয়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করেছেন। তার রাজত্বকাল ছিল ইংল্যান্ডের এক গৌরবময় কাল[১৪৮]। এই নারীকে কেমনে ব্যর্থ বলা যাবে? রাণী ভিক্টোরিয়াও[১৪৯] যোগ্যতা ও পারঙ্গমতার সাথে পৃথিবীতে দীর্ঘ সময়ের শাসন করার নজির স্থাপন করে গেছেন। দিল্লীর সম্রাট ইলতুমিশ কন্যা রাজিয়া সুলতানা[১৫০], এডওয়ার্ড কন্যা রাণী দ্বিতীয় ভিক্টোরিয়া এরা প্রত্যেকেই যোগ্য পিতার যোগ্য নারী উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইলতুমিশ তাঁর কন্যা রাজিয়া সুলতানার মধ্যে নেতৃত্বের যে গুণাবলী দেখতে পেয়েছিলেন, রাজিয়ার সৎ ভাইয়ের মধ্যে সেটা ছিলো না। ফলে সেই ভাই ক্ষমতায় এসে টিকতেও পারেন নাই। রাজিয়া সুলতানার শাসনকাল ভারতবর্ষের জন্য গৌরবের, যেকোনো নারীর জন্য গৌরবের[১৫১]। আবার ভিক্টোরিয়া যে গুণ তার রক্তে পেয়েছেন, তা তার কোন চাচাতো, ফুফাতো ভাইয়ের মধ্যে ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং এখন পর্যন্ত তিনি ভারতের একমাত্র নারী যিনি দেশটির প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান ছিলেন। তাঁকে কিভাবে অযোগ্য বা ব্যর্থ বলা যাবে? তাঁর নেতৃত্বে রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বরং তিনি ভারতের আরো বহু পুরুষ প্রধানমন্ত্রী ও শাসকের চাইতে অনেক বেশি দুর্দান্ত প্রতাপের সাথে বেশ কয়েক বছর বিশাল দেশটি শাসন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার পর যারা এ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীই সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের শাসক। কেউ কেউ তাঁকে ভারতের সবচেয়ে ক্র্যারিশমেটিক নেতা হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিরি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন এবং যে অসাধারণ ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন তাতে ভারতের এই নারী বিশ্বনেতায় পরিণত হন। 'The Bangladesh war and the way she partitioned Pakistan made her an international leader[১৫২].' ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও বিচক্ষণতা দিয়ে পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী দেশ ভাঙার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিলেন।

---

[১৪৮]. শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ১৭

[১৪৯]. ১৮৩৭ সালের ২৮ জুন ব্রিটিশ সিংহাসনে বসেন রাণী ভিক্টোরিয়া। ১৯০১ সালে মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৬৩ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন করেন তিনি। পৃথিবীর বেশিরভাগ এলাকাজুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল। এই কারণে 'ব্রিটিশ সাম্রজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না' এই কথাটির প্রচলন হয়েছিল তাঁর সময়ে। রাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ব্রিটেনে শিল্পায়নসহ নানা ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল।

[১৫০]. সুলতানা রাজিয়া বা রাজিয়া সুলতানা ভারতবর্ষের প্রথম নারী শাসক। ১২৩৬ সাল থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি একজন চমৎকার প্রশাসক ও ভাল সেনাপতি ছিলেন। রাজিয়া সুলতানা তার শাসনামলে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

[১৫১]. এম এ মোমেন, রাজিয়া, *আল-সুলতান আল-মোয়াজ্জেম (নিবন্ধ)*, দৈনিক বণিকবার্তা, জুন ২৬, ২০২০

[১৫২]. Pankaj Vohra, *The original aam aadmi leader,* Hindustan Times, NOV 02, 2009

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের অবস্থান ছিল অনেক উঁচুতে। তারা এমন দুইটি জাতি বা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেই দেশ দু'টির মধ্যে তখন চলেছে বিপুল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন[১৫৩]।

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় থেকে ক্ষমতায় থাকা জার্মানির এঞ্জেলা মার্কেল, বৃটেনের থেরেসা মে, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর অনেক শাসকও ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন যে, নারীর নেতৃত্বে কোন দেশ ব্যর্থ হয়না। জার্মানীর চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল সরকার প্রধান হিসেবে প্রথম ক্ষমতায় আসেন ২০০৫ সালে। তিনিই জার্মানির প্রথম নারী সরকার প্রধান। চতুর্থ বারের মতো তিনি ক্ষমতায় আছেন। যোগ্যতা না থাকলে কিংবা ব্যর্থ হলে কি দেশটির জনগণ তাঁকে বার বার ক্ষমতায় বসাতো?

জেসিন্ডা আর্ডেন সাম্প্রতিক ইতিহাসে যোগ্য ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ তারিখে দেশটিতে একটি কালো অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। সেদেশের ক্রিস্ট চার্চে মসজিদে বন্দুকদারীর গুলিতে ৫১ জন মুসল্লী নিহত হন। শান্তিপ্রিয় একটি দেশে এরকম একটি ঘটনা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নিউজিলান্ডের নারী প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৩৭ বছর বয়স্কা জেসিন্ডা আর্ডেন ধীরস্থিরচিত্তে এমন একটা গুরুতর ঘটনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে মোকাবেলা করে কুশলী নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছেন। মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্যা নজির স্থাপন করেছেন। নেতা হিসেবে জেসিন্ডা আর্ডেন বেশ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের এ ঘটনা মোকাবেলা করার পর বা সামগ্রিকভাবে জেসিন্ডা আর্ডেনের ভূমিকায় নারী নেতৃত্বকে দুর্বল ও অযোগ্য বলা যায় কিভাবে? এই ঘটনার কয়েকদিন পরই ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে তাকে অসাধারণ নেতা হিসেবে অভিহিত করা হয়[১৫৪]।

পর্দা কি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায়?

পর্দা কি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায়? যারা নারীকে রাজনীতি থেকে বারণ করে রেখেছে তাদের যুক্তি হচ্ছে, সেই নারী নেতৃত্ব হারামের হাদীস আর ইসলামে পর্দার বিধান। ফলে অনেকে মনে করেন, ইসলামের পর্দা

[১৫৩]. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, নূরুল ইসলাম খান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ১৩২

[১৫৪]. The Wasington Post, March 18, 2019

প্রথার কারণে নারীকে বাইরের জগৎ থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হয়েছে এবং এভাবে তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একথা সত্য যে, পর্দা প্রথার বাড়াবাড়ির কারণে নারী বহির্জগতের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং পুরুষ থেকে এক ধরনের পার্থক্যের সৃষ্টি করে, যাতে নারী অধস্তন[১৫৫]। শালীনতার উদ্দেশ্যে ইসলামে পর্দার বিধান আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। (Islam sanctions *purdah* for modesty, but it has been misinterpreted according to existing social circumstances.[১৫৬])

পর্দার দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহবন্দি রাখার ব্যাপারটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাওয়া যায় না। তখন নারীরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করেছেন, রাসূলের সামনে বসে নসিহত ও বয়ান শুনেছেন এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে রাসূলের সাথে সরাসরি আলাপ করেছেন। ইসলামে কখনোই এমন কোন মসজিদ ছিল না, যেটি কেবল নারীদের জন্য সংরক্ষিত এবং যে মসজিদে পুরুষরা শরীক হয়নি[১৫৭]। যুদ্ধের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায়ও নারীর উপস্থিতি দেখা গেছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে।

আমাদের অনেকের ধারণা যে, পর্দা শুধু নারীদের সাথে সম্পর্কিত এবং পর্দা মানে শুধু নির্দিষ্ট কিছু পোশাক। কিন্তু ইসলামের আলোকে পর্দা একটি ব্যাপক বিষয় এবং তা পুরুষ-নারী উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত। পর্দা হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে শালীন থাকার নাম। সেই সামগ্রিক শালীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পোশাকের পর্দা। অন্যদিকে, কুরআনে যে পর্দার কথা বলা হয়েছে, সেই পর্দা মেনে চলতে হবে পুরুষদেরকেও। নারী ও পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখতে বলা হয়েছে। কুরআনে যে আয়াতে নারীকে দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত রাখার কথা বলা হয়েছে, তার আগের আয়াতেই একই কথা বলা হয়েছে পুরুষকেও। অর্থাৎ পর্দার নির্দেশ আগে পুরুষকে দেওয়া হয়েছে। পর্দা মানে যদি গৃহবন্দিত্ব হতো তাহলে পুরুষের জন্য পর্দার আয়াতের প্রয়োজন ছিল না। কুরআনে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন, 'হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে[১৫৮]।' পরের আয়াতেই নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'হে

---

১৫৫. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১৫৬. শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৫৭. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী অনূদিত (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১), পৃ. ৭২

১৫৮. কুরআন; ২৪ : ৩০

নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তাছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপনীয়তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে[১৫৯]।'

দৃষ্টি সংযত রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি সংযত রাখা বলতে গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকা নয়। আবার এই দৃষ্টি সংযত রাখা বলতে অবশ্যই সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ প্রথমেই পুরুষকে দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলেছেন। এই দৃষ্টি সংযত রাখার অর্থ হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তি, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা থেকে নিজে বিরত থাকা এবং নিজের দৃষ্টিকেও সংযত রাখা। ঠিক সেটাও বুঝানো হয়েছে নারীদের ক্ষেত্রে। আর এসব দিক বিবেচনা করে হাদীসের বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে ইবনে কাত্তান অভিমত প্রকাশ করেন, ফেতনার আশংকা না থাকলে নারীরা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে[১৬০]।

কুরআনের অন্যত্র সরাসরি পোশাকি পর্দার কথা এসেছে। হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং তাকওয়ার পোশাক, এটিই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে প্রকাশ পায়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখো না। আমি শয়তানদেরকে সেই লোকদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না[১৬১]।'

---

[১৫৯]. কুরআন; ২৪ : ৩১

[১৬০]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী (অষ্টম খণ্ড)*, মাওলানা নাজিমুদ্দীন অনূদিত, (নারায়নগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ৩৮৮

[১৬১]. কুরআন; ৭ : ২৬-২৭

কুরআনের এই নির্দেশনার মানে কি, ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা? আবদ্ধতার মধ্যে দৃষ্টি সংযত রাখার প্রয়োজন পড়ে না। অবরুদ্ধ নারীর পুরুষকে প্রলুব্ধ করার অবকাশ কোথায়? অবরোধ প্রথাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। তবে এটা ঠিক যে, নারীদের শালীন পোশাক পরিধানের উপর ইসলামে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকে একেবারে বন্ধ করে দেয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে ফিতনা ও অনাচারের পথ বন্ধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য[১৬২]। পোশাক-পরিচ্ছদে শালীন থাকার মানে এই নয় যে, হাত-মুখ সব ঢেকে রাখা। শালীনতার সাথে বাহিরে বের হওয়ার সুযোগ আছে বলেই তো শালীন পোশাক পরিধানের কথা বলা হয়েছে। নারী ঘরের মধ্যে থাকার বিধান থাকলে পোশাকি পর্দার কথা আসতো না। এই কথার স্বপক্ষে বিভিন্ন হাদীসও পাওয়া যায়। উম্মে সালমা (রা.) বলেন, 'একবার রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কোনো স্ত্রী লোক যদি ইজার না পরে কেবল কামিজ ও ওড়না পরে নামাজ আদায় করে, তার নামাজ কি হবে? রাসূল (সা.) বললেন, এতে কোনো অসুবিধে নেই; কিন্তু কামিজ হতে হবে এমন লম্বা যাতে দুই পা আবৃত থাকে[১৬৩]।'

ইসলামে পর্দা প্রথা নিয়ে বিতর্ক ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হয়েছে পর্দা সংক্রান্ত আয়াতসমূহ ও হাদীসগুলোকে ভুলভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে, মুসলিম সমাজে কঠোর ও রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে এবং মুসলিম সমাজেও অনেক সময় এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা লালন করার কারণে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে পর্দার বিধান এবং কুরআনে পর্দা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ কোনভাবেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিপক্ষে নয়; নারীকে গৃহবন্দি করার জন্য নয়। শালীন পোশাক পরিধান করে নারী বহি:স্থ যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই পর্দা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অন্তরায় নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্তরায় নয়। ইসলামের বিধান মেনে শালীনতা রক্ষা করে যদি কোন নারী রাজনীতির মাঠে উপস্থিত হয়, তাতে অসুবিদা কী?

পর্দা কী, পর্দার বিধান নাজিলের প্রেক্ষাপট

কুরআনের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান সরাসরি বর্ণিত হয়েছে। সূরা নুরের তিনটি আয়াত এবং সুরা আহযাবের চারটি আয়াত। পর্দা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উক্তি ও কর্মসম্বলিত সত্তরটির অধিক হাদীস আছে[১৬৪]। কুরআনের এই দুই সূরার আয়াতগুলো নাজিলের সময়, ক্রমধারা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে পর্দা কী, হিজাব কী

---

১৬২. ড. মো. মাসুদ আলম, *ইসলামে নারীর পোশাক ও সাজসজ্জা: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা (প্রবন্ধ)*, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ সংখ্যা, পৃ. ১২৭

১৬৩. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী (অষ্টম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

১৬৪. *তাফসীরে জালালাইন (৫ম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

এবং এর উদ্দেশ্য কী- তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সূরা নুরের পর্দা সংক্রান্ত বিধান নাজিলের দুই বছর পুর্বে সূরা আহযাবের পর্দা ও হিজাব সংক্রান্ত বিধি-বিধান নাজিল হয়। ৫ম হিজরীতে সূরা আহযাবের হিজাব সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়। আর সূরা নুরের হিজাব সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাজিল হয় সপ্তম হিজরীতে।

পর্দা সংক্রান্ত কুরআনের একটি আয়াত, 'তোমরা নিজদের গৃহে অবস্থান করো এবং অজ্ঞতা-যুগের মতো প্রদর্শন করো না[১৬৫]।' অনেক পন্ডিত বলেন, এ আয়াত দ্বারা গোটা নারী জাতিকে বোঝানো হয়নি। এ আয়াতে রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনীদের কথা বলা হয়েছে, তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে, যা অন্য নারীদের নেই। তাঁদের জন্য এমন বিধি-নিষেধ ছিল, যা অন্য নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়[১৬৬]। কারণ, এ আয়াতের আগের আয়াতেই বলা হচ্ছে, 'হে নবির সহধর্মিনীগণ! আপনারা সাধারণ নারীদের মতো নন।' আরেকটু আগে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নবীপত্নীগণের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তারা পৃথিবীর সকল নারীদের থেকে আলাদা মর্যাদার অধিকারী। বলা হয়েছে, 'হে নবীপত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করবে, তার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে[১৬৭]।'

নবীপত্নীগণের কোন অন্যায়ের শাস্তি দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়নি। তাদের মর্যাদা জোর দিয়ে বুঝানোর জন্য শাস্তির কথা বলে আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার এটাও একটা কারণ যে, নবীপত্নীগণের আরো কারো সাথে বিয়ের সুযোগ নেই। একবার এক ব্যক্তি বলেছিলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর কোন এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে, তখন পর্দার একটি আয়াত নাযিল হয়[১৬৮]। নবীপত্নীগণের সাথে অন্যরা যাতে মেশার সুযোগ না পান, দেখার সুযোগ না পান এবং তাদেরকে দেখে বিয়ে করার ইচ্ছাও যাতে কেউ মনের মধ্যে পোষণ না করতে পারে; এসব বিষয় মাথায় রেখেই নবীপত্নীগণের জন্য বিশেষভাবে পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়।

'নিজদেরকে অজ্ঞতা-যুগের মতো প্রদর্শন করো না'- এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, চাকচিক্যময় প্রদর্শনী না করে নারীরা যেন শালীন পোশাকে বাইরে বের হয়। গৃহের মধ্যে নারীরা নিজদের প্রদর্শন বা সাজসজ্জা করা নিষিদ্ধ নয়।

---

[১৬৫]. কুরআন; ৩৩: ৩৩

[১৬৬]. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[১৬৭]. কুরআন; ৩৩: ৩০

[১৬৮]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী (নবম খণ্ড)*, মাওলানা নাজিমুদ্দীন অনূদিত (নারায়নগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, তৃতীয় প্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৫৪৮

কেবল ঘরের বাইরে চাকচিক্যময় সাজসজ্জা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদের ডাকা হলে প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষে দ্রুত চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সঙ্কোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সঙ্কোচ করেন না। তোমরা তার পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ[১৬৯]।'

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল[১৭০]। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, এই বিয়ের পর পরই রাসূল (সা.) ওয়ালীমার আয়োজন করেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে উপস্থিত লোকদের অনেকে গল্পে মেতে ওঠে। রাসূল (রা.) উঠার জন্য তৈরী হলেন, তখনো অনেকে উঠলো না। রাসূল (সা.) তাঁর হুজরার দিকে গেলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন তখনো তিন জন লোক বসে আছে। এতে রাসূল (সা.) এর ব্যক্তিগত বিষয়ে অসুবিধা হচ্ছিল। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়[১৭১]। অন্য এক বিবরণে এসেছে, নবপরিণীতার ঘরে ঢুকলে কিছু লোক তখনো গৃহাঙ্গনে বসে গল্প করছিলো। তখন আয়াত নাযিল হয়[১৭২]।

পর্দা কিভাবে করতে হবে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[১৭৩]।' এর আগে সুরা নূরের ৩১ আয়াত, যেখানে নারীকেও দৃষ্টি সংযত রাখার কথা বলা হয়েছে, সেখানে পর্দা কিভাবে করতে, তার বিবরণ আছে। আর সূরা আহযাবের এই আয়াতেও স্পষ্ট করে বিবরণ দেওয়া হলো।

আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন মদীনা সব দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই মদীনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদে নববী, যেখানে আল্লাহর রাসূলের অবস্থান ছিল। মসজিদে নববীতে মুহাম্মদ (সা.) এর আলাদা কোন

---

[১৬৯]. কুরআন; ৩৩ : ৫৩

[১৭০]. *তাফসীরে জালালাইন (৫ম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[১৭১]. হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইব্নু কাসীর, *তাফসীর ইব্নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ৮৪০-৮৪১

[১৭২]. *তাফসীরে মাযহারী (নবম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

[১৭৩]. কুরআন; ৩৩ : ৫৯

হুজরা ছিলোনা। তিনি পর্যায়ক্রমে এক একদিন এক এক স্ত্রীর হুজরায় থাকতেন। এ সময় রাসূলের বাড়িতে সব সময় লোকজনের আনাগুণা লেগেই থাকতো। ক্রমবর্ধমান হারে লোকজন তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত সমস্যা ইত্যাদির জন্য মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে আসতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল (সা.) এর অধিকতর মনোযোগ লাভের জন্য তারা নবী পত্নীগণের শরণাপন্ন হতেন। সে কারণে একদিকে নবীর পারিবারের ব্যক্তিগত জীবন-যাপন দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিলো, অন্যদিকে সব ধরনের মানুষের অবাধ প্রবেশের সুযোগে নবী-পত্নীগণের পবিত্র চরিত্রের উপর মুনাফিকদের দ্বারা গুজব ছড়িয়ে দেবার সুযোগ সৃষ্টি হবার আশংকা ছিলো। এমন আশংকা একটা পর্যায়ে সত্যেও পরিণত হয়েছিল। ইফকের ঘটনা তার বড় প্রমাণ। হযরত আয়েশা (রা.) এর চরিত্রকে জড়িয়ে এই ঘটনা ঘটেছিল মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের ব্যক্তিগত বিষয়টি সবচেয়ে বেশি অনুধাবন করেন হযরত উমর (রা.)। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত উমর (রা.) রাসূল (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার কাছে সৎ ও অসৎ সর্বপ্রকারের লোকই এসে থাকে। সুতরাং যদি আপনি মুমিনদের মাতাদেরকে পর্দার নির্দেশ দিতেন (তবে ভালো হতো)।' তাঁর কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন[১৭৪]। আর ঐ সময়টা ছিল ৫ম হিজরীর যুলকাদাহ মাসের ঐ দিনের সকাল যেই দিন তিনি যয়নাব বিনকে জাহাশ (রা.)-কে স্ত্রী রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। অনেকে এই ঘটনা তৃতীয় হিজরীর বলে উল্লেখ করেছেন[১৭৫]। হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, তিনি বলেন, 'আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার কাছে ভালো-মন্দ লোক আসে, আপনি যদি উম্মুল মুমীনিনদের জন্য পর্দার নির্দেশ দিতেন। এরপরই আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাজিল করেন[১৭৬]।'

উপরের আয়াতসমূহে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে[১৭৭]। আয়াতগুলো নাজিলের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট করে যে, নারীকে গৃহবন্দি করার উদ্দেশ্যে নয়; ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত করতে নাজিল হয়।

---

[১৭৪]. *তাফসীর ইব্‌নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪০

[১৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪০

[১৭৬]. বুখারী; হাদিস- ১১৪৪

[১৭৭]. *তাফসীরে জালালাইন (৫ম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

ইমাম ইবনে জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, পর্দা সংক্রান্ত কিছু আয়াত নাযিল হয় নবীপত্নীগণকে কেন্দ্র করে। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, রাসূল (সা.)-এর সহধর্মীনিগণ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ময়দানের দিকে যেতেন। হযরত উমর (রা.) এটা পছন্দ করতেন না। তিনি রাসূল (সা.)-কে বলতেন, এভাবে তাদেরকে যেতে দেবেন না[১৭৮]। তাঁর কথার অনুমোদনে কুরআনে পর্দার বিধান আসে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একবার নবীপত্নী হযরত সাওদা (র.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হলেন। হযরত উমর (রা.) তখন তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন এবং বিষয়টি অপছন্দ করলেন। তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'হে সাওদা! আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। অত:পর আয়াতটি নাজিল হয়[১৭৯]।' একই বিবরণ অন্য অনেক তাফসীরের কিতাবেও এসেছে। তাফসীরে মাযহারীতেও একই বর্ণনায় বলা হয় যে, উমর (রা.) নবীর এই স্ত্রীকে দেখে বলেন, 'আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি[১৮০]।'

পর্দা সংক্রান্ত এসব আয়াতের মর্ম ও বাস্তবতা অনুধাবণ করতে হলে তখনকার সময়ের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার ব্যবস্থা আগে জানা ও বুঝা দরকার। আমাদের দেশে গত শতাব্দীর শেষ দিকেও বেশির ভাগ বাড়িতে, বিশেষ করে গ্রামের বাড়িগুলোতে, বাসা-গৃহের ভেতর আলাদা বাথরুম ছিল না, অন্যকথায় গৃহের ভেতরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানেও প্রান্তিক এলাকায় বহু বাড়িতে এমন রকম ব্যবস্থা বিদ্যমান। ঠিক তেমনি প্রাক ইসলামী যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদীনার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক ডাকে ভারমুক্ত করার জন্য আজকের মত বাসা বাড়িতে কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলোনা। কাজেই তাদেরকে নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যেতে হতো।

ফাসেক শ্রেণির লোকেরা তখন অন্ধকারে মদীনার পথে বের হতো এবং নারীদেরকে অনুসন্ধান করতো। তখনকার মদীনবাসীদের মধ্যে দরিদ্র শ্রেণীর লোকজনের সংখ্যাই বেশি ছিল। কাজেই রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো তখন নারীরা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করার উদ্দেশ্যে পথে বের হতেন[১৮১]। এমন স্থানে তখন ভাসমান পতিতারা বা দাসী শ্রেণীর নারীরা খদ্দরের সন্ধানেও ঘোরাফেরা করতো। সে সময় পর্যন্ত পতিতা, দাসী, অভিজাত নারীসহ সকল শ্রেণীর নারীরা একই রকম পোশাক গায়ে দিয়ে বাইরে বের হতো। রাতের বেলায় নির্জন স্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে যাবার সময় কে দাসী, কে পতিতা আর কে অভিজাত নারী; তা শনাক্ত করা কঠিন হতো। এতে কখনো

---

[১৭৮]. *তাফসীর ইব্নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৩

[১৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪৩

[১৮০]. *তাফসীরে মাযহারী (নবম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৬

[১৮১]. *তাফসীর ইব্নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৪

কখনো অভিজাত নারীদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতো। মদীনার অন্যসব নারীদের মতোও নবীপত্নীগণও রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যেতেন।

সেই প্রেক্ষাপটে হিজাব বা জিলবাব পরার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয় শালীনতা ও আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। চাদর পরিধানকারিনী নারীদেরকে দেখে ফাসেকরা সুযোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকতো, কারণ এই পর্যায়ের নারীদের দেখে তারা বলতো এরা আযাদ লোক। তাফসীর ইব্নু কাসীরে বলা হয়েছে, চাদর লটকানো আযাদ সতী-সাধ্বী নারীদের লক্ষণ, কাজেই চাদর লটকানো দ্বারা এটা জানা যাবে যে, এরা বাজে স্ত্রী লোকও নয় এবং নাবালিকা মেয়েও নয়[১৮২]। ফলে এটা স্পষ্ট যে হিজাব বা জিলবাব পরার কথা আসেনি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য। মুখ ঢেকে রাখার উপরও কোন কড়াকাড়ি আরোপ করা হয়নি এখানে। আয়াতের প্রেক্ষাপট সেটাই বলে।

মুখ ঢেকে রাখা কি ফরজ?

পর্দার বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়েছিলো দুইটা পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের পর্দার আয়াত নাজিল হয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার এবং আত্মীয় পরিবারের নারীদের উদ্দেশ্য করে। তা কোনভাবেই সাধারণ মুসলিম নারীদের উপর ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্দার বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয় সাধারণ মুসলিম নারীদের জন্য এবং সকল যুগের নারীদের জন্য। এই দুই পর্যায়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে বলা যায়, পর্দা করা সকল স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা মুসলিম নারীর জন্য আবশ্যকীয় পালনীয় হলেও পর্দা সংক্রান্ত আয়াতে মুখ বা চেহারা আড়াল করে রাখার নির্দেশ নেই। মুখ বা চেহারা আড়াল করার বিষয়টি কেবলই নবীপত্নীগণ, কন্যাগণ এবং রাসূল (সা.) এর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের নারীদের প্রতি ছিলো। বিভিন্ন মুফাসসির ও ইসলামিক স্কলাররা সেটাই বলছেন। পর্দার আড়াল থেকে নারীদের সাথে কথা বলার সে বিধানটি কুরআনে রয়েছে, তা একান্তই রাসূল (সা.) এর স্ত্রীদের জন্য যারা বিশেষ মর্যাদাবান; কিন্তু অন্য নারীদের জন্য নয়[১৮৩]।

কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও আয়াতে সবার জন্য শিক্ষা রয়েছে, ফলে নবীপত্নীদের ব্যাপারে নাজিল হওয়া আয়াত থেকে শিক্ষনীয় যা তা হচ্ছে, আজকের যুগেও অনেক বাড়ি বা গৃহ রাজনীতি বা জনসমাগমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত

[১৮২]. *তাফসীর ইব্নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৪

[১৮৩]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬) পৃ. ১৪২

হয়। সেসব বাড়িতে নারীদের প্রাইভেসী যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখা আয়াতের একটি শিক্ষা। অন্যদিকে যেহেতু নবীপত্নী ও কন্যাগণ জগতের সকল মুসলিম নারীর জন্য রোল মডেল; কাজেই কেউ যদি স্বেচ্ছায় সেভাবে পর্দা পালন করতে পছন্দ করেন তাহলে তিনি তা করতে পারেন, তাতে কেউ বাঁধা দিতে পারবেনা।

রাজনীতিসহ বহিঃস্থ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে সাধারণত মুখমণ্ডল বের করে চলতে হয়। আবার মুখ ঢেকে হিজাব-নিকাব পরিধান করেও অনেকে বাইরের কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। ইচ্ছে করলে মুখমণ্ডল খোলা রেখে একজন নারী বাইরে বের হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, একবার আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর নিকট প্রবেশ করলে রাসূল (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিছু উপদেশ দেন।

আসমা বিনতে আবি বকর মুখমন্ডল খোলা রেখে রাসূল (সা.) এর সামনে এসেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। না হয় নবী তাঁকে দেখলেন কিভাবে এবং চিনলেন কিভাবে? কুরআনে আল্লাহ মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখার কথা বলেননি। তিনি নারীদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আর তারা যেন তাদের ওড়নার (খুমুর/ খিমার) আঁচল দিয়ে তাদের বুক (জাইব) ঢেকে রাখে[১৮৪]। এই আয়াতসহ সূরা নুরের ২৪ থেকে ৩১ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পর্দা, পোশাক ইত্যাদির কথা বলেছেন। সূরা নুরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসি যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাধের ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়[১৮৫]। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও পর্দার অন্তরাল থেকে রাসূল (সা.) এর স্ত্রীরা বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন[১৮৬]। হযরত আয়েশা (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে নেতৃত্বও দিয়েছেন পর্দার বিধান আসার বহু বছর পর এবং রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের অনেকগুলো বছর পর। রাসূলের এই স্ত্রী বহু পুরুষ সাহাবীর শিক্ষক ছিলেন। হাদীস এবং ইসলামের বিধি-বিধান জানার জন্য অনেকেই তাঁর কাছে আসতো।

পোশাকি পর্দা বা হিজাব-জিলবাব পরা সংক্রান্ত পর্দার আয়াতসমূহের নির্দেশনা বুঝতে হলে আমাদের আরো জানতে হবে ইসলামের আবির্ভাবের সময় তখনকার আরবের নারীরা কেমন পোশাক পরতো। অজ্ঞতার যুগে নারীরা

---

[১৮৪]. কুরআন; ২৪ : ৩১

[১৮৫]. *তাফসীরে জালালাইন (৪র্থ খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

[১৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

বেপর্দাভাবে চলাফেরা করতো[১৮৭]। তখন শালীন পোশাকের প্রচলন কম ছিল। আরবের নারী-পুরুষ উভয়েই মাথায় মোটা কাপড় পেঁচিয়ে রাখতো এবং মোটা কাপড়ের লম্বা জামা শরীরে পরে থাকতো। সেই থেকে আরবের নারী পুরুষের মাথায় কাপড় রাখা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো। রাসুল (সা.) এর সময় লোকেরা যেসব জামা পরতো তাতে মাথা ঢুকানোর জন্য জামার ফ্রন্টপার্টসের নেক লাইনের ঠিক মধ্য থেকে বুকের উপর পর্যন্ত চিরে রাখা হতো, যাকে এখন সেলাই বিজ্ঞানে সেন্টার ফ্রন্ট ওপেনিং বলা হয়। এখনো টিশার্ট বা পলো শার্টে এভাবে রাখা হয়। তবে এখন মানুষ বুতাম বা জিপার ব্যবহার করে ইচ্ছামত খোলা বা বন্ধ করে রাখতে পারে, সেই সময় সে প্রযুক্তি ছিলোনা, বিধায় তা খোলা রাখতে হতো। সেই সেন্টার ফ্রন্ট ওপেনিং বুকের মধ্য বরাবর থাকতো।

তৎকালীন সময়ে আরবীয় সমাজে নারী ও পুরুষ মূলত একই প্রকারের পোশাক পরিধান করতেন[১৮৮]। নারীরা গরমের সময় শুধু মাথার চুল বেঁধে রাখতো। মেয়েদের জামা ও কুর্তা বক্ষস্থলের উপর দিয়ে কাটা থাকতো[১৮৯]। ফলে পোশাকের সামনের গলার নিচের অংশ যেখানে মাথা প্রবেশ করানোর জন্য বিভাজিত রাখা হতো সেই অংশ দিয়ে বুকের অংশ প্রদর্শন করে চলাফেরা করতো। শাহ আবদুল হান্নান লিখেন, জাহেলিয়াতের যুগে নারীরা মাথার উপর এক প্রকার চাদর দ্বারা পেছনের খোঁপা বেঁধে রাখতো। সম্মুখের দিকে বোতাম খোলা থাকতো। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেতো[১৯০]। এই আচরণ যেন মুসলিম নারীরা না করতে পারে এর জন্যই বক্ষের উপর কাপড় রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর তারা যেন তাদের ওড়নার (খুমুর/ খিমার) আঁচল দিয়ে তাদের বুক (জাইব) ঢেকে রাখে'। যাতে করে তাদের উড়নির দু'পাশের বর্ধিত অংশ দিয়ে গলা, কান, বুক আড়াল করে নেয়।

যদি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ থাকতো তাহলে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বুকের মতো মুখমণ্ডলের কথাও উল্লেখ করতেন। আর যদি রাসুল (সা.) এর আমলে নারীরা তাদের মুখমন্ডল, খামির, চাদর, উড়নি, জিলবাব, নিকাব, বোরকা দিয়ে ঢেকে চলাফেরা করতো তাহলে আল্লাহ কেন পুরুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে? খামির, চাদর, উড়নি, জিলবাব, নিকাব, বোরকা দিয়ে ঢেকে রাখার পর এমন নির্দেশনার প্রয়োজন ছিল না। তাহলে এই আয়াতটি কি একটি দলিল নয় যে, রাসুল (সা.) এর আমলে নারীরা মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতোনা?

---

[১৮৭]. *তাফসীর ইব্‌নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৪

[১৮৮]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২০

[১৮৯]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[১৯০]. শাহ আবদুল হান্নান, *নারী ও বাস্তবতা* (ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ৪৬

আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, 'আমি জানতে পেরেছি, একবার নবী (সা.)-এর কাছে জিবরাইল (আ.) এসেছিলেন। উম্মে সালমা (রা.) তখন তাঁর সাথেই ছিলেন। জিবরাইল (আ.) রাসূলের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। রাসূল (সা.) উম্মে সালমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এই লোকটাকে চেনো?' উম্মে সালমা জবাব দিলেন, 'ইনি দাহইয়া কালবী (রা.)।' জিবরাইল চলে যাওয়ার পর উম্মে সালমা (রা.) বললেন, 'আল্লাহর কসম! নবী (সা.) খুতবায় আমাদেরকে জিবরাইলের আগমনের খবরটা জানানোর আগ পর্যন্ত আমি তাঁকে দাহইয়া বলেই মনে করছিলাম[১৯১]।' এই হাদীসে বুঝা যায়, দাহইয়া কালবী মনে করেই তিনি সেথায় তার সামনে বসা ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ফজরের সালাত পড়াতেন। আর মুমিন নারীগণ সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে নবী করীম (সা.)-এর সাথে ফজরের সালাতে উপস্থিত হতেন। অতঃপর সালাত শেষ করে তারা যার যার বাড়িতে ফিরে যেতেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না[১৯২]। এই হাদীসে আয়েশা (রা.) স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, কেবলই রাতের অন্ধকার থাকার কারণে নামাজে আগত নারীদের চেনা যায়নি। যদি মুখ কাপড়ে আবৃত হতো তাহলে কি আলো কি অন্ধকারে নারীর পরিচয় পাওয়া যেত না? অতএব আঁধারে আবৃতা নারীদের মুখ যে খোলা ছিলো এই হাদীস থেকে সেটা বুঝা যায়। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসুল (সা.) এর সময়ে নারীরা মুখে কাপড় দিয়ে পর্দা করতেন না।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যখন তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে, তখন তাকে দেখাতে কোন গুনাহ হবে না। তবে কেবল বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই দেখতে হবে, যদিও মেয়ে জানতে না পারে[১৯৩]। পাত্র কেমন করে পাত্রীর মুখ দেখতে পারে? যদি পাত্রীর মুখ খোলা না থাকে। এখানে মুখ দেখার উদ্দেশ্য কি? সৌন্দর্য না পরিচয়? সৌন্দর্যের চেয়ে পরিচয়ই প্রধান হবে। আর সে সময় মুখ খোলা থাকতো বলে এখানে বুঝা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসুল (সা.) এর উটে সহযাত্রী হিসাবে তাঁর চাচাতো ভাই ফজল বিন আব্বাস (রা.) ছিলেন। এই সময় ক্বাথাম গোত্রের এক রূপসী তরুণী রাসুল (সা.) কে কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন করে, এই সময় সেই রূপসী তরুণীর দিকে ফজল বিন আব্বাস (রা.) তাকাচ্ছিলেন। তখন

[১৯১]. সহীহ বুখারী, ফাযায়িলুল কোরআন অধ্যায়, ৭/২৪৪; সহীহ মুসলিম, সাহাবীদের মর্যাদা অধ্যায়, ৭/১৪৪
[১৯২]. বুখারী, হাদীস নং-৩৭২
[১৯৩]. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৩৬৫০

রাসুল (সা.) তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন[১৯৪]। এই প্রসঙ্গে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, ঐ সময় ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) এর মুখ কেন ঘুরিয়ে দিচ্ছেন তা জানতে চেয়ে তাঁর বাবা আব্বাস (রা.) রাসুল (সা.) কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে রাসুল (সা.) জানান, তিনি আশংকা করছেন যে, এই তরুণ তরুণীর কারো মনে শয়তানের কু-প্রভাব প্রকাশ হতে পারে, তাই তিনি ফজলের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটি ব্যবচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়:

১. যদি নারীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হতো তাহলে রাসূল (সা.) এর উপস্থিতিতে ফজল ঐ নারীর দিকে তাকাতেন না। ফজল রাসূলের কাছের সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা.) এক চাচার ছেলে আলী (রা.) এবং আরেক চাচা আব্বাসের ছেলে এই ফজলের উপর ভর দিয়ে জীবনে শেষ বার মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলেন[১৯৫]।

২. যদি নারীদের মুখ দেখা নিষিদ্ধ হতো তাহলে ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) এর পিতা আব্বাস (রা.) রাসুল (সা.) কর্তৃক ফজল ইবনে আব্বাস (রা.) মুখ ফিরিয়ে দেয়ার কারণ জানার জন্য প্রশ্ন করতেন না। নিষিদ্ধ হলে রাসূল (সা.) তখন জবাবে বলতেন, নারীর চেহারা দিকে তাকানো জায়েজ নেই।

৩. যদি নারীদের মুখ ঢাকার নির্দেশ থাকতো তাহলে রাসূল (সা.) ঐ সময় ঐ ক্বাথাম গোত্রের নারীকে কোন কিছু দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল ঢাকতে নির্দেশ দিতেন। আর ঐ নারীও মুখ খোলা রাখা অবস্থায় রাসূল (সা.) ও হযরত ফজল ইবনে আব্বাসের সামনে আসতেন না।

৪. বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০ম হিজরী সনে, এবং হিজাব ও পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হয়েছিলো ৫ম ও সপ্তম হিজরী সনে। কাজেই ৫ম ও ৭ম হিজরী সনে যদি সব নারীর প্রতি মুখ ঢাকার নির্দেশ হতো তাহলে ১০ম হিজরীর বিদায় হজ্জের সময় বা সেই বছর মুখ অনাবৃত নারীর দেখা পাওয়া যেতোনা।

এর থেকে প্রমাণিত হয়, মুখ ঢেকে রাখার আয়াতের নির্দেশনা ছিলো শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদের জন্য। যে আয়াতে নারীদের ঘরে থাকার কথা বলা হয়েছে, আয়াতটি কেবলই নবীর স্ত্রীদের জন্য। পর্দার এ আয়াত হয়রত আয়েশা (রা.)-কে উষ্ট্রের যুদ্ধে গমন ও উটের পিঠে চড়ে নেতৃত্ব দান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পর্দার মানে যদি হতো গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, তাহলে আয়েশা (রা.) এই যুদ্ধে যেতেন না।

রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় পর্দার নামে নারীদের অন্তঃপুরবাসিনী করা হয়নি। তখন নারীরা যেমন মসজিদে প্রবেশ করতে পারতো, তেমনি ঈদের দিনে ঈদগাহেও সমবেত হতে পারতো, যুদ্ধেও পুরুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে

---

[১৯৪]. বুখারী, হাদীস নং- ১৫১৩; মুসলিম, হাদীস নং-১৩৩৪; আবুদাউদ, হাদীস নং-১৮১১; নাসাঈ, হাদীস নং-২৬১৩

[১৯৫]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

পারতো। রাসুল (সা.) এবং খোলাফয়ে রাশেদার আমলে নারীরা চেহারা খুলে বাইরে বের হতেন। হিজাবের আয়াত নাজিলের পরও নারীরা বাইরে মুখ খোলা রেখেই চলাফেরা করতেন; তবে হিজাব পরেই বাইরে বের হতেন।

চেহারা আবৃত করে নারীদের বাইরে বের হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো এবং এটা করা হয়েছিল নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকা থেকে। নারীদের নিরাপত্তাজনিত অসুবিধা না থাকলে চেহারা খোলা রাখলে অসুবিধার কী আছে। আজকের যুগে যেখানে নারী নিরাপদ নয়, সেখানে বোরকা-হিজাবের ভেতরও নিরাপদ নয়। বহু পর্দানশীন মেয়েও পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে, আবার খোলামেলা পোশাকের মেয়েও ভিকটিম হচ্ছে। এর জন্য মূলত দায়ী পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধ, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি।

হিজাব-নিকাব-বোরকার উৎপত্তি মুসলিম সমাজে নয়

শালীনতা ও পর্দা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক নারী হিজাব ব্যবহার করেন, বোরকা পরে থাকেন, নিকাবও ব্যবহার করেন; এটা ভাল দিক। ফলে মুসলিম সমাজে এসবের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ইসলামে পর্দার বিধান কেবল বোরকা, হিজাব-নিকাব ব্যবহারের নাম নয়। এটা ইসলামের বাধ্যতামূলক কোন বিধান নয়; হিজাব ও বোরকা ব্যবহারের পরও যদি পর্দা ও শালীনতা ঠিকমতো রক্ষিত না হয়, তাহলে এমন পোশাক ব্যবহারের কোন মানে নেই। ইসলামে নারীর প্রতি যে পর্দার বিধান আরোপ করা হয়েছে, সেই বিধান পালন করতে অনেকে বলে থাকেন, হিজাব-নিকাব-বোরকা হচ্ছে অবরোধ প্রথা। এসবের ব্যবহার নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করে, গৃহবন্দি করে। কথাটি পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্য। বিশেষ করে হিজাব, নিকাব, বোরকার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিকটি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি মেনে নিতে হবে। তার আগে বলে রাখা ভাল, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে যে কঠিন পর্দা প্রথা আছে, এটা রাসূলের যুগে বা ইসলামের প্রাথমিক যুগে চালু হয়নি, এটা অনেক পরে প্রচলিত হয়েছিল[১৯৬]।

হিজাব ও বোরকা অনেকটা মুসলিম সমাজে ট্রাডিশনে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম নারীর উপর তা চাপিয়েও দেয়নি। খলিফা উমর (রা.) এর সময় থেকে পর্দা প্রথা কঠোর হতে থাকে[১৯৭]। এ সময় থেকে নারীদের জন্য পৃথক

[১৯৬]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[১৯৭]. Tajul Islam Hashmi, *Women and Islam in Bangladesh, Beyond Subjection and Tyranny*, Ibid, P. 40

স্থানে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়[১৯৮]। দশম শতাব্দীর মধ্যেই ইসলামী সাম্রাজ্য বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিকে অন্তর্ভূক্ত করে ফেলে। এ সময় মুসলিম শাসক ও এলিটরা পারস্যের মুক্ত ও উঁচু শ্রেণির নারীদের ব্যবহৃত পর্দা প্রথাকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করে। এভাবে এমন কঠোর পর্দা ইসলামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়[১৯৯]।

পারস্যে এই প্রথা তাহলে এলো কী করে? হিজাব-বোরকা প্রথম চালু হয় মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় অ্যাসিরীয় নামক জাতিদের সময়ে। তখন এটা চালু হয়েছিল অবরোধ প্রথার উদ্দেশ্যে; নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করার জন্য, গৃহবন্দি করার জন্য এবং বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য।

কোন প্রেক্ষাপটে অ্যাসিরীয়রা এই হিজাব প্রচলন করে? দাস প্রথার উৎপত্তি মেসোপটেমিয়া সভ্যতায়। এই সভ্যতা অ্যাসিরীয়দের সময় অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন তারা যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত মানুষদের দাস-দাসীতে রূপান্তর করতো; নারী দাসীদের রক্ষিতা বানাতো। দাস-দাসীর সংখ্যা একটা পর্যায়ে এত পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়েছিল যে, অভিজাত নারীদের আরামে দিনাতিপাত করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। এ সময় নারীদের অভিজাত শ্রেণী হিসেবে মর্যাদাবান করে রাখতে বাইরের চলাচলরত দাসী, বাদী, পতিতা, রক্ষিতাদের থেকে আলাদা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় তাদের মধ্যে। এই প্রয়োজনীয়তা থেকে তারা নারীদের বাইরে যাবার বিষয় আইন করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলো। যদি কখনো অভিজাত নারীকে বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হতো, তখন তারা নিজেদেরকে বাইরের দাসী-রক্ষিতাদের থেকে পার্থক্য প্রকাশ করতে বিশেষ পোশাক পরে মাথা এবং মুখ ঢেকে বের হতে হতো। এভাবে হিজাব-নেকাব ও বোরকার উৎপত্তি হয়।

৫৩৯ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে পারস্যরা অ্যাসিরীয়দের রাজধানী মেসোপটেমিয়া দখল করে। বিজয়ীর বেশে তারা যখন নগরে প্রবেশ করে, তখন রাস্তায় কিছু নারীকে বিশেষ পোশাক পরা এবং মাথা ও মুখ ঢেকে চলাচল করতে দেখে। তখন তারা জানতে পারে যে, অ্যাসিরীয়দের অভিজাত নারীরা ঘরের বাইরে আসেনা, কোন কারণে আসলে তারা যে অভিজাত পরিবারের নারী, তা পথচারীদেরকে জ্ঞাত করতে তারা তাদের মাথা এবং মুখ ঢেকে রাখে। পার্সিরাও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে তাদের নারীদের মধ্যেও এই প্রথাকে গ্রহণ করে। পার্সিদের মাধ্যমে পরবর্তীতে এটা সিরিয়া, লেবানন ও উত্তর আরবে আসে। তবে আরবের সর্বত্র তখন পর্যন্ত এই প্রথা প্রসার লাভ করেনি।

---

[১৯৮]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[১৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

ইসলাম যখন পারস্য সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয়, তখন আরবেও এই প্রথা বিস্তৃত হয়। পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে হিজাব-বোরকা একটি ভাল পদ্ধতি হওয়ায় এই প্রথা মুসলিম সমাজে আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপও পেয়ে যায়। সৈয়দ আমীর আলী লিখেন, 'ইসলামের নবী পারসিক ও প্রাচ্যের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এই প্রথার (পর্দা) প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন; তিনি এর সুবিধাগুলি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সম্ভবত জাতির বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক নৈতিক শৈথিল্যের দরুণ তিনি নারীজাতির প্রতি পর্দাব্যবস্থার অনুমোদন করেছিলেন। তিনি নারীজাতির জন্য পর্দাপ্রথার বর্তমান অনমনীয়রূপ অনুমোদন করেছিলেন কিংবা তিনি নারীজাতির অবরোধের অনুমতি দিয়েছিলেন এরূপ অনুমান করা তদীয় সংস্কারসমূহের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। নারী জাতির অবরোধ নতুন ধর্মমতের অংশ কোরআন এই মর্মে কোন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে না[২০০]।'

মাথা ও মুখ আবৃত রাখা অবস্থায় নারীদের বিশেষ পোশাক পারস্যতে দেখার পর এটা যে পর্দার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুমোদন দিয়েছেন, সৈয়দ আমীর আলী এমন কথা জোর দিয়ে বলেননি। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে পর্দাপ্রথার অনমনীয় রূপ অনুমোদন করেন নাই, এটা তাঁর কথায় স্পষ্ট। পারস্য থেকে মুসলিম সমাজের এই বিশেষ পোশাক (বোরকা, হিজাব, নিকাব) আসলেও যে নবীর সময়ে আসে নাই, সেটা বুঝা যায় বিভিন্ন কারণে। প্রথমত: পর্দার বিধান এসেছে ৫ম ও ৭ম হিজরীতে। এই বিধান আসার পর তিন অথবা পাঁচ বছরের মাথায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেন। পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর রাসূলের জীবদ্দশায় এই অল্প ক'বছরে মুসলিম সমাজে নৈতিক শৈথিল্য দেখা দেওয়ার কথা নয় এবং এই কারণে এই অল্প সময়ের মধ্যে পারস্য বা ইরানের ওই বিশেষ পোশাক দেখে রাসূল (সা.) এটা অনুমোদন দেওয়া কথা নয়। দ্বিতীয়ত: হযরত উমর (রা.) এর আমলে পারস্য মুসলিম সাম্রাজ্যের আওতায় আসে। এর পর সেখানে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালেল পর পারস্যের এই প্রথা মুসলিম সমাজে আসে, একথা বলা যায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলীও এমনটি মনে করেন। তাঁর অভিমত, হযরতের সময় পর্দার নামে অবরোধ ছিল না। এই প্রথা ইরানী সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্টি যা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের ইন্তিকালের অনেক পরে আমদানী করা হয়েছে[২০১]। এই কথা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। কারণ উমর (রা.) এর সময় পারস্যে ইসলামের বিজয় হলেও তাদের

---

[২০০]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

[২০১]. এস ওয়াজেদ আলী, 'তুর্কি হানুম', সৈয়দ আকরাম হোসেন সম্পাদিত, *এস ওয়াজেদ আলী রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯০

এই প্রথার দ্বারা মুসলিম সমাজ প্রভাবিত হতে একটু সময়েরই প্রয়োজন ছিল। ততদিনে নিশ্চয়ই সাহাবীগণের বড় অংশটি আর পৃথিবীতে ছিলেন না। তবে এটা সত্য যে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় উৎপত্তি হওয়া এই হিজাব-নিকাব প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। গোলাম মুরশিদ তাঁর *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* গ্রন্থেও লিখেন, প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমান নারীদের পুরুষদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখার রীতি প্রচলিত ছিলো[২০২]।

হিজাব-নিকাব বা বোরকা বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা ব্যবহার করলেও পৃথিবীর কোন কোন দেশের অন্য ধর্মের নারীরাও বড় জামা পরে, যেমনটির কথা ইসলামে বলা হয়েছে। এরকম একটি দেশ হচ্ছে রোমানিয়া। ভিন্ন নামে হিজাব বা বড় পোশাক পরে থাকে আজকের রোমানিয়ান নারীরা। রোমানিয়া খ্রিস্ট্রান অধ্যুষিত একটি দেশ এবং সেখানে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই তো কিছুদিন আগেও দেশটিতে সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম ছিল; বর্তমানে অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এটি। দেশটির অবিবাহিত মেয়েরা চুল খোলা রাখতে পছন্দ করে। এই অবিবাহিত মেয়েরা সাধারণত চুলে বেণি গাঁথে। আর বিবাহিত নারীরা মারামা নামক একধরনের কাপড় দিয়ে চুল ঢেকে রাখে[২০৩]। অন্যদিকে রোমানিয়ান নারীরা নিজ দেশের বাইরেও বিরাট ঝোল ঝোলা কালো রংয়ের বোরকা জাতীয় আলখাল্লা পরে। তাদেরকে দেখলে প্রথম দফায় মনে হবে, তারা কোন আরব নারী কিংবা মুসলিম নারী। আসলে রোমানিয়ার পোশাকের সংস্কৃতি এরকম।

ইসলামের হিজাব-নিকাব আর মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অ্যাসিরীয়দের নারীদের হিজাব-নিকাবের মধ্যে ব্যবধান আছে। অ্যাসিরীয়দের উদ্দেশ্য ছিলো নিছক আভিজাত্য প্রকাশ করা এবং তাদের নারীদের বাইরে চলাচল সীমাবদ্ধ করে অন্তঃপুরবাসিনী করা। ইসলামের পর্দার উদ্দেশ্য হচ্ছে শালীনতা রক্ষা করা।

বাংলাদেশে বোরকা ও নিকাবের প্রচলন যেভাবে

বাংলাদেশে বোরকা ও হিজাব-নিকাবের আগমন কবে ও কিভাবে হয়েছে, এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। আনুষঙ্গিক নানা তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এই উপমহাদেশে এক সময় আধুনিক ও শালীন পোশাকের অনুপস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে অন্য কোন উপযুক্ত পোশাকের অস্তিত্ব না থাকায় শালীনতা ও আবরু রক্ষার

[২০২]. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ৬৫

[২০৩]. রাকিব হাসান, রোমানিয়া, *নিভৃতে থাকা ইউরোপের বৈচিত্রপুর্ণ দেশের গল্প*, দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০২০

প্রয়োজনে অন্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত বোরকা ও হিজাব-নিকাব গ্রহণ করা হয় কিংবা ইসলামের পর্দার বিধান এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে রক্ষিত হয় বলে এটা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অবরোধপ্রথা যে ইসলামের বিধান নয়, তাহলে পর্দার নাম করে গৃহবন্দিত্বের বিষয়টি বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছিল কিভাবে? পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণের পাশাপশি নারীর উপযুক্ত পোশাকের অভাবে তথা বাইরে বের হওয়ার মতো পোশাক না থাকার কারণে অবরোধপ্রথা বা গৃহবন্দিত্বের বিষয়টি প্রচলিত হয়।

কেমন ছিল তখনকার পোশাক? আধুনিকায়নের আগে বাঙালি নারীদের পোশাক ছিলো অতি সরল ও সাধারণ, মাত্র একখানি পাঁচগজি শাড়ি, আর কিছুই নয়[২০৪]। অনেকে বলে থাকেন যে, এই শাড়ি ছিল মূলত হিন্দু নারীদের পোশাক। এখানকার মুসলিমদের বড় অংশ এক সময় হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও জনগণের মধ্যে প্রচলিত অনেক প্রথা ও সংস্কৃতি রয়ে যায়। শাড়ি এমনই একটি প্রথা, যা এখানে প্রচলিত ছিলো এবং বহু মানুষ মুসলমান হয়ে গেলেও তাদের নারীরা শাড়ি পরার অভ্যাস ত্যাগ করেনি। অধ্যাপক আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অন্যকথা বলেন। তিনি লিখেন, শাড়ী, লুঙ্গি ইত্যাদি পোশাক হিন্দু ধর্মীয় নয়, শাড়ি মূলত ভারতীয় পোশাক[২০৫]।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, ভারতের অনেক এলাকার মুসলিমগণ শাড়িকে 'হিন্দু' পোশাক বলে গণ্য করেন। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে মুসলিম নারীগণ শাড়ি পরিহার করেন এবং কোনো মুসলিম নারী তা পরিধান করলে তাকে হিন্দুদের অনুকরণের কারণে নিন্দা করেন। তবে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে শাড়ী 'ধর্মনিরপেক্ষ' পোশাক হিসেবে গণ্য। মুসলিম-অমুসলিম সকলেই শাড়ি পরেন[২০৬]। তিনি শাড়িকে প্রায় ধুতির মতো অবস্থায় বিবেচেনা করে লিখেন, ধুতি এক সময় মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে তা হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখন তা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ পোশাক বলে বিবেচিত[২০৭]।

পর্দা ও শালীনতার কথা চিন্তা করলে শাড়িকে কোনভাবেই আদর্শ পোশাক বলা যায় না। শাড়ির ব্যাপারে কারো কারো মন্তব্য এমন যে, এটি হচ্ছে যৌন আবেদনময়ী পোশাক; শাড়ি একজন নারীকে যৌনাবেদনময়ী দেখাতে

---

[২০৪]. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ২১৪

[২০৫]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ২৩৮

[২০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫

[২০৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

চটকদার করে তোলে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি লেখায় এমনি কিছু বিবরণ চলে আসায় অনেক নারীর পাশাপাশি অনেক পুরুষও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখান এবং তাঁর লেখাটি ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত হয়। ২০১৯ সালে একটি জাতীয় দৈনিকে লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। অনেকে এই লেখাটিকে নারী বিদ্বেষী, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ আর বর্ণবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন[২০৮]।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ভাষায়, 'শাড়ি পৃথিবীর সবচেয়ে যৌনাবেদনপূর্ণ অথচ শালীন পোশাক[২০৯]।' রমণীর শরীরের রমণীয় এলাকা বিভাজনের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি লিখেন, 'আধুনিক শাড়ি পরায় নারীর উঁচু-নিচু ঢেউগুলো এমন অনবদ্যভাবে ফুটে ওঠে, যা নারীকে করে তোলে একই সঙ্গে রমণীয় ও অপরূপ। শাড়ি তার রূপের শরীরে বইয়ে দেয় এক অলৌকিক বিদ্যুৎ হিল্লোল[২১০]।' তিনি শাড়িকে রহস্যময় পোশাক হিসেবেও অভিহিত করেন; কারণ এই পোশাক নারীর দেহের অনেক অংশ অপ্রকাশিত রাখে ও প্রদর্শন করে বলে দর্শকের চোখ অনিন্দ্য হয়ে ওঠে। শাড়ি উপর এই লেখা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলেও এই পোশাক সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনাকে যথার্থ বলেছেন কেউ কেউ। একজন ফ্যাশন ডিজাইনার এই লেখার স্বপক্ষে অবস্থান নিয়ে লিখেন, 'আমাদের রক্ষণশীল সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটি একটি সাহসী লেখা। অনেক উদার লেখা[২১১]।'

শাড়ি নিয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মন্তব্য মোটেও বেঠিক নয়। নানা দিক থেকে শাড়ির ব্যবহার আপত্তিকর এবং অসুবিদাজনক। ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত সতর শাড়ীতে আবৃত করা খুবই কষ্টকর। শাড়ি পরার পদ্ধতির কারণে বিশেষ সতর্ক না হলে পিঠ, বুকের উপরিভাগ, পেট, তলপেট ইত্যাদি অনাবৃত থেকে যায়। এসব কারণে মুসলিম নারীদের শাড়ী ব্যবহার না করাই উচিত বলে মত দেন অধ্যাপক আনম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর[২১২]।

শাড়ির সাথে এখন ব্লাউজ, সায়া (পেটিকোট) ইত্যাদি পরা হয়। তারপরও দেখা যায় যে, ইসলামে যে পর্দার কথা বলা হয়েছে, শাড়ি পরলে তা লংঘিত হয়। উনিশ শতকে ব্লাউজ-পেটিকোট ছাড়া কেবলই শাড়ি পরা হতো, ফলে নারীরা প্রায় অর্ধনগ্ন থাকতো। ব্লাউজ-পেটিকোট ছাড়া শাড়ি পরার বিষয়টি বিশ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ সময়েও

---

[২০৮]. বিবিসি বাংলা, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; দৈনি যুগান্তর, ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[২০৯]. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, *শাড়ি*, প্রথম আলো, ৩০ আগস্ট ২০১৯

[২১০]. প্রাগুক্ত

[২১১]. খাদিজা রহমান, *শাড়ি'র নারী*, দৈনিক প্রথম আলো, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[২১২]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

বাংলাদেশের বহু গ্রামীণ অঞ্চলে দেখা যেতো। উনিশ শতকের নারীর পোশাকের এই অনুপযুক্ততার বিষয়টি গোলাম মুরশিদের লেখায় এসেছে।

গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেন, ফ্যানি পার্কস নামে এক ইংরেজ নারী ১৮২০ সালে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। তিনি কিছু বাড়ির অন্তঃপুরেও গিয়েছিলেন। বাঙালি নারীদের পোশাক সম্পর্কে তিনি তার ডায়রীতে লিখেছিলেন, বাঙালি নারীরা একমাত্র শাড়িই পরতেন। শাড়ির নিচে অন্য কোন বস্ত্রই ব্যবহার করা হতো না[২১৩]। ফ্যানি পার্কসের স্মৃতিকথা পরে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজ নারী পোশাকের বিবরণ দিতে গিয়ে আরো লিখেন, শাড়ির জমিন এতো পাতলা ছিলো যে, তাকে 'স্বচ্ছ' বলাই শ্রেয় এবং তা আচ্ছাদন হিসেবে অর্থহীন। এর মধ্য দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন ও চামড়ার রঙ দেখা যেতো। তিনি বলেন, তাদের বস্ত্র দেখে আমি বুঝতে পারলাম কেন স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের অন্তঃপুরে যেতে দেওয়া হয় না[২১৪]। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও[২১৫] যে বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনার সাথে ফ্যানি পার্কসের বিবরণের মিল আছে। তিনি লিখেন, একমাত্র শীতকালেই বাঙালি নারীরা শাড়ির উপর একটি চাদর পরতেন[২১৬]। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকুমার চন্দ্র এবং আরো অনেকের লেখাতেই এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৬৮ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকার একটি লেখায় বলা হয়, লম্বা শাড়ি পরলেও প্রকৃত পক্ষে বাঙালি নারীরা প্রায় উলঙ্গই থাকেন এবং এরূপ পোশাক জনসমক্ষে পরার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়[২১৭]।

বাংলার নারীদের পোশাকে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। আজকের 'বম্বে স্টাইল'-এ শাড়ি পরা তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন। নতুন স্টাইলে শাড়ি পরার সঙ্গে সঙ্গে পেটিকোট এবং ব্লাউজ পরা চালু হয় এই জ্ঞানদানন্দিনীরই হাত ধরেই। জ্ঞানদানন্দিনী মনে করতেন, এক প্রস্থ প্রসারিত পাতলা কাপড়, যা শাড়ি বলে পরিচিত, তা আধুনিক নারীদের জীবনযাত্রার প্রণালীর সঙ্গে শোভনীয় কোন পোশাক নয়। তাই তিনি ভেবেছিলেন, বাঙালি নারীর সর্বত্র স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণের জন্য একটি আদর্শ পোশাক দরকার। মোম্বাইয়ে গিয়ে তিনি শাড়ি পরার ওরিয়েন্টাল পদ্ধতি বর্জন করেন ও পারসি নারীর শাড়ি পড়ার রীতি গ্রহণ করেন এবং ফ্যাশসদুরস্ত ও

---

২১৩. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

২১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

২১৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৮৫০ সালের ২৬ জুলাই যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মারা যান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজ উদ্যোগে পড়াশুনা শিখেছিলেন এবং লেখালেখি ও সাহিত্য চর্চা করেন। তিনি শিশুদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা বের করেন, যেখানে তারই উৎসাহ ও অনুরোধে কবিগুরু ছোটদের জন্য লেখায় হাত দেন।

২১৬. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

আরামদায়ক শাড়ি পরার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তবে তিনি নিজের পছন্দমত কিছুটা পরিবর্তন সাধন করেন[২১৮]। আঁচল দেবার বা কাঁধের উপর দিয়ে শাড়ি পরার পদ্ধতি তৈরি করেন। এ শাড়ির সাথে রয়েছে বডিস, পেটিকোট, জুতা ও মোজা। শুধু শাড়ি পরার ধরনেই নয়, জ্ঞানদানন্দিনী শুরু করলেন শাড়ির সঙ্গে জ্যাকেট পরার প্রচলন। নানা ধরনের লেস জুড়ে দেওয়া হতো এই জ্যাকেটে, যা পরবর্তী সময়ে ব্লাউজ নামে পরিচিত হয়[২১৯]।

১৮৭১ সালে জ্ঞানদানন্দিনী নতুন প্রবর্তিত পোশাকটি 'রাসবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন[২২০]। বাংলায় শাড়ি পরার এই পদ্ধতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সে সাথে তার ননদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীও এ নিয়ে কাজ করেন। সব কাজেই স্বর্ণকুমারী সহযোগিতা করতেন তাঁকে। জ্ঞানদানন্দিনীর মতো স্বর্ণকুমারীর জীবনযাপনেও ছিল রুচিশীলতার ছোঁয়া[২২১]।

আশ-পাশ তথা সমাজের বাস্তবতা নিয়ে সাধারণত নাটক-সিনেমা নির্মিত হয়। আমাদের দেশে এই তো কিছু দিন আগেও বিশেষ করে গেল শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকেও গ্রামীণ নারীদের একটি বড় অংশ ব্লাউজ-সায়া ছাড়াই যে কেবলই শাড়ি পরতো এবং তাদের অনেকে অর্ধউলঙ্গ থাকতো, তখনকার কিছু নাটক-সিনেমার দৃশ্যে সেটা ফুটে ওঠে। তেমনি একটি সিনেমা 'বধূ বিদায়'; দর্শক প্রিয় ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৭৮ সালে। সেই ছবিতে চিত্রনায়িকা কবরী ও শাবানা দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। শাবানা উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে হিসেবে এবং কবরী একজন সাধারণ গ্রামীণ নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। পরিচালক প্রথমে গল্পের প্লট সাজিয়েছিলেন শাবানাকে গ্রামীণ নারীর চরিত্রের ভূমিকায়; কিন্তু শাবানা অমত করায় কবরী শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ নারীর চরিত্রে অভিনয় করেন। শাবানার অমতের কারণ ছিলো, গ্রামীন নারীর চরিত্রে অভিনয় করতে হলে তাকে ভেতরের পোশাক ছাড়া শাড়ি পরে অভিনয় করতে হবে। ব্লাউজ-পেটিকোট ছাড়া শুধু শাড়ি পরে অভিনয় অর্ধনগ্ন দেখাবে বলে শাবানা মেনে নেননি।

২০২০ সালে একবার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পোশাকের প্রসঙ্গ টেনে শাবানা নিজেই বলেছিলেন, 'আমি পোশাকের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলাম। *বধূ বিদায়* ছবিতে পরিচালক প্রথমে আমাকে গল্পটা শোনালেন। এরপর গ্রামের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বললেন। পরিচালক জানান, এটা এমন একটি চরিত্র গ্রামের মেয়ে খালি

[২১৮]. চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* (ঢাকা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ২২
[২১৯]. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ মে ২০১৬
[২২০]. বাংলাপিডিয়া
[২২১]. চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

গায়ে শুধু একটা শাড়ি পরে অভিনয় করতে হবে। তখন আমি তাকে না করে দিয়েছিলাম। তখন পরিচালক আমায় শহরের মেয়ের চরিত্র দিয়েছিলেন[২২২]।' তখনকার গ্রামের মেয়েরা যে খালি গায়ে শাড়ি পরতো, সেটা শাবানার কথায় এবং 'বধু বিদায়' ছবির কবরীর অভিনয়ে বুঝা যায়। কবরীর সেই অভিনয়ে দেখা যায়, শাড়ি-পরিহিত, কিন্তু অর্ধনগ্ন। তখনকার শাড়ি-পরা গ্রামীণ নারীদের চিত্র এমনই ছিল।

'মাতৃত্ব' নামে আরেকটি ছবি মুক্তি পায় ২০০৪ সালে। একজন নারীর জীবনের সার্থকতা যে মাতৃত্ব, সেই মাতৃত্ব-এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী। এই ছবিতে স্তন্যদানের মতো একটি দুঃসাহসিক দৃশ্যে অভিনয় করে ব্যাপক আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি। গ্রামীন নারীর অবস্থার একটা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে শাড়ি পরে অর্ধনগ্ন অবস্থায় মৌসুমী অভিনয় করেন। ছবিতে দেখা যায়, অভাবের সংসারে অবশেষে অনেক চেষ্টার পর গ্রামীণ যুবতি নারীর গর্ভে সন্তান এলেও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখেনি। মায়ের বুকে দুধ থাকায় সকিনার চরিত্র ধারণ করা মৌসুমী মা-মারা যাওয়া এক নবজাতককে বুকের দুধ পান করান। ছবির সকিনা (মৌসুমী) শাড়ি পরতেন, যেখানে ভেতরে আর কোন পোশাক না থাকায় শরীরের অনেক অংশ দেখা যেতো এবং বাচ্চাটিকে স্তন্যপান করানোর সময় সেটা দৃশ্যমান দর্শকের কাছে। সরাসরি বক্ষ দৃশ্যমান রেখেও মৌসুমী ছবিতে একটি শিশু বাচ্চাকে স্তন্য পান করান। এমন দৃশ্যে অভিনয়ের কারণে তখন বিষয়টি চলচ্চিত্র অঙ্গনে বেশ আলোচিত হলেও অনেক মনে করেছেন যে, গ্রামীন নারীর বাস্তবতা তুলে ধরতে মৌসুমীকে এমন দৃশ্যে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

এই আপত্তিকর দৃশ্যসহ আরো দুইটি সংলাপের উপর আপত্তি তুলে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সে সময় ছবিটি আটকে দিয়েছিল[২২৩]। এই প্রেক্ষিতে ছবির পরিচালক ও প্রযোজক জাহিদ হাসান ছবিটির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যদের নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন এই দৃশ্যের তথা একটি বাচ্চাকে খোলামেলাভাবে স্তন্যপান করানোর বাস্তবতা তুলে ধরেন[২২৪]। ছবিটি দেশের তখনকার বিশেষ করে গেল শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। ছবিতে নারীর প্রতি সমাজের অন্যায় আচরণ বিশেষ করে স্বামীর নির্মম আচরণেরও একটা চিত্র ফুটে। পোশাকের দিক থেকে বিশেষ করে শাড়ি-পরা নারীরা গেল বিশ শতকেরও বড় অংশজুড়ে অনেকটা অর্ধনগ্ন থাকলেও অধিকারের দিক থেকে অর্ধ নয়; আরো নিচে ছিল।

---

[২২২]. দৈনিক আমাদের সময়, ৩০ জানুয়ারি ২০২০ (http://www.dainikamadershomoy.com/post/239162)
[২২৩]. Daily Star, May 18, 2004 (archive- Vol. 4 Num 343)
(link: http://archive.thedailystar.net/2004/05/18/d40518140195.htm, last visited May 11, 202)
[২২৪]. Ibid

উপরের তথ্য ও বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণে বলা যায়, এক সময় আবরু রক্ষার জন্য নারীদের কোন পোশাক ছিল না। প্রচলিত পোশাকে আবরু রক্ষা হতো না, অর্ধনগ্নতা রয়ে যেতো, যেটাকে অনেকে 'প্রায় উলঙ্গ' বলেছেন। এমন অবস্থা ইসলাম ধর্ম কেন, কোন সভ্য সমাজই সমর্থন করতে পারে না। ফলে সম্ভবত নারীকে অর্ধনগ্ন অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য বোরকার প্রচলন হয় আমাদের দেশের মুসলিম সমাজে। বিশ শতকের শুরুর দিকেও যে নারীর উপযুক্ত পোশাকের অভাব ছিল সেটা বুঝা যায় রেগম রোকেয়ার সমসমায়িক নারী লেখিকা মিসেস এম. রহমানের লেখায়। তিনি লিখেন, বাঙালি নারীদের উপযুক্ত পোশাক নেই বলে বোরকা পরার ব্যবস্থা করতে হয়, অবরোধের ঘেরাটোপে থাকতে হয়। তিনি প্রয়োজনীয় আবরু রক্ষাকারী পোশাক আবিস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন[২২৫]।

পর্দাপ্রথা ও অবরোধপ্রথা এক নয়

কুরআনে হিজাবের কথা বলা হয়েছে। পর্দা ফার্সি শব্দ, যাকে আরবীতে হিজাব বলা হয়। এই পর্দা রক্ষা করার জন্য সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে জিলবাব শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। দেহের সাধারণ পোশাক-জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপরে যে বড় চাদর বা চাদর জাতীয় পোশাক দিয়ে পুরো দেহ আবৃত করা হয় তাকে জিলবাব বলে[২২৬]। নারীকে জিলবাব পরতে বলা হয়েছে; কারণ ইসলামে নারীর পোশাকের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে মূলত পর্দার মূল্য উদ্দেশ্য মেনে চলার জন্য। 'লজ্জাস্থান' বা দেহের গোপন অংশসমূহ আবৃত করাই পোশাকের মূল উদ্দেশ্য[২২৭]। ফলে জিলবাবের প্রধান উদ্দেশ্য তাই; কারণ পুরষের চাইতে নারী দেহে লজ্জাস্থানের পরিমাণ বেশি।

কুরআনের এই হিজাবের বিধান পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে বেশ কড়াকাড়ি আরোপ করা হয়, যা অবরোধ প্রথায় রূপ নেয়। এর ফলে মুসলিম নারী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, আরো বিভিন্ন নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বাংলার মুসলিম সমাজে এবং অন্য সম্প্রদায়েও নারীর শিক্ষাহীনতা ও পশুসম জীবন যাপনের প্রধান কারণ ছিল অবরোধ প্রথা। এ প্রথা নারীসমাজকে অন্তঃপুরবাসিনী করে তুলেছিলো। উনিশ শতকে আমাদের দেশে এই অবরোধ প্রথা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। তৎকালীন নারীরা অন্তঃপুরে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো এক প্রকার বন্দি জীবন অতিবাহিত করতো[২২৮]। হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের অবরোধ বা

---

[২২৫]. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৫৬

[২২৬]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

[২২৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[২২৮]. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

পর্দার মধ্যে থাকতে গিয়ে বাড়ির ভেতরেই থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। মুসলিম সমাজে পর্দার ধর্মীয় সমর্থন থাকায় তার কঠোরতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌছেছিল[২২৯]। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার পরিবারেও এই বাড়াবাড়ি ছিল এবং পর্দার নামে কার্যত কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল[২৩০]। ফলে একটু পরিণত হতেই পর্দার নামে নারীকে গৃহবন্দি করার প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন।

ইসলামের পর্দার বিধান আর মুসলিম সমাজে প্রচলিত হওয়া অবরোধ প্রথা এক নয়। কুরআনে পুরুষকেও পর্দা করতে বলা হয়েছে; তবে নারীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা এসেছে। ইসলামের পর্দা হচ্ছে সামগ্রিক শালীনতার নাম। কোন নারী যদি আটসাট বোরকা-হিজাব পরে বাইরে বের হয়, তার শরীর দেখা না গেলেও শরীরের বিশেষ অঙ্গের ভাঁজ স্পষ্ট দেখা যায়; কিংবা বোরকা পরা থাকলেও মাথার চুল ও বুকের উপরিভাগ দেখা যায়; এমন বোরকা পরাকে পর্দা বলে না। এটা পর্দার খেলাফ। আবার কোন মেয়ে যদি হাত-মুখ ঢেকেও বোরকা পরে বাইরে বের হয়ে কোন বেগানা ছেলের হাত ধরাধরি করে কোথাও ঘুরে বেড়ায়, ঐ মেয়েটি হয়তো বাইরে রাস্তাঘাটে মানুষজনের দৃষ্টির আড়ালে তার শরীর ও চেহারা রাখতে পারলো, কিন্তু সে নিজেকে প্রকৃত পর্দার মধ্যে রাখতে পারলো না; বরং অন্যায় ও পাপ কাজে নিজেকে শামিল করলো; ইসলাম এমন পর্দার কথা বলেনি। কারো চোখের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ার চাইতে অনেক বেশি ভয়ংকর হচ্ছে পর পুরুষ কর্তৃক হাতের স্পর্শ।

কেউ যদি বাইরে বের না হয়েও বাড়ির ভেতরেই বন্দি থাকে, কিন্তু সেথায় সে চাকর-বাকর বা কাজের পুরুষ লোকদের সামনে অর্ধনগ্ন থাকে, তাহলে বাইরে বের হওয়া থেকে এই বিরত থাকাকে পর্দা বলা যায় না। শরীরকে অর্ধনগ্ন করা অন্যায়, তা যেথায়ই হোক। পর পুরুষের সাথে বেশি খোলামেলাভাবে না মেশার নাম পর্দা, বোরকা-হিজাব পরেও বেগানা ছেলের সাথে গোপন অভিসারে না যাওয়ার নাম পর্দা, সতীত্ব রক্ষার নামও পর্দা এবং সর্বোপরী নারী-পুরুষ উভয়েরই দৃষ্টি সংযত রাখার নাম পর্দা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী মসজিদে নামাজের জামায়াতে শামিল হয়েছে, প্রয়োজনে পর পুরুষের সাথে কথা বলেছে, যুদ্ধেও অংশ নিয়েছে এবং এমনকি যুদ্ধে নেতৃত্বও দিয়েছে। ফলে শরীরকে অর্ধনগ্ন না রেখে, শালীনতা বজায় রেখে, মুখ ও হাত খোলা রেখে কিংবা মুখ ও হাত ঢেকে রেখে বহিঃস্থ কর্মকাণ্ডে একজন নারী যখন জড়াবে

---

২২৯. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

২৩০. অধ্যাপক আব্‌দুল মান্‌নান ও শামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

কিংবা প্রয়োজনে বাইরে বের হবে; সেটা পর্দার মধ্যে পড়ে। কিন্তু কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন বাণীর অপব্যাখা করে, কিংবা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কিংবা নারী নিজে অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে গোটায়ে পর্দাপ্রথার দোহাই দিয়ে গৃহের চারকোণে সীমাবদ্ধ থাকার নাম অবরোধ। এই অবরোধপ্রথা ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি, বাড়াবাড়ি ও নারীর অধিকারের খেলাফ।

বিশ শতকের শুরুর দিকে কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী তাঁর *পর্দা ও অবরোধ* প্রবন্ধে পর্দা ও অবরোধের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। পর্দা আর অবরোধকে ভিন্ন আখ্যা দিয়ে তিনি অবরোধবাসিনী বাঙালি মুসলিম নারীদের 'চোখ বাঁধা ঘানির বলদ' এর সাথে তুলনা করেছেন[২৩১]। পর্দা ও অবরোধের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমি পর্দা মানি কিন্তু অবরোধ প্রথার সমর্থন করি না। অবরোধ মানবের অন্তঃকরণকেই ক্লিষ্ঠ ও পরাধীন করিয়া ফেলে। বিশেষ বিশেষ অপরাধে পুরুষগণ অবরোধবাসিনী হইতে বাধ্য হন, কিন্তু মহিলাগণ বিনা অপরাধেই শাস্তি ভোগ করিতেছেন। চোখ বাঁধা ঘানির বলদ আর বঙ্গীয় মোসলেম মহিলায় বিশেষ পার্থক্য নাই[২৩২]।'

রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী অবরোধ প্রথার ক্ষতিকর দিক এর বিরুদ্ধে, কিন্ত অবরোধ ভাঙতে গিয়ে পর্দা ত্যাগ করার বিপক্ষে নন। তিনি পর্দাকে ভদ্র ও শালীন পোশাকের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। পর্দা ও বোরকা ছেড়ে নয়, মুক্ত আলো-বাতাসে রূপকে পর পুরুষষের উপভোগ করানো যাবে না, খোলা গাড়িতে বেড়াতে আপত্তি নেই, খোলা মাঠেও বেড়াতে আপত্তি নেই, খোলা শরীরে বেড়াতেই আপত্তি। তাঁর মতে, 'পর্দা হলো নারীর শুচিতা ও চক্ষু লজ্জা, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পবিত্রতা। বাহিরের অশূচি স্পর্শ হতে, শয়তানের পাপচক্ষু হতে পরিত্রাণের জন্য নারীর একটু আবরণের প্রয়োজন, সে আবরণ পর্দা বা বোরকা।'

তিনি বলেছেন, 'অবরোধ ভাঙতে গিয়ে মহান গুরু ও আদর্শ পথ প্রদর্শক রাসূলের উপদেশ অবজ্ঞা করে, আল্লাহ তায়ালার অনভিপ্রেত কার্য দ্বারা তার অভিসম্পাত শিরে ধারণ করে পরম উপকারী পর্দাও ছিন্ন করে ফেলিতেছি[২৩৩]। এখানে তিনি ইসলামের পর্দাপ্রথার শ্বাশত দিক তুলে ধরেছেন ও পর্দার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু বাঙালি মুসলিম সমাজে পর্দার নামে যা হতো, সেটাকে তিনি জোরালোভাবে প্রত্যাখান করেছেন।

---

২৩১. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
২৩২. প্রাগুক্ত
২৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

আমাদের সমাজে রক্ষণশীলতা বিদ্যমান। যারা হিজাব-বোরকার পক্ষে; তাদের অনেকেরই মধ্যে একধরণের কট্টরপন্থা কাজ করে। আর যারা আধুনিকতার নামে হিজাব-বোরকার বিরোধী, তাদের অনেকেরও মধ্যে আরেক ধরণের কট্টরপন্থা কাজ করে। ২০২০ সালে একটি ছবি পত্রিকার পাতায় ছাপা হওয়ার মাধ্যমে সেটা বুঝা গেছে। রাজধানীর পল্টন ময়দানে মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলের সঙ্গে বোরকা পরা এক মায়ের ক্রিকেট খেলার ছবিটি ছাপা হওয়ার পর বেশ আলোচিত হয়। ছবিতে দেখা যায়, পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত শিশু ছেলে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে; অপর প্রান্তে বোরকা পরিহিত মা ব্যাট করছেন! মুহূর্তেই সেটি ছড়িয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুকে। সেখানে বোরকা নিয়ে তর্কটি ছাপিয়ে গেছে ক্রিকেটকেও।

বোরকা পরা একজন নারীকে তার ছেলের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখে অনেকে ঈর্ষান্বিত হন। কারণ তাদের ধারণা, বোরকা বা হিজাব পরা নারীরা ঘরের মধ্যেই থাকবে অথবা বাইরে বের হলেও তারা বেঁধে দেওয়া তথাকথিত কিছু বৃত্তের ভেতরেই ঘুরপাক খাবে। বোরকা পরিহিত একজন নারী ক্রিকেট খেলবে, এই দৃশ্যটি তারা দেখতে চায় না। কারণ, নারীর জন্য তারা যে ধরনের সমাজ কল্পনা করে, সেখানে তারা নারীকে নিতান্তই শরীরসর্বস্ব প্রাণীর অধিক কিছু ভাবে না। ফলে দেখা যায় যে, আমাদের সমাজে নারীকে বোরকার বাইরে অন্য পোশাকে দেখলে অনেক ইসলামপন্থী বিরক্ত হন, নাক ছিটকান। আবার অনেকে বোরকা বা হিজাব দেখলেই বিরক্ত হন বা এ ধরনের ধর্মীয় পোশাককে নারীর অগ্রযাত্রায় বিশাল বাধা মনে করেন। এই দুই ধরনের লোকই কট্টরপন্থি[২৩৪]।

যারা নেকাব পরে, হিজাব-বোরকা পরে; তাদের একটা অংশ এসব যারা ব্যবহার করে না তাদের ব্যাপারে চরম নেতিবাক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। হিজাবী ও নেকাবীদের কেউ কেউ অ-নেকাবীদের দেখে বলে 'বেহায়া ও বেপর্দা' নারী। অন্যদিকে, যারা নিকাব-হিজাব পরে না; তাদের একটা অংশ; যাদের কেউ কেউ আবার নিজেদেরকে নারীবাদি বলে; এরা আবার নিকাব-হিজাবের মধ্যে পশ্চাৎপদতা খোঁজে। অ-নেকাবীদের অনেকে নেকাবীদের বলছে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে। উভয় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ অনুচিত।

নেকাব ব্যবহার হচ্ছে তাকওয়ার স্তরের একটি বহিঃপ্রকাশ। যিনি নেকাব ব্যবহার করছেন না, তিনি কোন অন্যায় করছেন না। আবার যিনি ব্যবহার করছেন, তাকওয়ার স্তরে তিনি একটু এগিয়ে আছেন। যিনি হিজাব-নেকাব ব্যবহার করেন, তাকে নেকাব খুলতে উৎসাহিত করা উচিত নয়। আবার যিনি হিজাব-নেকাব ব্যবহার করছেন না,

২৩৪. আমীন আল রশীদ, *সমস্যা বোরকার না মগজের?*, ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২০

তাকে জোর করাও ঠিক নয়। অনেকে হিজাব-নিকাব ব্যবহার করেও নিজেদেরকে খুব সাজগোজ করে প্রদর্শন করে বাইরে বের হন। এতে পর্দা ও হিজাবের আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। অতএব মরক্কোর নারীদের জিলাবা, পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর নারীদের আবাইয়া, ইরানী নারীদের চাদর এবং আফগান নারীদের বোরকার নামই কেবল হিজাব নয়। মূলত বেগানা পুরুষের চোখ থেকে নারীর শরীরকে পূর্ণ আড়াল করে রাখে এবং পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখতে সহায়তা করে, এমন পোশাক পরাকে হিজাব বলে। তাই জিলাবা, বোরকা, আবাইয়া/সেমিজের সাথে উড়না, স্কার্ফ, রুমাল, চাদর ইত্যাদি হিজাব হতে পারে, যদি সেটার মধ্যে শালীনতা থাকে।

বোরকা পরা বাধ্যতামূলক নয়, তবে শরীরকে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী আবৃত করা জরুরী। আর এই জরুরী কাজ খুব সুন্দরভাবে আদায় হয় ঢিলেঢালা বোরকার মাধ্যমে; টাইট ও আটসাট বোরকায় নয়। ফলে বোরকা পরলে ভাল। এতে ইসলামের পর্দার বিধান পালন হয়। কেউ বোরকা পরে যদি বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করে, এটাকে পর্দার খেলাফ হয়েছে মনে করা যাবে না। পল্টন ময়দানে মাদ্রাসাপড়ুয়া ছেলের সঙ্গে বোরকা পরা মায়ের ক্রিকেট খেলার বিষয়টি পর্দার খেলাফ নয়; বরং পর্দা রক্ষা করে একজন পর্দানশীন নারী অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান জানান দিয়েছেন।

কেউ যদি বোরকা ব্যবহার না করে কুরআনের বক্তব্য অনুযাযী জিলবাব ব্যবহার করে, যেটা বড় চাদর, বড় ওড়না কিংবা শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজের উপর অন্য বড় কাপড় পরে তাহলে হবে; আবার কেউ যদি মনে করে বোরকা পরলে সবচেয়ে ভাল, তাহলে আর ঝামেলা নেই, এতে জিলবাবের কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই বোরকা হতে হবে ঢিলেঢালা, নারীর শরীরের ভাঁজ এবং অন্য কোন কমনীয় অঙ্গ যাতে ফুটিয়ে না তুলে কিংবা যাতে অপ্রকাশিত না থাকে। অনেকে বাহারী সাজের বোরকা পরেন, যেখানে পর্দা ঠিকমতো রক্ষা হয় না। দেখা যায়, অনেকে বোরকা পরলেও তাদের মাথা প্রায় অপ্রকাশিত থাকে; কিংবা এমন পাতলা বোরকা পরেন, যাতে শরীরের ভেতরের পোশাক দেখার মধ্য দিয়ে অনেকটা শরীরও দেখা যায়, এমন বোরকা পরার নাম পর্দা নয়।

ইসলাম গৃহবন্দিত্ব কিংবা অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করে না। পর্দার বিষয়টি কেবল বাইরে নয়, বাড়ির ভেতরেও পর্দা রক্ষা করে চলতে হয়। আবার বোরকা পরিধান করে কিংবা অন্য কোন পোশাক ব্যবহার করে পর্দা রক্ষার মধ্য দিয়ে বাইরের কার্যক্রমেও জড়িত হওয়া যায়। বর্তমানে দেশে এবং পৃথিবীর আরো বহু দেশে বোরকা ও হিজাব পরে অসংখ্য নারী চাকুরী করছেন, ব্যবসা করছেন, সংসার সামলাচ্ছেন এবং সংসারের প্রয়োজনে বাজার-সদাই করা

কিংবা বাচ্চাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়া-আনারও কাজ করার মধ্য দিয়েও সাংসারিক কাজে বাসা-বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন। বোরকা-হিজাব ব্যবহার করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন করছেন অনেক নারী। এখানে পোশাক কোনো বাঁধা নয়; কিন্তু এক সময় এই পর্দা-হিজাবের নাম করে নারীকে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল।

নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কী ও কেন?

'নারী নেতৃত্ব হারাম'- দুর্বল কিংবা প্রেক্ষাপটের আলোকে বর্ণিত একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেমন নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংকোচনের পক্ষে বহু আলেম; তেমনি 'নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা কর্তৃত্ব'- কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি অর্থও প্রচলিত আছে, যার মাধ্যমে কুরআন থেকে দলীল দিয়ে অনেকে নারীর রাজনৈতিক অধিকারকে সংকুচিত করেন। বলা হয়েছে, 'নারী পুরুষের পরিচালক (নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব)। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের জন্য ব্যয় করে[২৩৫]।' কুরআনের এমন বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ করেননি, নারীর রাজনৈতিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করেননি। কুরআনের এই বক্তব্য পারিবারিক বিষয়ে অবতীর্ণ হলেও ভুলভাবে ব্যাখা করেন অনেকে। আসলে পারিবারিকভাবে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের প্রশ্নটি ইসলামে নারীর অধিকার অনুধাবনে বিতর্ক সৃষ্টি করে[২৩৬]।

পারিবারিক বিষয়ে অবতীর্ণ কুরআনের একটি আয়াতের এই বক্তব্যকে অনেকে রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করে মূলত গোলমাল সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতের আগের তথা সূরা নিসার ৩৩ নং আয়াতে নারীর উত্তরাধিকার ও তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে; এবং পরের আয়াত তথা ৩৫ নং আয়াতে পারিবারিক বিরোধ ও মিমাংসার বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা নিসার এই তিন আয়াতের পূর্বেও নারীদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে তাদের অধিকার বিনষ্ট করা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞাও ব্যক্ত হয়েছে[২৩৭]। আর বর্ণিত আয়াতটিও পারিবারিক বিষয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সেকথা আয়াতের 'তারা (পুরুষ) তাদের জন্য ব্যয় করে' এই কথার মাধ্যমেও স্পষ্ট।

আয়াতে ব্যবহৃত 'কাওয়্যাম' শব্দটিকে 'কর্তৃত্ব', 'শ্রেষ্ঠত্ব' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই মূলত আয়াতের এই অংশের ভুল অনুবাদ ও ব্যাখা করা হয়। অনেক মুফাসসির ও ইসলামিক স্কলার এমন অর্থ গ্রহণের পক্ষে নন।

---

২৩৫. কুরআন; ৪ : ৩৪

২৩৬. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬) পৃ. ১৩৯

২৩৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'রেফুল-কোরআন*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

তারা 'কাওয়্যাম' শব্দটিকে 'পরিচালক' অর্থে নিয়েছেন। তাদের কথা হচ্ছে, পরিবার পরিচালনার মূল দায়িত্ব স্বামী বা পুরুষের উপর দেওয়ার জন্য এই 'কাওয়্যাম' শব্দের ব্যবহার। ফলে এই শব্দের অর্থ পারিবারিক নেতৃত্বের অর্থে নেওয়া দরকার। মুফতী মুহাম্মদ শফী 'কাওয়্যাম' শব্দটিকে 'পরিচালক' অর্থেই নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কাওয়্যাম' বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কোন কাজ বা বিধানের পরিচালক অথবা দায়িত্বশীল। সাধারণত কোন যৌথ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী; রাষ্ট্র, সমাজ বা কোন গোত্র পরিচালনার জন্য যেমন একজন প্রধান ব্যক্তি থাকা অপরিহার্য, তেমনি পরিবার পরিচালনার জন্যও একজন পরিচালক বা অভিভাবক থাকা জরুরী। পরিবার পরিচালনার সে দায়িত্ব আল্লাহ পাক শিশু বা স্ত্রীলোকের উপর অর্পন না করে পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন[২৩৮]।

তাফসিরে তাবারীতেও 'পরিচালক' অর্থে নেওয়া হয়েছে[২৩৯]। ফলে কুরআনের এই আয়াতের অনুবাদ 'নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব/কর্তৃত্ব' না হয়ে 'পুরুষরা নারীদের পরিচালক' হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর এই 'পরিচালক' অর্থ ব্যবহৃত হবে পারিবারিক ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে, সামগ্রিকভাবে নয়। অন্যদিকে, এই আয়াতের অনুবাদ যদি 'নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব/কর্তৃত্ব'-ও করা হয়, তবুও এটা দিয়ে পুরুষের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব বুঝাবে না। পারিবারিক শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অন্যকথায় পরিবারের দায়িত্বশীল অর্থেই বুঝাবে।

পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানেরও একজন একক পরিচালক দরকার। তাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান করা হয়েছে পুরুষকে। তাকে এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল করা হয়েছে আরো কিছু অপরিহার্য দায়িত্বের বোঝা কাঁধে দিয়ে। এই আয়াতে পুরুষকে পরিবারের কর্তা বা দায়িত্বশীল বানিয়ে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হয়নি, বহিঃস্থ কর্মকাণ্ড থেকে তাকে বিরত রাখা হয়নি। এই আয়াতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়নি। এই আয়াতের মাধ্যমে সামাজিকভাবেও নারীকে ছোট করার কোন সুযোগ নেই। আয়াতের অর্থ পারিবারিক দায়িত্বের দিক দিয়েই নিতে হবে, নারীর উপর অযথা কর্তৃত্ব ফলানো এবং তার সাথে যেমন খুশি তেমন আচরণ করা নয় এই আয়াতের অর্থ।

---

২৩৮. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'রেফুল-কোরআন, দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

২৩৯. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী, *তাফসীরে তাবারী, সপ্তম খণ্ড*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ২২৬

পুরুষকে পিতার সম্পত্তিতে নারীর চাইতে বেশি দেওয়া হয়েছে। পারিবারিক দায়িত্বের ভার কাঁধে নেওয়ায় এই বেশি দেওয়ার একটি কারণ। সূরা নিসার এই আয়াতের মাধ্যমে পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানদের ভার পুরুষের উপর বর্তায়। পুরুষ যেন পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করে সে কথা এই আয়াতে বলার পাশাপাশি আরো কিছু পারিবারিক বিষয়ের কথা এসেছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, স্ত্রী-সন্তানদের আবাসন, খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবস্থা পরিবারের পুরুষ প্রধানকে করতে হবে। ফলে এই আয়াতের অর্থ হবে পুরুষদের অবশ্যই নারীর যত্ন নেওয়া উচিত।

পুরুষ বিয়ে করার সময় নারী তথা স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করে, যাবতীয় খোরপোশ ও ভরণপোষণ বহন করে, সংসারে আয়-রোজগারেরও মূল ভার তার উপর; ফলে সে পরিবারের নেতৃত্বে আসনে বসতেই পারে। '*নারী ও রাজনীতি*' বইয়ে এই আয়াতের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্বের প্রশ্নটি স্বামীর আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে বিবেচ্য। যেহেতু স্বামী তার অর্থ ব্যয় করে স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, এজন্য সে কর্তৃত্ব দাবী করতে পারে। কারণ প্রতিটি সমাজেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের কর্তৃত্ব স্বীকৃত[২৪০]।' তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়[২৪১]। কেননা আল্লাহর নিকট মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। আর দুনিয়াবী দৃষ্টিতে মেধা ও যোগ্যতা মর্যাদার একটি মাপকাঠি।

ইসলাম সমর্থিত পরিবারব্যবস্থা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক। এই পিতৃতান্ত্রিক বলতে অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক নয়। দায়িত্বশীলতার মানসিকতা নিয়ে পিতৃতান্ত্রিক। সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামোকে পিতৃতান্ত্রিক হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কারণ, পুরুষকে পরিবারের কর্তা বা নেতা বানানো হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে পুরুষ সাধারণত নারী অপেক্ষা শক্তিমান হয়; বাইরের কার্য্যক্রম এবং কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে নারী দয়ামায়া, স্নেহমমতা ও প্রীতিপ্রেমের জীবন্ত মূর্তি[২৪২]। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাপনায় কর্মবিভাজন করে। এমন অবস্থান থেকে পিতা বা একজন পুরুষ পরিবারের প্রধান হওয়া যুক্তিযুক্ত।

সমকালীন নীতিবিদ্যায় 'ethics of care' বলতে একটা বথা আছে। এই 'এথিকস অব কেয়ার' বা 'যত্ননীতি' পাশ্চাত্যের নারীবাদী দার্শনিকদেরই প্রস্তাবনা। তারাও বলছে, নারীরা কেয়ারিং হয়, সহনশীল হয়, স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ

---

[২৪০]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[২৪১]. *তফসীর মা'রেফুল-কোরআন, প্রথম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১

[২৪২]. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, পৃ. ৫০১

হয়, তাদের ধৈর্য বেশি। সেই কেয়ারিং এর জায়গা থেকে এটা খুব যুক্তিযুক্ত যে, ইসলাম রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়ের বিরোধি না হলেও নারীকে মা ও স্ত্রীর ভূমিকায় প্রাধান্য দেওয়া উচিত। নারী মা ও স্ত্রীর ভূমিকায় বেশি মানানসই। ফলে শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ পুরুষকে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থার ইসলামের এই বিধান খুবই যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। আর এটাও বিবেচনায় নেওয়া দরকার যে, পুরুষরা নারীদের জন্য খরচ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের ওপর খরচ করে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির বিধান। আর দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত এর ওপর চলার মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা ও শৃঙ্খলা[২৪৩]।

পৃথিবীতে সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম আছে; যেমন যাযাবর জাতি, কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী, পর্বতবাসী, বনবাসী, দ্বীপবাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান। আমাদের দেশের গারো সম্প্রদায় এবং আরো দু'একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবতার কারণে এবং বিশ্বায়নের চাপের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপ নিচ্ছে। আদিম সমাজেও বেশিরভাগ সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। সময়ের ব্যবধানে আদিম সমাজের সেসব মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার বেশির ভাগ ভেঙে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপ নেয়। অন্যদিকে, আদিম যুগে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে বিধি নিষেধ ছিল না। এই কারণে সন্তানের পিতৃ পরিচয়ও ছিল না[২৪৪]। নারীর পরিচয়ে বা মায়ের পরিচয়ে সন্তান বড় হতো। ফলে সেই সময়ের অবাধ মেলা-মেশাও মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছিলো।

ইসলামে নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ভিন্নমত পোষণ

ভিন্নমত প্রকাশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, কায়িক শ্রম তখন তার মূল কাজ নয়; বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান, রাষ্ট্র ও শাসকের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ তখন তাকে করতে হয়। সেই অধিকার নারীরও রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরা নারীকে দেখতে পাই শাসকের চিন্তা ও প্রাথমিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করতে, শাসকের ভুল সংশোধন করে দিতে বা শাসককে জবাবদিহির আওতায় আনতে কিংবা স্বয়ং শাসকের সাথে দ্বিমতে যেতে।

---

[২৪৩]. মাহবুবা বেগম, *নারীর ভূষণ* (ঢাকা: আল-কুরআন গবেষণা সেন্টার, ১৯৯৯), পৃ. ৪৯

[২৪৪]. হেনরি লুই মর্গান, *আদিম সমাজ*, পৃ. ৬৫

হযরত উমর (রা.) এর সময়ে একজন সাধারণ নারী মোহরানাসংক্রান্ত বিষয়ে জনসম্মুখে খলিফার সাথে দ্বিমত পোষণ করে ও তাঁর ভুল সংশোধন করে অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। নারী অবলা, গৃহবন্দি ও নিশ্চুপ অবস্থানে যদি একটি সাধারণ শাসনামলেও থাকে, তবুও সে নিরবতা ভেঙে কোন মতামত প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেনা। কিন্তু দাপুটে শাসক উমরের সামনে ওই নারী নির্ভয়ে বলেছিলেন, খলিফা হিসেবে আপনি মোহরানার পরিমাণ কমাতে পারেন না। ওই নারী উমর (রা.) কে স্মরণ করায়ে দেন কুরআনের বাণী, 'আর তোমাদের স্ত্রীদের তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশি মনে[২৪৫]।' এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় দেনমোহর অনেক বেশিও হতে পারে। ওই নারীর বক্তব্যের পর হযরত উমর (রা.) তাঁর পূর্বের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেন[২৪৬]।

উমর (রা.) এর সময়ে নারীর এই যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন ও ভিন্নমত নারীর বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার এবং শাসককে জবাবদিহীর আওতায় আনার প্রমাণ নয় কি? ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীর রাজনৈতিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত ও চর্চা থাকায় একজন সাধারণ নারী উমরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে প্রকাশ্যে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম সমাজে দীর্ঘকাল নারীকে অনেকটা গৃহবন্দি করে রাখার চর্চা থাকলেও সাহাবীগণের যুগে এমনটি ছিল না। শাসক উমরের সামনে নারী কী বিষয় উত্থাপন করলেন, সেটা একটা দিক। কিন্তু নারীর যদি প্রকাশ্যে কথা বলা, বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ভিন্নমত পোষণ করা ও রাজনৈতিক মত প্রকাশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ থাকতো তাহলে সঠিক কোন বিষয়েও ওই নারী জনসম্মুখে কথা বলতে চাইতেন না। আর চাইলেও হযরত উমর (রা.) এবং অন্য সাহাবীগণ সেই নারীকে তখন বারণ করে দিতেন।

অবলা ও নিশ্চুপ নারী নন; একজন সোচ্চার এবং প্রকাশ্যে মত ও ভিন্নমত পোষণকারী ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (রা.) এর কথা কুরআনে এসেছে। সিন্দুকে ভাসমান অবস্থায় শিশু নবী মুসা (আ.)-কে নীল নদ থেকে তিনি তুলে আনার ব্যবস্থা করেন। জ্যেতিষীর কথা অনুযায়ী ফেরাউনের সাম্রাজ্যে তখন ছেলে শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা হতো না। সিন্দুকে পাওয়া ভাসমান শিশু মুসার প্রতি ফেরাউনের একটু ভালবাসা জাগলেও তাঁর অমাত্যবর্গ ও আশেপাশের লোকজন শিশুটিতে হত্যা করে ফেলার পরামর্শ দিতে থাকে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, হযরত আসিয়া যদি হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে শিশু মুসা নবীকে মেরে ফেলা হতো।

---

[২৪৫]. কুরআন; ৪ : ৪

[২৪৬] জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *ইসলাম ও রাজনীতি*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আলীম অনূদিত (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬,) পৃ. ২৯৭

বিবি আসিয়া স্বামী ফেরাউনের কাছে শিশুটির ব্যাপারে তার সাধারণ হুকুম বলবৎ না করার জন্য উপর্যুপরি অনুরোধ করেন[২৪৭]। আসিয়ার কথা কুরআনে বলা হয়েছে এভাবে, 'তোমরা শিশুটিকে হত্যা করো না। হতে পারে বড় হয়ে সে আমাদের কোনো কল্যাণে আসবে কিংবা আমরা তাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করবো[২৪৮]।' নারীর যদি কথা বলার অধিকার না থাকতো, তাহলে হয়রত আসিয়ার এই কথা বলার বিষয়টি কুরআনে এসেছে কেন?

রাজনীতি করতে গেলে অনেক সময় অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হয়, কথা বলতে হয়, সোচ্চার হতে হয়, দাবী জানাতে হয় এবং আদায় করে নিতে হয়। আসিয়া (রা.) রাজনীতির সেই দাবীই পূরণ করেছেন, নিজের থেকে কথা বলে ও হস্তক্ষেপ করে ফেরাউন সাম্রাজ্যের একটি সাধারণ আদেশ কার্যকর করা রহিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাষ্ট্রের বা শাসকের কোন অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নারী কথা বলতে পারবে। ফেরাউন বিবি আসিয়ার স্বামী হলেও সে ছিল মিশরীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি। স্বামীর সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে এবং তাঁর মতামতের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে হযরত আসিয়া (রা.) প্রমাণ করেছেন, নারীরও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে।

ভিন্নমত পোষণ, দ্বিমত প্রকাশের পাশাপাশি রাজনীতিতে বাদানুবাদ আছে, বিতর্ক আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমনকি স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে কোন নারী যদি বাদানুবাদ বা তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে, তাহলে পরবর্তী সময়ে নারী তর্কে-বিতর্কে যেতে পারবে না কেন? খাওলাহ বিনতে ছা'লাবার স্বামী 'যিহার'[২৪৯] করেন এবং তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী এটা বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে পড়ে যায়। স্বামী মুখে বা বাস্তবে তালাক না দিলেও যিহারের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার বিষয়টি কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না খাওলাহ। এটা তাঁর চিন্তাপ্রসূত বিষয় ছিল যে, মুখে তালাক না দিলেও কেবলই যিহারের মাধ্যমে তালাক হওয়া যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

প্রচলিত একটি প্রথা ও বিধানকে এই নারী সাহাবী যুক্তিহীন বলে মনে করে বিষয়টি নিয়ে রাসূল (সা.) এর কাছে যান এবং এ নিয়ে বাদানুবাদে জড়ান। একটা পর্যায়ে হযরত খাওলা (রা.) এর মাধ্যমে জাহেলি যুগের এক গলত

---

২৪৭. শাইখ আব্দুল মুনঈম হাশেমী, *আল কুরআনে নারীর কাহিনী*, হাসান মুহাম্মাদ শরীফ অনূদিত (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২য় প্রকাশ: ২০১৪), পৃ. ৩৬

২৪৮. কুরআন; ২৮ : ৯

২৪৯. 'যিহার' হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে অথবা তার কোন অঙ্গকে 'মা' অথবা 'স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম' এমন কোন নারীর পৃষ্ঠদেশের সমতুল্য বলে আখ্যায়িত করা। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, মায়ের সাথে মেলা-মেশা যেমন ইসলামী শরী'য়াতে হারাম, ঠিক এমনিভাবে স্ত্রীর সাথেও মেলামেশাকে হারাম করা। জাহেলী যুগে যিহারের প্রচলন ছিল এবং সে যুগে যিহারকে তালাক বলে গণ্য করা হতো। এই 'যিহার' এর পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু ইসলামী বিধানে 'যিহার' দ্বারা তালাক হয় না, তবে কাফ্ফারা দিতে হয়। কাফ্ফারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ থাকে।

প্রথার অবসান ঘটে[২৫০]। কারণ তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে ও বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে কুরআনের সুরা মুজাদালাহ এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। সেখানেই নবীর সাথে ঐ নারী সাহাবীর বাদানুবাদের কথাও উল্লেখ আছে। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী, অবশ্যই আল্লাহ ওই নারীটির কথা শুনেছেন যে নারী বাদ প্রতিবাদ করছিল আপনার সাথে[২৫১]।'

হযরত আয়েশা (রা.) এর এক বর্ণনায় জানা যায়, খাওলাহ (রা.) উনার (আয়েশার) কক্ষেই বসে রাসূল (সা.) এর সাথে কথা বলছিলেন[২৫২]। কথা বলার একটা পর্যায়ে বাদানুবাদ শুরু হয়। এই বাদানুবাদকে রাসূল (সা.) নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি সুযোগ দিয়েছিলেন বলেই খাওলাহ (রা.) রাসূলের সাথে তর্কে জড়ান। খাওলাহ রাসূল (সা.) এর কথার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন বলেই তো তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। তখনো যিহার সংক্রান্ত বিধি-বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসায় রাসূল (সা.) এবং ঐ নারী সাহাবী আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন।

একজন নারীর বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। এতে ইসলামের ইতিহাসে খাওলার মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় চলে যায়। তিনি এমননিতেই বিশেষ মর্যাদার আসনে ছিলেন। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম আনসারী সাহাবী[২৫৩]। তার উপরে তাঁর কথার প্রেক্ষিতে ওহী নাযিল হওয়া তাঁর জন্য আরো বিশেষ মর্যাদা এনে দেয়। উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন নারী তাঁকে ডাক দিয়ে থামিয়ে দেন। উমর (র.) ঐ নারীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। পরে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বললেন, এই মহীয়সী নারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছেন। যদি তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা নয় সারারাত দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলতেন, তবে আমি তাঁর খেদমতে হাজির থাকতাম[২৫৪]।

খাওলাহ (রা.) বিতর্ক করেছিলেন পারিবারিক বিষয়ে, রাজনৈতিক বিষয়ে নয়। কিন্তু তার মানে এই যে, একজন নারী পারিবারিক বিষয়েই কেবল রাসূলের সাথে দেখা করতে পারবে এবং তর্কে লিপ্ত হতে পারবে, অন্য বিষয়ে নয়। খাওলাহর কাহিনী নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ভিন্নমত পোষণের এক অনন্য দলীল। অন্যদিকে, এই কাহিনীতে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, নারীর যদি অবলা থাকার বিধান থাকতো, তার যদি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ

---

[২৫০]. শাইখ আব্দুল মুনঈম হাশেমী, *আল কুরআনে নারীর কাহিনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
[২৫১]. কুরআন; ৫৮ : ১
[২৫২]. *তাফসীরে জালালাইন*, মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম অনূদিত, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১০), পৃ. ৪০৩
[২৫৩]. শাইখ আব্দুল মুনঈম হাশেমী, *আল কুরআনে নারীর কাহিনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
[২৫৪]. *তাফসীরে জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

রহিত থাকতো, দেশ-সমাজ ও পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলা ও চিন্তা করার বিষয়টি যদি তার জন্য সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত থাকতো; তাহলে খাওলা (রা.) যিহারের বিষয়টি নিয়ে এভাবে ভাবতেন না। সমাজের প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধে তিনি ভাবতেন না এবং কেবলই নিজেরই ভাবনা থেকে এই প্রথা বা নিয়ম অযৌক্তিক ও অসঙ্গত মনে করে রাসূল (সা.) এর সাথে বাদানুবাদ পর্যন্ত লিপ্ত হতেন না। একজন নারীও কোন বিষয়ে যে গভীরভাবে ভাবতে পারে, দেশ ও সমাজ নিয়ে গবেষণা করতে পারে, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

অন্যায়ের প্রতিবাদে নারীর অংশগ্রহণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিবাদ-প্রতিরোধও রাজনীতির একটি অংশ। সেই প্রতিবাদে, প্রতিরোধে নারীর অংশগ্রহণ আমরা দেখি, যার অসংখ্য বিবরণ কুরআন-হাদীসে রয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি নিশ্চুপ না থেকে কিভাবে মত প্রকাশ করে শিশু নবী মুসা (আ.) কে হত্যা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন মহিয়সী নারী হযরত আসিয়া (আ.)। তিনি শুধু মত প্রকাশই করেননি, ইতিহাসে এবং কুরআনে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কথাও বিধৃত হয়েছে। ফেরাউনের খোদাদ্রোহীতার কারণে ভীষণ রূষ্ট ছিলেন বিবি আসিয়া। তার স্বকল্পিত প্রভূত্বকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন তিনি। ফেরাউনের ভক্তদের ভাঁড়ামিপূর্ণ কার্যকলাপ দেখে দূর থেকে আফসোস করে বলতেন, সবগুলো একেকটা উন্মাদ[২৫৫]।

ফেরাউন ছিল প্রবল প্রতাপশালী শাসক ও কুখ্যাত সম্রাট। নিজেকে খোদা বলে দাবি করতো। কিন্তু আসিয়া (আ.) তাঁর স্বামী ফেরাউনের ভ্রান্ত দাবি, বিশ্বাস ও স্বৈরাচারী নীতিকে প্রত্যাখান করেন। এতে ফেরাউন তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। আসিয়ার ওপর নেমে আসে জুলুম-নির্যাতন। অত্যাচারের একটা পর্যায়ে ফেরাউনের নির্দেশে তাকে জিঞ্জিরে বেঁধে রাখা হয়, বিরাট পাথরের নিচে তাঁকে চাপা দেওয়া হয়। পাথরের আঘাতে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। এমনকি তার চোখও উপড়ে ফেলা হয়। কিন্তু এসব অমানবিক নির্যাতনেও আসিয়ার বিশ্বাসকে চুল পরিমাণ টলানো সম্ভব হয়নি। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদের কারণে তাঁর উপর যে চরম নির্যাতন চালানো হয়েছিল, সে বিবরণ কুরআনেও এসেছে। বলা হয়েছে, 'মুমিনদের সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রভূ, জান্নাতে আপনার সন্নিকটে আমার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিন। আর ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। এই জালিমদের কবল থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন[২৫৬]।'

---

[২৫৫]. শাইখ আব্দুল মুনঈম হাশেমী, *আল কুরআনে নারীর কাহিনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[২৫৬]. কুরআন; ৬৬ : ১১

এই আয়াতের মাধ্যমে ফেরাউনের স্ত্রীকে মুমিন নারীদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে[২৫৭]। বিবি আসিয়ার ঘটনার তাৎপর্য হচ্ছে, নারী কেবলই অনুগত ও অবলা নয়। অবলা নারী তার স্বামী ও প্রচলিত সমাজের অনুগত থাকে। এই বাইরে যেতে চায় না। স্বামী যদি অন্যায় করে এবং স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে না-ও নেয়; অবলা নারী সাধারণত চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে। কিন্তু হযরত আসিয়া খোদাদ্রোহী কাজে স্বামী ফেরাউনের অনুগত ছিলেন না; চুপও ছিলেন না। ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

প্রবল প্রতাপশালী একজন স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকা কি চাট্টিখানি কথা? বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এবং বিবেকের তাড়নায় নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার যে নারী রাখে এবং অন্যায়ের সর্বোচ্চ প্রতিবাদ করে, তার প্রমাণ হযরত আসিয়া (রা.)। রাজনীতিতে জনগণের পক্ষে কথা বলতে হয়, জনস্বার্থ ইস্যুতে সোচ্চার হতে হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হয়, রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে জনকল্যাণ সাধনের জন্য কাজ করতে হয়। আসিয়ার জীবনকাহিনী এখানে একটি উদাহরণ। রাজনীতির ময়দানে প্রতিবাদী কণ্ঠে কথা বলতে গেলে জেল-জুলুম আসতে পারে; সেটা নারীর ক্ষেত্রেও হতে পারে।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মুমিন জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে রাজনীতি করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু মুমিন নর ও নারীকে অন্যায়ের বিরোধিতা করতে হবে; এটা হচ্ছে মূলকথা। অন্যায় কাজে নিষেধ এবং প্রতিবাদ বিভিন্ন প্রকারে হতে পারে। সব অন্যায়ের প্রতিবাদের সাথে রাজনীতি সংশ্লিষ্ঠতা জরুরী নয়। সাধারণত রাজনৈতিক বিষয়ে অন্যায় এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে আগত অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন পড়ে। অনেক সময় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজনৈতিক ব্যনারেরও প্রয়োজন পড়ে না।

নারী ও পুরুষ যে কেউই ইচ্ছে করলে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরও রয়েছে মানুষকে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার অধিকার। কুরআনে বলা হয়েছে, 'মুমিন নারী এবং মুমিন পুরুষ একে অপরের বন্ধু। তারা একে অপরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে[২৫৮]।' এখানে আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নারীর কাজই যদি হতো

---

[২৫৭]. *তাফসীরে জালালাইন (৬ষ্ঠ খণ্ড)*, মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম অনূদিত ও মাওলানা আহমদ মায়মুন সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০১০), পৃ. ৬২৮

[২৫৮]. কুরআন; ৯ : ৭১

কেবলই গৃহ ও সংসার, তাহলে তাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন পড়ে না। এই আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালনে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টিও চলে আসে।

খেলাফতের দায়িত্ব ও নারীর রাজনীতি

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে- 'যখন তোমার প্রভু বললেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আমি আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করব[২৫৯]।' এই খলিফা শব্দটির মধ্যে অন্য অনেক অধিকারের সাথে নারীর রাজনৈতিক অধিকারও রয়েছে। কারণ, এখানে আল্লাহ পুরুষকে আলাদা করে খলিফা বলেননি। এখানে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝিয়েছেন। খেলাফত একটি বিস্তৃত বিষয়। এই বিস্তৃত বিষয়ের মধ্যে রাজনীতিও খেলাফতের একটি অংশ। কেউ যদি খেলাফতের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সেখানে লিঙ্গ বৈষম্যের কথা নয় কুরআনের এই আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী। কারণ আল্লাহ পুরুষ ও নারী উভয়কেই খলিফা বা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাহলে রাজনীতি কেন কেবল পুরুষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে? নারী নেতৃত্ব হারাম বলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কেন বারিত হবে?

ইসলামের দৃষ্টিতে সংসদে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

সংসদ হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, আইন-কানুন এবং আরো বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে এখানে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। নারী কি সংসদ সদস্য হতে পারবে? অন্যকথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী কি অংশগ্রহণ করতে পারবে? ইসলাম কী বলে? আমরা কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য উদাহরণ পাই, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে নারীও সম্পৃক্ত ছিল এবং বহু ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নারীর মতামত, পরামর্শ ও পর্যালোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু রাজনৈতিক বিষয়েও নারী মূল্যবান মতামত পেশ করেছে এবং সেই আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পুর্বে যুবক মুসা (আ.) মিশর থেকে মাদায়েনে[২৬০] চলে যান বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে। সেথায় নবী শোয়াইব (আ.) বা সে সময়ের শোয়াইব নামে একজন বর্ষিয়ান লোকের ঘরে কর্মচারী হিসেবে আশ্রয় নেন।

---

[২৫৯]. কুরআন; ২ : ৩০

[২৬০]. মাদায়েন একটি বিস্তৃত উপত্যকা, হযরত শোয়াইব (আ.) ও হযরত সালেহ (আ.) এর স্মৃতিবিজড়িত একটি প্রাচীন জনপদ। কুরআনের পাশাপাশি তাওরাতেও মাদায়েনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী সিরিয়া ও হিজাজের

দীর্ঘ কয়েক বছর সেখানে থাকেন শুয়াইবের একজন মেয়ের পিতাকে প্রদত্ত প্রস্তাব, মতামত ও পরামর্শের আলোকে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'মেয়ে দুই জনের একজন তার পিতাকে বললো, পিতা হে, একে (যুবক মুসা) চাকুরীতে নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই কর্মচারী হিসেবে সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্থ হবে[২৬১]।' সেই দুই জনের একজন পরবর্তীতে নবী মুসার স্ত্রী হয়েছিলেন। ওই দুই মেয়ের একজনের কথায় তাদের বৃদ্ধ পিতা সেদিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে তিন ব্যক্তির বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতার কথা এসেছে। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ইউসূফ (আ.) এর সাথে অপরজন হচ্ছেন সেই নারী যে মুসা (আ.)-কে কাজে নিয়োগ করার তার পিতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেছিল[২৬২]। ওই নারীর কথায় যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন তার পিতা এবং সেই বিবরণ যদি কুরআনে বর্ণিত হয়, তাহলে এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়ও একজন নারী অংশ নিতে পারে, এই আয়াত তার একটি দলীল।

নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজে তাঁর নবুওতি জীবনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নারীর কথায়। ওহী নাযিলের পর রাসূল (সা.) প্রথম বিবি খাদিজার কাছে আসেন। রাসূল (সা.) তখন বুঝতে পারছিলেন না যে, এখন তাঁর কী করা উচিত। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-কে হেরা পাহাড়ে ঘটে যাওয়া ওহি ও জিবরাইল-সংক্রান্ত সব কথা বলেন ও ভয়ার্ত চিত্তে বললেন, 'আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা করছি। খাদিজা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! তা কখনও হতে পারে না, তিনি আপনাকে অপদস্থ করবেন না। ১. আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সংরক্ষণ করেন, ২. আপনি দুস্থ মানুষের বোঝা হালকা করেন, ৩. নিঃস্বদের আহার করান, ৪. অতিথিদের সেবা করেন, ৫. সত্যের পথে নির্যাতিতদের সাহায্য করেন[২৬৩]।'

হযরত খাদিজা (রা.) নবীকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন যে কথাগুলো দিয়ে, সেই কথাগুলো উল্লেখযোগ্য ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই কথাগুলোর মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন, চরিত্র ও জনবান্ধব কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ নিয়ে খাদিজার মন্তব্য ও সুচিন্তিত পর্যবেক্ষণ আছে। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (সা.) সান্ত্বনার বাণী শুনানোর পর বিবি

সীমান্তবর্তী এই জনপদ সৌদী আরবের আল বাদি এলাকায় অবস্থিত। সেখানে রয়েছে পৃথিবীর অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন। এগুলোকে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের আওতায় এনেছে সৌদী আরব সরকার।

[২৬১]. কুরআন; ২৮ : ২৬

[২৬২]. *তাফসীর ইব্‌নে কাসীর (পঞ্চদশ খন্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩

[২৬৩] বুখারী, হাদীস নং-৩ (পরিচ্ছেদ : ১, ওহীর সূচনা)

খাদিজা তাঁর চাচাতো ভাই ধর্মীয় শাস্ত্রের পন্ডিত ওরাকা বিন নওফেলের কাছে যান। রাসূল (সা.) যে ঘটনা দেখেছেন ও শুনেছেন, খাদিজা তা আদ্যোপান্ত ওরাকাকে জানান[২৬৪]।

অন্যদিকে, খাদিজা (রা.) নিজস্ব কৌশলের আশ্রয় নিলেন যে, তাঁর স্বামীর কাছে হেরা গুহায় যিনি এসেছিলেন তিনি ফেরেশতা জিবরাঈল কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আবার সেই ফেরেশতা তথা জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলে রাসূল (সা.) তখন খাদিজাকে জানান। এই সময় হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজের উরুতে বসান এবং একটা পর্যায়ে নিজের কাঁধের উপর থেকে অবগুণ্ঠন খুলে রাখেন। কৌশল ছিল এই, উনি ফেরেশতা না শয়তান, তা নিশ্চিত হওয়া। যাহোক, খাদিজার অবগুণ্ঠন খোলা অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) আর জিবরাঈলকে দেখতে পাননি। তখন খাদিজা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, 'আপনি অবিচল ও উৎফুল্ল থাকুন। এ আগন্তুক নিশ্চয়ই ফেরেশতা, শয়তান নয়[২৬৫]।'

আমাদের সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে তাদের বাইরের কার্য্যক্রমের কোনকিছুই কোন নারীর সাথে কিংবা নিজ গৃহে এসে আপন স্ত্রীর সাথে বিনিময় করতে চান না। তাদের ধারণা, স্ত্রীর কাছে কিংবা নারীর সাথে সব বিষয় আবার বিনিময় করতে হয় নাকি। নারী আর কতটুকুই বা বুঝে। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁর নবুওতি জীবনের প্রথম কাহিনী তথা তাঁর কাছে জিবরাঈলের ওহী নিয়ে আসার বিষয়টি স্ত্রী খাদিজার সাথে বিনিময় করেন এবং তিনি যে নবী হয়েছেন সেই নিশ্চয়তাও খাদিজার কাছ থেকে পান। হযরত খাদিজার সেই মেধা ও বিচক্ষণতা থাকায় তিনি সেই কাজগুলো করেন। এভাবে পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যাপারে নারীদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ উপকৃত হয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠনে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বাস্তবে কাজে লাগানো হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইতিহাসের আরেক টার্নিং পয়েন্টে তাঁর আরেক স্ত্রীর পরামর্শ নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করে নারীর মতামত গ্রহণে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পর পর এক সংকটে পড়েন; এবং সেই সংকট সমাধান হয়েছিল স্বীয় স্ত্রী উম্মে সালমা (রা.)-এর পরামর্শ ও বিচক্ষণতায়। সন্ধি স্বাক্ষর করার পর

---

[২৬৪] ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নবী (সা.) প্রথম খণ্ড*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ২১৯

[২৬৫] ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নবী (সা.) প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণের প্রতিবাদের মুখে পড়েন। তারা একে অন্যায্য চুক্তি বলে বিরোধিতা করছিলেন এবং রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে অস্বীকার করছিলেন। রাসূল (সা.) সাহাবীগণকে কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করে এহরাম খুলে ফেলতে বললেন, তখন তিন বার ঘোষণা করার পরও তারা কেউ উঠেন না[২৬৬]। যার ইশারায় সাহাবীগণ জীবন দিতে প্রস্তুত এবং দিয়েছেনও, সেই হযরতের তিনবার ঘোষণা সত্ত্বেও কেউ উঠছিলেন না; এ ছিল এক অস্বাভাবিক ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না।

রাসূল (সা.) তাঁবুতে ফিরে গেলেন উম্মে সালমা (রা.) এর কাছে। রাসূল (সা.) তাঁর কাছে কথাগুলো ব্যক্ত করলেন[২৬৭]। তখন কী করণীয়; পরামর্শ চাইলেন। রাসূল (সা.) উম্মে সালমার পরামর্শক্রমে কুরবানীর পশু জবাই করলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন। সাহাবীগণ যখন দেখলেন রাসূল (সা.) কুরবানী দিয়েছেন ও মাথা মুন্ডন করেছেন, তখন উপস্থিত সব সাহাবী একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন করতে লাগলেন[২৬৮]। ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রী তথা একজন নারীর পরামর্শ নিয়ে একটি সমস্যার সমাধান করেন।

মজলিসে শুরায় নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে এই ঘটনা একটি উদাহরণ। উম্মে সালমার দেওয়া এই অভিমত রাজনৈতিক কৌশলগত একটি পরামর্শ ছিল। একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। উম্মে সালমার পরামর্শ গ্রহণ প্রমাণ করে, নারী গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার রাখে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারে। নারী যদি কৌশলগত বিষয়ে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা না রাখে, তাহলে নবী (সা.) উম্মে সালমার কাছ থেকে পরামর্শ চাইতেন না কিংবা সেই পরামর্শ গ্রহণ করতেন না।

উম্মে সালমা (রা.) এর পরামর্শ দেওয়া ও সে অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা (রা.) রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হিসেবে সফরসঙ্গি ছিলেন। উম্মে সালমা (রা.) মতামত দিয়ে নবীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সেই কাহিনীর আলোকে বলা যায়, আজকের নারীও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারে। নারী সংসদ সদস্য হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ, অভিমত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[২৬৬] জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী, *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[২৬৭]. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

[২৬৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং-২৭৩২

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরো নারীর উদাহরণ আছে, যেখানে নারীর মতামত গৃহিত হয়েছে এবং শরয়ী সিদ্ধান্তও হয়েছে সেই মতামতের প্রেক্ষিতে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জানাযার নামাজ পড়া হয়, ইসলামের প্রথম দিকে সেভাবে পড়া হতো না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খ্রিস্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখতে পান। তিনি এই নিয়মে জানাযার নামাজ পড়ার পরামর্শ দিলে তা গৃহিত হয়[২৬৯]।

রাসূল (সা.) এর পরবর্তী যুগেও সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ কিংবা নারীকে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি দেখা গেছে। চার খলিফার সময় বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ নারীদেরও পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করা হতো। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের সময় হযরত আয়েশা (রা.) বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সাহাবীগণকে পরামর্শ দিতেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর হাদীস বর্ণনা করেন এবং ফতোয়া দেওয়া শুরু করেন[২৭০]। এই সময় হযরত আয়েশা (রা.) এর বয়স তুলনামূলক কম ছিল।

খলিফা উমর (রা.)-এর আমলে হযরত আয়েশা (রা.) দাপটের সঙ্গে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহে মতামত প্রদান করতেন। এই সময় তিনি মজলিসে শুরার সদস্যও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন, এ সংবাদ পাওয়ার পর পর হযরত আয়েশা (রা.) খলিফাকে পরামর্শ দেন খালিদকে সাধারণ সৈনিক হিসেবে রাখার জন্য; না হলে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। হযরত উমর (রা.) হযরত আয়েশার কথা অনুযায়ী কাজ করেন। মিশর অভিযানের সময় আমর ইবনুল আস যখন সুবিদা করতে পারছিলেন না, তখন হযরত আয়েশা (রা.) খলিফাকে তাড়াতাড়ি জুবায়েরের নেতৃত্বে নতুন সৈন্যবাহিনী মিশরে পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা সে অনুযায়ী কাজ করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে মিশর মুসলমানদের পদানত হয়[২৭১]। অবশ্য খলিফার নির্দেশে আমর ইবনুল আস মাত্র ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে মিশর অভিযানে যাত্রা করেন এবং অল্পকালের মধ্যে মিশরের অধিকাংশ স্থান দখল করেন। মিশর বিজয়ের পর আমর ইবনুল আস আফ্রিকার পশ্চিম দিকে উপজাতিদের সাথে যুদ্ধে করেন এবং এরপর বারকা পর্যন্ত আফ্রিকার সমগ্র উপকূলভাগ অধিকৃত হয়[২৭২]।

---

[২৬৯]. জাভেদ আহমদ, *ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধীনে সম্পাদিত পিএইচডি থিসিস, ২০১৮), পৃ. ৬২

[২৭০]. মোছা: জীবন নিছা, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স)- এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধিনের সম্পাদিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৭), পৃ. ২৬৮

[২৭১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮-২৬৯

[২৭২]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

হযরত উসমান (রা.) এর সময়েও আয়েশা (রা.) ইসলামী খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শক হিসেবে কাজ করে রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে অবদান রেখেছেন। উসমান (রা.) এর শাসনামলের প্রথম দিকে রাজ্যে হট্টগোল দেখা দিলে মুহাম্মদ বিন আবু বকরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খলিফার পদত্যাগের দাবী নিয়ে আয়েশা (রা.) এর কাছে আসেন। তিনি অবশ্য তাদের দাবী প্রত্যাখান করেন। এতে বুঝা যায়, আয়েশার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল; না হয় উনারা তাঁর কাছে আসতেন না। উসমান (রা.) এর খেলাফতের শেষদিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অভিযোগ উঠলে আয়েশা (রা.) এর পরামর্শে তাদেরকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়[২৭৩]।

উপদেষ্টা হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। শুধু তিনি নন, রাসূলের আরো স্ত্রীদের দেখা গেছে রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পরও ইসলামী খেলাফত তথা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে অবদান রাখতে। পশুর চামড়া ও হাড়ের ওপর লিখিত কুরআনের প্রথম পান্ডুলিপি হযরত উমর (রা.) এর কন্যা এবং রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। ইসলামী খেলাফতের অধীন বিভিন্ন প্রদেশে কুরআনের ছয়টি অপ্রামান্য সংকলন প্রচলিত ছিল। হাফসার (রা.)-এর কাছে কুরআনের প্রামাণ্য পান্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকায় খলিফা উসমানের (রা.)-এর সময় এই অপ্রামান্য সংস্করণগুলো ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে হাফসার (রা.)-এর যোগ্যতা ও নৈতিক অবস্থান কতটা নির্ভরযোগ্য ছিল, তা সহজে অনুমান করা যায়। তাঁর কর্ম, মেধা ও যোগ্যতা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই কাজে লেগেছিল।

আজো কোন নারী যদি সমাজ, দেশ, জাতি, সম্প্রদায় ও উম্মাহর কল্যাণে ভূমিকা রাখতে চায়; না পারার কী আছে? ইসলাম নারীকে রাজনীতি ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। নারীর রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার অধিকার। রয়েছে মজলিশে শুরার সদস্য হওয়ার অধিকার। রাজনৈতিক যে কোন কার্য্যক্রমে তার অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

রাজনীতিতে নারী-পুরুষের সমবেত অংশগ্রহণ কি বৈধ?

নারীর রাজনীতিতে আগমনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় যুক্তি হতে পারে, নারী-পুরুষ একসাথে কোনো কার্যক্রমে শরীক হবে কীভাবে? এটা তো ইসলামসম্মত নয়! আসলে এ ধরনের যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এক সাথে সকলের শরীক হওয়ার নিয়ম থাকলে রাজনীতিতে

[২৭৩]. মোছা: জীবন নিছা, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স)- এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

সমবেত অংশগ্রহণ করতে পারবে না কেন? রাসূল (সা.) যখন কোনো সমাবেশে নসিহত করতেন সেখানে নারীরাও হাজির থাকতেন। বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশ্নও করতেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুরুষ ও নারী মসজিদের একই কক্ষে নামাজও আদায় করতেন।

মদীনায় রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্মিত মসজিদটির নকশা বর্তমানে বিশ্বের কোথাও নেই। এমনকি স্বয়ং মদীনাতেও নেই[২৭৪]। মসজিদে নববীর গঠন কাঠামো ছিল নারীবান্ধব। সেই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল পুরুষ ও নারী উভয়ের এক সাথে নামাজ আদায়ের উপযোগী করে। পুরুষদের পেছনে দাঁড়িয়ে নারীরা নামাজ আদায় করতো। ইমামের ঠিক পেছনে তথা সামনের দিকে থাকতো প্রথম কাতার বা কাতারগুলো। আর নারীদের কাতার শুরু হতো পেছনের দিক থেকে। এক হাদীসে ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন যে, জামায়াতে নামাজ আদায়ের জন্য মানুষদেরকে আহ্বান করা হলে অন্যদের সাথে সেথায় তিনিও নামাজ আদায় করতে যান। তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম নারীদের সামনের কাতারে, যা ছিলো পুরুষদের সর্বশেষ কাতারের ঠিক পেছনে[২৭৫]।'

একই কক্ষে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি নারীরা তখন মসজিদের একই কক্ষে বসে ইমামের খুতবা শুনতেন এবং বয়ানে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.) এর সময়ে মজলিশে অংশগ্রহণকারী অনেক নারী সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ সরাসরি রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে কুরআনের আয়াত শুনেছেন এবং মুখস্তও করেছেন। উম্মে হাশিম বিনতে হারিস ইবনে নোমান (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি কেবল রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে শুনে শুনেই সূরা কাহাফ মুখস্থ করে ফেলেছি। প্রত্যেক জুম্মার খুতবায় রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন[২৭৬]।' আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন আমি এসে মসজিদে ঢুকলাম। দেখতে পেলাম, রাসূল (সা.) নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম করলেন[২৭৭]।'

---

[২৭৪]. জাসের আওদা, *মসজিদে নববীর গঠনকাঠামো যেমন ছিলো? (রিক্লেইমিং দ্য মস্ক বই থেকে)*, জোবায়ের আল মাহমুদ অনূদিত (https://jobayerbd.wordpress.com/2020/05/29/)

[২৭৫]. সহীহ মুসলিম, ফিতনা অধ্যায়, ৮/২০৫

[২৭৬]. সহীহ মুসলিম, জুমার নামাজ অধ্যায়, ৩/১৩

[২৭৭]. সহীহ মুসলিম, সূর্যগ্রহণ অধ্যায়, ৩/৩২

রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণও মসজিদে যেতেন এবং রাসূল (সা.) এর বয়ানেও অংশগ্রহণ করতেন। উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '..একদিন একটি মেয়ে আমার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় রাসূল (সা.) এর আহ্বান শুনলাম, 'হে লোক সকল!' এই আহ্বান শুনে মেয়েটিকে বললাম, 'আমাকে যেতে দাও, রাসূল (সা.) কী বলেন শুনে আসি।' সে আমাকে বললো, 'রাসূল (সা.) তো পুরুষদের ডেকেছেন, নারীদের ডাকেননি।' আমি বললাম, 'তিনি মানুষদেরকে ডেকেছেন, আর আমিও তো তাদেরই একজন।' তারপর আমি গেলাম..[২৭৮]!'

মসজিদে এক সাথে নারী ও পুরুষের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাসূল (সা.) এর ওফাতের পরও অনেকদিন প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশেও অল্পকিছু মসজিদ আছে যেখানে নারীদেরও নামাজের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু একই কক্ষে পুরুষ ও নারী এক সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করবে, এটা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার অনেকের কাছে। অনেকে মসজিদের মূল কক্ষে নারীর প্রবেশকেও অন্যায় ও অবৈধ মনে করে।

একটি ছোট ঘটনা এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায়। কয়েক বছর আগে একবার সিলেট নগরীর বন্দরবাজারস্থ কুদ্রত উল্লাহ জামে মসজিদে এক লোক নামাজ পড়তে ঢুকলেন। সফরসঙ্গী উনার স্ত্রীকে বাইরে না রেখে মসজিদের এক কোণায় বসায়ে রাখলেন। জামায়াতের সময় ছিল না বলে তখন মসজিদের ভেতরের বড় কক্ষটি অনেকটা ফাঁকা ছিল। মসজিদের ভেতর নারী কেন; কিছু লোক এসে এ নিয়ে হট্টগোল শুরু করলো। হুজরা থেকে ইমাম বেরিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং ক্ষুব্ধ লোকজনকে বুঝান যে, মসজিদের ভেতর নারীর প্রবেশে অসুবিধা নেই।

মসজিদের ভেতর নারী প্রবেশ নিয়ে বর্তমান সময়ে এই হচ্ছে আমাদের মানসিকতা। মসজিদে নববীতে বা রাসূলের যুগের মসজিদগুলোতে নারী-পুরুষের উভয়ের উপস্থিতি সত্ত্বেও মসজিদের মাঝখানে কোনো ধরনের দেয়াল বা পৃথকিকরণের ব্যবস্থা ছিল না। মসজিদে নববীর ভেতর পর্দা টেনে নারী-পুরুষর নামাজের স্থান পৃথক করা হয়নি[২৭৯]। আমাদের দেশে নারীর জন্য নামাজের ব্যবস্থাসহ মসজিদের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়ছে। নারীর জন্য যেসব মসজিদে নামাজের ব্যবস্থা থাকে, সেটা সম্পূর্ণ পৃথক করে করা হয়। মসজিদ ছাড়াও অনেক জায়গায়, এই যেমন-- পার্ক, অফিস ইত্যাদি জায়গায় অনেক সময় পুরুষের নামাজের জন্য ব্যবস্থা থাকে। এসব জায়গায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীর জন্য আলাদা নামাজের কোন ব্যবস্থা বা কক্ষ থাকে না। যাহোক, মসজিদ বা অন্য কোথাও হোক,

---

[২৭৮]. সহীহ মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়, ৪/১৭৯৫

[২৭৯]. জাসের আওদা, *মসজিদে নববীর গঠনকাঠামো যেমন ছিলো?*, প্রাগুক্ত

একই কক্ষে নারী-পুরুষের নামাজের ব্যবস্থা থাকেনা। নারী ও পুরুষের নামাজের স্থানের ব্যবধান ও আলাদা প্রবেশ পথে বিষয়টিও কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয়।

'নারীদেরকে পৃথক স্থানে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়ে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা অমুসলিম ও নতুন প্রজন্মের মুসলিম তরুণদেরকে পরিষ্কারভাবে এই ধারণাটি দেয় যে, ইসলাম নারীকে বিচ্ছিন্ন এবং একঘরে করে রাখে। এ কারণে মসজিদে কিছুটা আসা-যাওয়া থাকলেও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকে[২৮০]।' এসব দিক হয়তো বিবেচনায় নিয়ে পশ্চিমা দেশে কিছু কিছু মসজিদে একই কক্ষে সরাসরী পুরুষের পেছনে নারীর দাঁড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়।

যেসব হাদীসে রাসূল (সা.) এর যুগে মসজিদে নামাজের কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো বিশুদ্ধ হাদীস। রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় পাঁচ ওয়াক্ত, জুম্মা এবং দুই ঈদের জামাআতে নারীরা অংশগ্রহণ করতেন। ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণের জন্য গুরুত্ব সহকারে নির্দেশও ছিল। এমনকি ঈদের নামাজে অংশগ্রহণের যাদের অনুমতি নেই অর্থাৎ ঋতুবর্তী মহিলা, তাদের প্রতিও ঈদের মাঠে হাজির হওয়ার নির্দেশ ছিলো। তবে পুরুষের জন্য মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করা ফরজ হলেও নারীদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজ আদায় ফরজ নয়। রাসূল (সা.) এর যুগে নারীদের মসজিদ গমনের যে অনুমতি ছিলো, পরবর্তীতে ফিতনার আশংকায় সেটা বন্ধ করা হয়।

একজন নারী যখন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে তখন তাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে মিশতে হয়, সরাসরি কথা বলতে হয়। ইসলামে কি নারী-পুরুষের কথা বলা নিষেধ? প্রয়োজনে কি মেশা নিষেধ? কট্টর ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন সমাজে এমনটি মনে করা হলেও কুরআন-হাদীসে এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে যেখানে নারী ও পুরুষ সরাসরি একে অপরের সাথে কথা বলেছেন।

মুসা (আ.) এর সাথে দুই যুবতী নারীর কথোপকথনের বিষয়টি কুরআনে এসেছে। ওই নারীদ্বয় তাদের মেষগুলোকে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে এসেছিলো। সেথায় মুসা (আ.) এর সাথে তাদের কথা হয়। বাড়ি থেকে ফেরত এসে তাদের একজন আবার মুসা (আ.) এর সাথে কথা বলেন এবং তাঁকে নিয়ে তাদের বাড়িতে যান। কুরআনের বাণী, 'আর যখন তিনি (মুসা নবী) মাদায়েনের কুয়ার কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন একদল লোক তাদের পশুদের

[২৮০]. জাসের আওদা, *মসজিদে নববীর গঠনকাঠামো যেমন ছিলো?*, প্রাগুক্ত

পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'টি মেয়ে তাদের পশুগুলো আগলে রাখছে। মূসা বললেন, তোমাদের সমস্যা কী? ওরা বললো, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না এই রাখালেরা তাদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না যায়; আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ একজন ব্যক্তি[২৮১]।'

মূসা (আ.) এর সহযোগিতায় তারা মেষগুলোকে পানি পান করালো। বাড়িতে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলে তাদের পিতা যুবককে ডেকে আনতে বললেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট আসলো এবং বললো, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর জন্য আপনাকে পারিশ্রমিক দেবার জন্য[২৮২]।' এই আয়াতদ্বয় পর্যালোচনা করলে কয়েকটি দিক ফুটে ওঠে:

১. দুই প্রাপ্তবয়স্কা নারী বহিঃস্থ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা আবার যেনতেন নারী নন। অনেকে বলেন, তারা নবী শোয়াইব (আ.) এর মেয়ে। নবী শোয়াইবের বিষয়টি প্রমাণিত না হলেও তাদের একজন যে পরবর্তীতে মূসা (আ.) এর স্ত্রী হয়েছিলেন, সেটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ফলে এই কাহিনী প্রমাণ করে, ইসলামে নারী প্রয়োজনে বহিঃস্থ কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। রাজনীতিও বহিঃস্থ কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

২. মূসা (আ.) মেয়ে দুইটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বেচ্ছায় তাদের সাথে কথা বলেছেন। মেয়ে দু'টি এ সময় নিজে থেকে কথা না বললেও যুবক মূসার কথার উত্তর দিয়েছেন। নারীর সাথে কথা বলার অনুমোদন না থাকলে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদ্বয়ের সাথে নবী মূসার কথোপকথন হতো না এবং উম্মতে মুহাম্মদের জন্য এখান থেকে কোন কিছু নেওয়ার বিষয় না থাকলে আল্লাহ এটা কুরআনে উল্লেখ করতেন না। রাজনীতিতে কথা বলতে হয়, সভা-সমাবেশ ও বক্তৃতায় অংশ নিতে হয়। মূসা নবী ও নারীদ্বয়ের কথোপকথন নারী ও পুরুষের কথা বলার একটি দলীল। রাসূলের জীবদ্দশায়ও নারী-পুরুষ প্রয়োজনে কথা বলেছেন।

৩. মূসা (আ.) প্রাপ্তবয়স্কা দুই নারীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন, তারা তার চাইতে একটু বেশি উত্তর দিয়েছেন; 'আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ একজন ব্যক্তি'- এই অতিরিক্ত কথাটি তারা এই কারণে বলেছেন যে, পরবর্তী প্রশ্ন করার আগে যাতে অগ্রীম উত্তর হয়ে যায় কিংবা নবী মূসার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রাপ্তবয়স্কা দুইজন নারী কেন আসলো, পুরুষ লোক কি নেই; তাই তারা এইটুকু অতিরিক্ত জবাব দেন। অন্যদিকে, এই অতিরিক্ত জবাবের মধ্যে তাদের বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতার পরিচয় ফুটে ওঠে। রাজনীতিতে বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২৮১]. কুরআন, ২৮:২৩

[২৮২]. কুরআন, ২৮:২৫

৪. পিতা অতিশয় বৃদ্ধ না হলে হয়তো তারা তাদের মেষগুলোকে পানি পান করানোর জন্য সেথায় যেতেন না। নারীর জন্য বাহিরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও প্রয়োজন না হলে তাদের বাহিরের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করাই ভাল। তাই বলে ইসলামে এটা নিষেধ নয়।

৫. প্রথমবার মূসা (আ.) এর দিক থেকে কথার সূত্রপাত হলেও নারীদ্বয়ের একজন বাড়ি থেকে যখন মূসা (আ.)-কে ডাকতে এলেন, তখন নারীর দিক থেকে কথার সূত্রপাত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, নারী নিজেও প্রয়োজনে নিজের দিক থেকে পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে।

৬. নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা না থাকলে নারী প্রয়োজনে একা বাইরেও বের হতে পারবে। ওই দুই নারীর একজন দ্বিতীয়বার একা বাইরে এসেছেন নবী মূসা (আ.)-কে ডেকে পাঠাতে। নারীর জন্য একা বাইরে বিশেষ করে বিদেশে বা দূর কোথাও সফরের ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারগণের মধ্যে ভিন্নমত আছে। ফলে কোন নারীকে শাস্তি হিসেবে নির্বাসনে বা দেশান্তরে একা পাঠানোর ব্যাপারেও মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ীসহ অনেকের মত, মুহরিম সঙ্গী ছাড়া নারী দেশান্তর হতে পারবে না। ইমাম তাহাবী নারীর জন্য একাকী দেশান্তরের সফরের ব্যাপারে কোন আপত্তি দেখেননি[২৮৩]।

৭. মূসা (আ.) প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটির সাথে তাদের বাড়িতে গিয়েছেন, অন্যকথায় মেয়েটি মূসা (আ.)-কে সাথে নিয়ে তাদের বাড়িতে তাদের পিতার কাছে গিয়েছেন। এটা নারী-পুরুষের কোন কাজে সমবেত অংশগ্রহণের একটি দলীল। কিছু নিয়ম-নীতি মেনে মূসা (আ.) ওই নারীর সাথে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ফলে রাজনীতি, সমাজ ও সংসারের প্রয়োজনে নারী যখন পুরুষের সাথে কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে কিংবা পুরুষ ও নারী যখন একসাথে কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে, তখন উভয়কেই শরীয়তের কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। এছাড়া আপত্তির আর কী আছে?

আমরা দেখেছি, নামাজসহ ইবাদত-বন্দেগীতে নারী-পুরুষের সমবেত অংশগ্রহণ। মূসা (আ.) এর এই কাহিনীতে কুরআনের বর্ণনায় আমরা দেখলাম, প্রয়োজনে নারী ও পুরুষ কথা বলেছেন এবং এক সাথে সফরও করেছেন। নারী-পুরুষের কথা বলার উদাহরণ কেবল নবী মূসা (আ.) এর সময় নয়, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়েও নারী-পুরুষ কথা বলতেন। এর স্বপক্ষে বহু হাদীস আছে। এমনকি প্রয়োজনে মসজিদের কক্ষেও যে পুরুষ লোকের সাথে নারী সাহাবী কথা বলেছেন, হাদীসের বর্ণনায় এমন তথ্যও পাওয়া যায়। আসমা (রা.) থেকে উরওয়াহ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন, 'আসমা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদের

[২৮৩]. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী (অষ্টম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

উদ্দেশ্যে কথা বলা শুরু করলেন। কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, সে বিষয়ে তিনি বলছিলেন। এমন সময় লোকদের হট্টগোলের কারণে আমি রাসূল (সা.) এর শেষের কথাগুলো শুনতে পারিনি। এরপর লোকেরা শান্ত হলে আমার সামনে বসা পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করলাম[২৮৪]।'

শরীয়তের বিধি-বিধানে নর-নারীর সমতা

কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'ওহে, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, শুনো- জুমআর দিনে যখন নামাজের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর স্মরণের পানে দৌড়াও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝো[২৮৫]।' এখানে আল্লাহ বলেননি, 'ওহে মুমিনগণ'; বলেছেন, 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো'। আল্লাহর এমন সম্বোধনের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই সম্পৃক্ত। আল্লাহ নারীকেও মসজিদ পানে ছুটে চলার কথা বলেছেন। নারী-পুরুষ উভয়কেই বেচাকেনা বন্ধ করার কথা বলেছেন। বেচাকেনা বা ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ যদি নারীর জন্য নিষিদ্ধ হতো, তাহলে আল্লাহ এখানে পুরুষকে আলাদা করে বুঝাতেন। এমনি করে ইসলামের মৌলিক বিভিন্ন ইবাদত পালনে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিধান সমান। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের ক্ষেত্রে হুকুম একই। পুরুষের উপর ফরজ, নারীর উপরও ফরজ। ইসলামের এসব ইবাদত পালন একান্তই পুরুষসুলভ কিংবা একান্তই নারীসুলভ নয়।

হজ্জ্ব ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। অন্য কিছু ফরজ ইবাদত পালনে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না পড়লেও হজ্জ্বের ক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই বাইরে যেতে হয়। হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে গিয়ে হজ্জ্ব পালন করতে হয়। নারী হওয়ার কারণে ইসলামের এই মৌলিক বিধান থেকে তাকে রুখসত দেওয়া হয়নি, বলা হয়নি যে হজ্জ্ব নারীর জন্য নেই, কিংবা ঐচ্ছিক। সামর্থ্যবান পুরুষের উপর যেমন হজ্জ্ব ফরজ, তেমনি সামর্থ্যবান নারীর উপরও হজ্জ্ব ফরজ। হজ্জ্বই একমাত্র ফরজ ইবাদত, যা পালনের জন্য হাজার মাইল দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়। হজ্জ্ব বিশ্বমুসলিমের এক বড় সম্মিলনও। এখানে নারী-পুরুষ সবাইকে একত্রে সমবেত হতে হয়। এমন একটি ইবাদাতে নারী-পুরুষের সমবেত অংশগ্রহণ যেখানে ফরজ সেখানে শুধুই নারী হওয়ার কারণে তার রাজনৈতিক অধিকার চর্চার সুযোগ থাকাটা প্রশ্নবিদ্ধ না। বাইরে বের হয়ে, দূর দেশে গিয়ে নারী হজ্জ্ব পালন করতে পারলে নারী রাজনীতিও করার অধিকার রাখে। ফরজ বিধান না হলেও মহৎ কাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ

[২৮৪]. সহীহ বুখারীর জানাজা অধ্যায়ে, ৩/৪৭৯, সুনানে নাসায়ীতে, ৭/২০০, নাসায়ীতেও বুখারীর সনদ অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে
[২৮৫]. কুরআন; ৬২ : ৯

বলেন, 'পুরুষ হোক আর নারী হোক, যেই নেক কাজ করবে যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না[২৮৬]।'

ইসলামে নারী-পুরুষের ইবাদত-বন্দেগীতেও কোন পার্থক্য নেই। পুরুষের জন্য যত ইবাদত ফরজ, নারীর জন্যও তত ইবাদত ফরজ। যেসব ক্ষেত্রে নারীদের নারীসুলভ বাঁধা রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে তাদের জন্যে ইসলাম বিশেষভাবে ছাড় দিয়েছে; কিন্তু ইবাদতের ফরজ বিধান রহিত হয়ে যায়নি। যেমন ঋতুকালে নারীকে নামাজ আদায় করতে হয় না এবং ঋতুবর্তী অবস্থায় রোজা না রেখে পরবর্তী কোনো সময়ে তা কাযা আদায় করতে হয়। ঋতুকালে হজ্জ্ব আদায় করা শুদ্ধ, তবে এসময় তাওয়াফ করতে হয় না।

ইবাদতের পাশাপাশি অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান একই রকম। চুরি করলে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য ইসলামে একই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য। পুরুষ হওয়ার কারণে শাস্তি বেশি, আর নারী হওয়ার কারণে কম; কিংবা নারী হওয়ার কারণে অপরাধের মাত্রা বেশি হয়ে যায় এবং পুরুষ হলে সেটা লঘু অপরাধ হয়ে যায়, ইসলামের বিধান এমন নয়। অনুরূপ কেউ অত্যাচারিত হলেও তার বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী। কোন পুরুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তার হত্যাকারীর জন্য যেমন বিধান, নারীও অনুরূপ ঘটনার শিকার হলে খুনীদের জন্য তেমনই বিধান। কিসাসের বিধান উভয়ের ক্ষেত্রেই। উমর (রা.) এর সময় এক নারীর হত্যাকাণ্ডে কয়েক জন পুরুষের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল[২৮৭]।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাজনীতি ও বহিঃস্থ কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনীতিতে মেধা প্রয়োজন। একজন নারী মেধাবী হলে সে তার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে রাজনীতিতেও রাখতে পারে অবদান। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো করছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোথাও কোথাও তারা ছেলেদের চাইতেও ভাল করছে। যে মেয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলের চাইতেও নিজেকে বেশি যোগ্য ও মেধাবী হিসেবে প্রমাণ করতে পারে, সেই মেয়ে সুযোগ পেলে রাজনীতিতেও ভাল করতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে অনেক নারীর উদাহরণ পাওয়া যায়, যারা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও সততা দিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাজে অবদান রেখেছেন এবং অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। অনেক নারী আবার ইসলামের

---

[২৮৬]. কুরআন ৪ : ১২৪

[২৮৭]. জাভেদ আহমদ, *ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

জন্য নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতের সময় কয়েক জন নারীও ছিলেন। তাদের মধ্যে উম্মে আফফানের স্ত্রী রাসূলের কন্যা রোকাইয়াও রয়েছেন[২৮৮]। দ্বিতীয় আকাবার শপথে আউস ও খাজরাজের তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দুই জন নারী ছিলেন[২৮৯]।

বিবি খাদিজা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রধান উপদেষ্টা এবং তাঁর নবুওয়তের সর্বপ্রথম সমর্থক। বিজ্ঞ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির খাদিজা ছিলেন হিজাজের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী। রাসূল (সা.) নিজেও খাদিজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। একদা তিনি খাদিজা (রা.) এর পণ্যসামগ্রী নিয়ে শামে যান যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন[২৯০]। কোনো কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মন খারাপ থাকলে তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিতেন এবং সকল কাজে পরামর্শ দিতেন। হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন ইসলামে এক বিশ্বস্ত ভরসা। রাসূল (সা) তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্টের কথা খাদিজা (রা.) এর কাছে বলতেন[২৯১]। রাসূলের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিয়ের পরও ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া নারীর বহিঃস্থ কর্মকান্ড ও অর্থনৈতিক কর্মকণ্ডে শরীক হওয়ার উদাহরণ। একজন নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে বাইরে বের হতে পারলে সে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করার অধিকার রাখে।

হযরত আয়েশা (রা.) এর ভূমিকা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উদাহরণ। ইসলামের ঐতিহ্যগত ইতিহাসেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অগ্রগন্য। কুরআন-হাদীসের জ্ঞান এবং ইসলামী শরীয়তের মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনি জ্ঞান অর্জনের পেছনে প্রচুর সময় দিতেন, একসময় পুরুষ সাহাবীগণেরও শিক্ষক ছিলেন। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আররী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দেন। হযরত আয়েশা (রা.) রাজনীতিতে সততার দাবি পূরণের জন্য এ যুদ্ধে যান। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুইজন প্রবীণ সাহাবী এটাকে সমর্থন করেন। এই দুইজন সাহাবী খিলাফতের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন এবং বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্তদেরও মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

[২৮৮]. ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা.)*, ১ম খণ্ড, শহীদ আখন্দ অনূদিত (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ২৭৬

[২৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

[২৯০]. ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ, *ইসলামে দারিদ্র বিমোচন কৌশল: একটি পর্যালোচনা (প্রবন্ধ)*, ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ১০৩

[২৯১]. ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা.)*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

কেউ কেউ বলেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর যুদ্ধে এই অংশগ্রহণ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দলীল নয়। কারণ, তিনি পররর্তী সময়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। আয়েশা (রা.) নবীর স্ত্রী ছিলেন এবং ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এর মেয়ে ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই কোনো অবৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আয়েশা (রা.) পরবর্তী সময়ে অনুতপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতে প্রমাণিত হয় না যে, তাঁর ঘরের বাইরে যাওয়া অবৈধ ছিল; বরং এ কারণে যে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিল না[২৯২]।'

আমরা অনেকেই হযরত ফাতিমা (রা.)-কে নিয়ে বলি, যাতাকলে যব পিষতে পিষতে হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়া একনিষ্ঠ এক সংসারী নারী। অথচ তিনি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন, উহুদ যুদ্ধে যখন পিতা মুহাম্মদ (সা.) এর দাঁত আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি যুদ্ধের ময়দানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা বলি, হযরত ফাতিমা (রা.) বাইরে বের হতেন না, সন্তান লালন-পালন ও স্বামীর একনিষ্ঠ সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। অথচ হযরত ফাতিমা (রা.) হিজরতের সময় শত্রুর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। প্রাথমিক সময়ে তিনি মুহাম্মদ (সা.) এর শত্রুদের সাথে বাকযুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। হযরতের কন্যা ফাতিমা (রা.) খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন[২৯৩]। আমরা অনেকেই অর্ধেক বলি, আর অর্ধেক সত্য এড়িয়ে চলি। নবীর পৌত্রী, হযরত ফাতিমার নাতনি, হোসাইনের কন্যা জয়নব (রা.) কারবালার হত্যাকাণ্ডের পরে উমাইয়াদের কবল থেকে তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য মনোভাব নরপিশাচ আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ ও নির্দয় ইয়াজিদকে সমভাবে হতবাক করেছিল[২৯৪]।

উহুদ যুদ্ধে মুসলিম নারীদের ভূমিকাও ছিল অনন্য[২৯৫]। উম্মে আম্মারা নুসাইবাহ বিনতে ক'াব (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ নারী। তিনি উহুদ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন এবং সেই যুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। লড়াই করতে করতে তিনি ইবনে কোম্মার সামনে গিয়ে পৌছেন। ইবনে কোম্মা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে তাঁর কাঁধে যখম হয়। তিনিও নিজের তলোয়ার দিয়ে ইবনে কোম্মাকে কয়েকবার আঘাত করেন। হযরত উম্মে আম্মারা লড়াই করতে করতে বারোটি আঘাত পান[২৯৬]। পরবর্তীতেও বিভিন্ন যুদ্ধে

---

[২৯২]. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী অনূদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

[২৯৩]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

[২৯৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

[২৯৫]. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

[২৯৬]. ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

অংশ নিয়েছিলেন নুসায়বাহ। তিনি ছিলেন একজন অবিসংবাদিক সমরবিদ। যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মতো বিপদসংকুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি নারী সাহাবীগণ অংশ নিয়েছেন, সেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারী আসতে পারবে না কেন?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করতে পারি আমরা উম্মে হীরাম বিনতে মিলহানের কাহিনী থেকে। রাসূল (সা.) একবার তাঁর একটি স্বপ্ন প্রকাশ করেন, 'আমার অনুসারীদের মধ্যে কিছু লোককে এই সমুদ্রের মাঝে জাহাজে করে যাত্রা করা যোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে।' এই স্বপ্ন শুনার পর উম্মে হীরাম বলেন, 'হে রাসূল, দোয়া করুন, আমি যেন এই দলেরই একজন হই।' রাসূল (সা.) উম্মে হীরাম কথায় ইতিবাচক সাড়া দেন। দেখা গেছে, ভবিষ্যদ্বানী ফলেছিল। হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি অভিযানের সামরিক দলের একজন হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলন উম্মে হীরাম। তিনি সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা.) তাঁকে তিরস্কার করেননি। তিনি তাঁকে বলেননি যে, নারী কেন ঘরের বাইরে যাবে, ঘরের মধ্যে নারীর জন্য জিহাদ রয়েছে। বরং তাঁর অনুরোধ ও ইচ্ছা প্রকাশের পর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী সাহাবীগণ প্রয়োজনে ক্ষেতে-খামারেও কাজ করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন[২৯৭]। মসজিদে নববীর পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছিল, যার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন একজন নারী, নাম রুফাইদা (রা.)। হযরত উমর (রা.) আল-শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ ও সামরা বিনতে নাযক আল আসদিয়্যাকে যথাক্রমে মদীনা ও মক্কার প্রধান বাজার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তারা বাজার মনিটর করতেন ও লেনদেনের বৈধতা তদারকি করতেন। প্রয়োজনে দোকানদার ও ক্রেতারাও তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যদি বাইরের কাজে নারীর অংশগ্রহণ বারিত হতো এবং জনগণের নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকতো তাহলে হযরত উমর (রা.) দুই নারীকে বাজার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ দিতেন না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটা নারী ক্ষমতায়নের একটি উদাহরণ।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতেও আমরা আরো অনেক মুসলিম নারীর অনন্য ভূমিকা দেখতে পাই। খলিফা হারুন-অর-রশীদের স্ত্রী জোবাইদা সে যুগের ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন[২৯৮]। হজ্জ্ব পালনকালে

---

[২৯৭]. মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, *নারীর কর্মের অধিকার ও ইসলাম (প্রবন্ধ)*, (ইসলামী আইন ও বিচার, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৪), পৃ. ৪৯

[২৯৮]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

মক্কায় হাজীদের পানির কষ্ট দেখতে পান। তখন তাঁর একক প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিগত খরচে পাহাড়ের জলপ্রপাত থেকে মক্কা শহর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ষোল কিলোমিটার লম্বা খাল খনন করা হয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে হাজী ও মুসাফিরদের জন্য পানির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, মক্কা থেকে তায়েফমুখী এই খাল খননকার্যে বিবি জোবায়দা আনুমানিক ৫৯৫০ কিলোগ্রাম স্বর্ণ খরচ করেছিলেন। ইতিহাসে এটি 'উয়ুন যুবায়দা' বা 'বিরকাতে যুবায়দা' হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং ১২০০ বছর পরও এখান থেকে সেচপ্রকল্প অব্যাহত আছে।

অষ্টম শতাব্দীর স্কলার ফাতেমা আল বাতায়াহিয়্যাহ দামেস্কে সহীহ বুখারীর দরস দিতেন। তৎকালীন সময়ে তিনি সবচেয়ে বড় মাপের স্কলারদের একজন ছিলেন। দ্বাদশ শতকে আরেকজন স্কলার ছিলেন জয়নব বিনতে কামাল। তিনিও হাদীসের কিতাব পড়াতেন। ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ আল সমরকন্দি ছিলেন একজন ফিকাহবিদ। কীভাবে ফতোয়া ইস্যু করতে হয়, সে বিষয়ে তিনি তাঁর অধিকতর বিখ্যাত স্বামীকে পরামর্শ দিতেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে শায়খা শুহদা, যিনি 'ফখরুন্নেসা' (নারীকুলের গৌরব) উপাধি পেয়েছিলেন, বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশাল জনসমাবেশে সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র ও কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত পন্ডিতদের সমপর্যায়ে আসীন হয়েছিলেন[২৯৯]।

মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অবরুদ্ধতা নেই। রয়েছে সুন্দর, শালীন, পবিত্র ও সংযত জীবন-যাপনের তাগিদ। ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতি মেনেই নারীর সর্বত্র বিচরণের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার চর্চার মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টিও রয়েছে। তবুও কেন ইসলামী দুনিয়া, মুসলিম সমাজে নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার চর্চার বিষয়টি সংকুচিত? কেন পর্দার নামে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে? 'নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব'- এমন কথা বলে কেন তাকে কেবলই পারিবারিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছে? 'নারী নেতৃত্ব হারাম'- বলে কেন তাকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা উপস্থাপন করছি:

১. ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়; অবশ্য এখনো সেথায় নারীর অধিকার পুরোপুরী প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পশ্চিমা দুনিয়া ও আজকের আধুনিক সভ্যতা যেখানে মাত্র গত

[২৯৯]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

দেড়শো বা দু'শো বছর যাবৎ নারীর অধিকার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে ও সাম্প্রতিক সময়ে সোচ্চার হয়েছে, সেখানে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দোশো বছর আগে পুরুষের মতোই ইসলাম নারীকে দিয়েছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার। সোজাকথায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই নারীর অধিকার সংরক্ষিত হয়। ইসলামের বিকাশকালে আরব সমাজে অনেক নারী সাহিত্য সমালোচক, বিচারক, শাসক, ব্যবসায়ী ও যোদ্ধা ছিলেন এবং অনেক নারী আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন[৩০০]।

২. সময়ের ব্যবধানে কুরআনের কিছু আয়াতের ভুলব্যাখা এবং নারী নেতৃত্ব হারাম- এমন একটি দুর্বল হাদীসকে সামনে এনে ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করা হয়। রাসূলের যুগ এবং তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী কয়েক বছর ইসলামের সঠিক চর্চা হলেও এরপরে মুসলিম সমাজের কোথাও ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না ও ইসলামের সঠিক চর্চা ছিল না। ফলে ইসলাম ও কুরআন-হাদীসের নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অপব্যাখা ও ভুলব্যাখার অবকাশ ছিলো এবং সেটা করে মুসলিম সমাজেও নারীকে দমিয়ে রাখা হয়েছে[৩০১]। খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামী জগতে যখন রাজতন্ত্র চালু হয় তখন শাসকদের মধ্যে ইসলামী ইলম ও চরিত্রের অবক্ষয় ঘটে, অনৈতিকতায় তারা ডুবে যায়[৩০২]। এভাবে ইসলামের মূল চেতনা থেকে মুসলিম শাসকেরা ও মুসলিম সমাজ অনেকটা সরে যাওয়ায় ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকারও মুসলিম সমাজে সংকুচিত হয়।

৩. সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও রয়েছে। আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন পিছিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ায় সমাজে নারীর অবস্থান আরো দুর্বল হয়। ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম কুরআনের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ফতোয়া প্রদান করে নারীর উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিক বিভিন্ন প্রথা, নিয়ম ও কুসংস্কার পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সর্বদা সহায়তা করেছে।

৪. রাসূল (সা.) এর সময় নারীর অবস্থান বেশ সম্মানজনক ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণা এবং ইসলাম সম্পর্কে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকার ফলে অন্যান্য

---

৩০০. নাসিম আখতার হোসাইন, *জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স: নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ (প্রবন্ধ)*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩), পৃ. ১২

৩০১. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩০২. অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১), পৃ. ১০

সমাজের মতো মুসলিম সমাজেও কিছুটা নারী-বিদ্বেষ এবং কঠোর মনোভাবের সৃষ্টি হয়। সেই বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন সময় নারীর বিরুদ্ধে 'নারী নেতৃত্ব হারাম' এমন ফতোয়া বা দুর্বল হাদীস অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫. ইসলাম নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে মুসলিম সমাজে ইসলামের প্রাথমিক যুগের পর যেমন লঙ্ঘিত হয়েছে, বর্তমান সময়ে অনেক জায়গায় এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলেও মুসলিম সমাজে ও রাষ্ট্রে আজো তা অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারীর ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলাম বিমুখ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো থেকে তৈরি হয়েছে। ইসলামী অনুশাসনের অনেক কিছুই বিভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনুসৃত হয়ে থাকে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ইসলামী অনুশাসন মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পরিবর্তিত রূপ লাভ করে এবং এর সাথে মিশে যায় দেশীয় সংস্কৃতি। এ অবস্থা ইসলামের প্রকৃত অবস্থান অনুধাবনে সমস্যার সৃষ্টি করে[৩০৩]। ফলে নারীর প্রকৃত মূল্যায়নও হচ্ছে না মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে। শাহ আবদুল হান্নান যথার্থই বলেছেন, এদেশের নারীরা যে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, নির্যাযিত হচ্ছে তা ধর্মের কারণে নয় বরং ধর্ম থেকে আমাদের বিচ্যুতির কারণে। আমাদের মধ্যে সৃষ্ট স্বার্থপরতা নীতিহীনতা ও ভোগ স্পৃহা এর জন্য দায়ী[৩০৪]।

৬. নারীদেরকে অবরোধ করে রাখার ফলে এবং রক্ষণশীল অবস্থান থেকে তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলে একটা সময়ে মুসলিম সমাজেও নারীকে আর আলাদা করে বঞ্চিত করে রাখার উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয়তা থাকেনি। কারণ, পশ্চাৎপদ হয়ে নারী তখন অনেক পিছনে চলে গিয়েছে। পশ্চাৎপদ বিভিন্ন মুসলিম সমাজে নারী পশ্চাৎপদতার কিছুটা সুযোগও নিয়েছে, যদিও প্রকৃত অর্থে সেটাকে সুযোগ বলে না।

প্রশ্ন জাগতে পারে, পশ্চাৎপদতার সুযোগ আবার কেমনে নেয়? একটা উদাহরণ দিই। অনেকে শিশু বয়সে সহজে স্কুলে বা মক্তবে যেতে যায় না। স্কুলে বা মক্তবে না গেলে যে সে পশ্চাৎপদ হবে, এ সমঝ তখন তার মধ্যে থাকে না, কিংবা কিছুটা সমঝ থাকলেও বাস্তবে সেই সমঝ খুব একটা কাজ করে না। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সোপান হিসেবে শৈশব-কৈশোরে স্কুলে না গিয়ে ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে একটু আরাম-আয়েশ করার প্রবণতা তাকে অনেক পিছিয়ে দেয়। এমনিভাবে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সময়

---

[৩০৩]. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

[৩০৪]. শাহ আবদুল হান্নান, *নারী ও বাস্তবতা* (ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২০০২), পৃ. ২৯

অবুঝ শিশুর মতো নারীও নিজেকে বঞ্চিত করে পিছিয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সে ভোগ করতে চায়নি; সে মনে করেছে বাইরের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার মধ্য দিয়ে সে একটু আয়েশী জীবন-যাপন করতে পারবে।

৭. পর্দা প্রথা মানে অবরোধ ও নারীকে অন্তঃপুরবাসীনি করা না হলেও পর্দা ও হিজাব ব্যবস্থা একটা পর্যায়ে বহু মুসলিম সমাজে কুসংস্কারের মতো কাজ করে। এটাকে অবরোধপ্রথার মতো একটা প্রথা হিসেবে নেওয়ার কারণে মুসলিম সমাজে নারী অনেক পিছিয়ে পড়ে। আমাদের এই বঙ্গদেশেও কঠিন পর্দাপ্রথার কারণে নারী অবরোধবাসিনী হয়েছে, গৃহবন্দি হয়েছে। ফলে সে শুধু রাজনৈতিক অধিকার নয়; শিক্ষাসহ অনেক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি এখানে উনিশ শতক ও বিশ শতকে যতগুলো কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল; তন্মধ্যে এবং সর্বাধিক অমানবিক ছিল নারীকে বন্দি করে রাখা। ফলে সে ছিল দুনিয়ার মুক্ত আলো-বাতাস থেকে অনেক দুরে, শিক্ষাদীক্ষা বঞ্চিত, রোগে-শোকে চিকিৎসাহীন[৩০৫]। পর্দার ভুল ও অপপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজে নারীর প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে।

৮. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এসবের বিরোধিতা করার মতো কেউ ছিল না। তখন নারীদের শুধু পুরুষদের সাথে যে পর্দা মেনে চলতে হতো তা নয়; নারীদেরও সাথে পর্দা রক্ষা করতে হতো। যে নারী যত বেশি পর্দা করে গৃহকোণে লুকাতে পারতো, সেই নারী তত বেশি ভদ্র ও অভিজাত হিসেবে গণ্য হতো। কারণ, নারীকে বন্দি রাখা বা নারীর বন্দি থাকা যেন অনেকটা আভিজাত্যের পরিচায়ক ছিল। সেই আভিজাত্যের অবস্থান থেকে নবাব আব্দুল লতিফ, নওয়াব সৈয়দ মাহমুদ এরূপ নেতৃস্থানীয় লোকজনও নারীদের ব্যাপারে খুবই কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। নবাব আব্দুল লতিফের জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর পরিবারের নারীগণ বাইরের কোন পুরুষ দুরে থাক, অন্য কোন নারীর সাথে পর্যন্ত দেখা করতে সক্ষম ছিলেন না[৩০৬]।

৯. আমাদের দেশে পর্দাপ্রথার নামে এই অবরোধ প্রথা কেবলই মুসলিম নারী সমাজে প্রচলিত ছিল না। এই কঠিন প্রথাটি সমভাবে হিন্দু সমাজেও প্রবল আকারে প্রচলিত ছিল। উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চনা এবং কঠোর পর্দাপ্রথাসহ হিন্দু সমাজে নারীর প্রতি চরম বৈরি আচরণের ফলে বাংলা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু নারী তার সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। একই সাথে এই কঠিন পর্দাপ্রথার কারণে ইসলামে নারীকে নানা অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও সে সময়কার বাংলা ও পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম নারীও অনেক বেশি নিগৃহিত ও বঞ্চিত ছিল; এমনকি স্বামীর সঙ্গও সহজে পেতোনা। ঊনিশ

---

৩০৫. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১২০

৩০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মফস্বল শহরগুলো ছিল প্রায় নারীবর্জিত[৩০৭]। কারণ, স্ত্রী ও সন্তানেরা গ্রামে থাকতেন। পরিবারের কোন সদস্য পারিবারিক বাসস্থান থেকে অনেক দূরে চাকুরী বা অন্য কাজে থাকলে, সেখান থেকে কেবল টাকা পাঠাতেন, মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গ পেতেন কিন্তু নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের পৈতৃক বাড়ি থেকে কর্মসংস্থানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেতেন না[৩০৮]। হিন্দু সমাজে নারীর উন্নতির জন্য কাজ করে যিনি অবিস্মরণীয়, সেই ইশ্বরচন্দ্রর বিদ্যাসাগরও এই নিয়ম রক্ষা করেছেন[৩০৯]।

১০. পৈতৃক সম্পত্তিতে ইসলাম নারীকে যথাযথ অধিকার দিলেও মুসলিম সমাজের স্বার্থপর পুরুষেরা সহজে নারীর সেই অধিকার বুঝিয়ে দিতে চায় না। নারী সেই অধিকার বুঝে পেতে চাইলেও তাকে নানা ভোগান্তি পোহাতে হয়। পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে পুরুষ যেমন নারীকে বঞ্চিত রাখতে চায়, তেমনি নারীকে তার রাজনৈতিক অধিকার এবং অন্য আরো অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। অর্থাৎ পুরুষ সহজে সুযোগ দিতে চায় না। ইসলামের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে অনেক মুসলিম সমাজে পুরুষতান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয় এবং পুরুষতন্ত্র শক্তিশালী হয়। সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে অধস্তন করে রাখার চেষ্টা করে পুরুষরা; ফলে সময়ের ব্যবধানে নারী অধস্তন ও অনেকটা অবলা হয়ে যায়। 'নারীদের আন্দোলন পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষরা কখনো নারীদের গুণ বৈশিষ্ঠ্য প্রকাশ ও তাদের নেতৃত্বের মেধা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়নি। সুযোগ পেলে পুরুষদের আধিপত্য ছাড়াই নারীরা তাদের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারতো[৩১০]। শুধু মুসলিম সমাজে নয়, সব সমাজেই পুরুষাধিপত্যের কারণে নারী দুর্বল, নিষ্ক্রিয় ও বন্ধনে আবদ্ধ হয়[৩১১]। এভাবে মুসলিম সমাজেও নারী বঞ্চিত হয়, পিছিয়ে পড়ে।

১১. ইসলামের দেয়া নারীর যেসব অধিকার রয়েছে তা থেকে যদি কোন নারী বঞ্চিত থাকে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট মুসলিম সমাজই দায়ী; ইসলাম নয়। ফলে অনেক সময় কোথাও কোথাও সামাজিক প্রথার পাশাপাশি আইন করে নারীর অধিকার ক্ষুন্ন করা হলেও অনেক মুসলিম সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় সামাজিক প্রথা ও প্রচলনের মাধ্যমে নারীর অধিকার লংঘন করা হলেও তখন রাষ্ট্রীয় আইনে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অনেক বিষয় স্বীকৃত ছিল। রাষ্ট্র ও সরকার ইসলামের বিধানের আলোকে নারীর স্বার্থ সম্পর্কিত কিছু আইন

---

[৩০৭]. ড. বিলকিস রহমান, *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩), পৃ. ১১

[৩০৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৩০৯]. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরে বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, নবম মুদ্রণ: ২০১৬), পৃ, ২২৯

[৩১০]. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩১১]. নাসিম আখতার হোসাইন, *জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স: নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

রাখলেও সমাজে সেই আইনের প্রতিফলন ছিল না। যেমন ইসলাম নারীকে মোহরানার যে অধিকার দিয়েছিল, সেটা মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় আইনে থাকলেও বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। এমনকি যে মোহরানা অদ্যাবধি এদেশে কেবল ধার্য হয়, আদায় হয় না, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী মামলার মাধ্যমে তা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন[৩১২]। এতে বুঝা যায়, উনিশ শতকে বাংলায় মুসলিম সমাজে নারী নিগৃহিত হলেও ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় আইনে তার বহু অধিকার স্বীকৃত ছিল।

১২. ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীর অবস্থান দৃঢ় থাকলেও বিভিন্ন কার্য্যক্রমে পুরুষদের চাইতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ছিল। আজকের অনেক মুসলিম ও ইসলামী সমাজে নারীর রাজনৈতিক কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ অনেকটা বারিত; কিন্তু তখন এমন ছিল না। তারপরও আমরা কেন নারীকে খলিফা বা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর কিংবা নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে খুব একটা দেখতে পাইনা। কারণ কী?

(ক) সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নারী নেতৃত্ব তখনো পুরোপুরী প্রস্তুত ছিল না। প্রাক ইসলামী যুগে যেখানে নারীর কোন অবস্থানই ছিলনা, সেখানে ইসলামী যুগে নারীকে সকল প্রকার মর্যাদা দেওয়া হলেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পুরোপুরী রূপায়ন দেখতে আরেকটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উনিশতম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯২০ সালে প্রথম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়[৩১৩]। আমেরিকায় ১০০ বছর আগে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও দেশটির স্বাধীনতার ২৪৫ বছরের ইতিহাসে আজো কোন নারী প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। ২০১৬ সালের নির্বাচনের হিলারী ক্লিনটন অনেকটা বিজয়ের কাছাকাছি এসেও পারেননি।

বাংলাদেশেও নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হয় গত শতকে। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দুই জন নারী সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়[৩১৪]। ১৯৯৭ সালে আইনের মাধ্যমে তিন জন নারীকে সংরক্ষিত আসনে নারী ও পুরুষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই বছর সারাদেশে ১২,৮২৮ জন নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন এবং ৩৮ হাজারেরও বেশি সাধারণ

---

৩১২. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৩১৩. শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩১৪. কে. এম, মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন (প্রবন্ধ)*, আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩), পৃ. ১৭৯

ওয়ার্ডের বিপরীতে নির্বাচনে মাত্র ১১০ জন নারী সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত হন[৩১৫]। ১৯৭৬ সালে নারীকে সুযোগ দেওয়ার পরও ২১ বছর পর ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য পদে ১% নারীও নির্বাচিত হতে পারেননি। আর ১৯৯৭ সালের পর এই প্রায় ২৪ বছরেও খুব একটা উন্নতি হয়নি।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি রাখার বিধান করা হয় নেতৃত্ব, রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং আস্তে আস্তে নারীকে রাজনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য। এই ব্যবস্থা চালু করার দীর্ঘ বছর পরও নির্বাচনে ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুব একটা বাড়েনি। একাদশ সংসদ নির্বাচনে মাত্র ১০ ভাগ নারীও সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেননি বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি।

ফলে দেখা যায়, কোন একটা ব্যবস্থা পরিচিতি পেলেও সেটা গতিশীল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও পুরোপুরী দেখার জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীর যেটুকু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহিঃস্থ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল, তা অল্প সময়েই অনেক বেশি ছিল। নেতৃত্বের শীর্ষপর্যায়ে আসার জন্য নারী তখন পর্যাপ্ত সময় পায়নি। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় নারী শিক্ষার কোনই সুযোগ নেই। যদি কোনদিন সেখানে নারীদের সুযোগ দেওয়া হয়, দেখা যাবে দাওরায়ে হাদীসসহ উচ্চ জামাতে নারীর সংখ্যা আশানুরুপ পর্যায়ে যেতে কয়েক দশক সময় লেগে যাবে; আর শিক্ষকসহ অন্যান্য পদে নারীকে দেখতে এরূপ কয়েক দশক সময় লাগবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। নারী বিকশিত হওয়ার জন্য আরো অনেকগুলো বছরের প্রয়োজন ছিল।

(খ) ইসলামের প্রথম যুগে এবং চার খলিফার সময়ে চার খলিফাসহ অন্য যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন তারা আগ থেকেই সেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের আগেও তিনি সেই সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগেই কুরায়শদের অন্যতম প্রধান শাসনকর্তা হিসেবে তিনি

৩১৫. কে. এম, মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, প্রাগুক্ত

বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন[৩১৬]। প্রাক-ইসলামী যুগে আবু বকর (রা.) এর মধ্যে নেতৃত্বের যে গুণাবলী, ওই সময় কোন নারীর মধ্যে এমন গুণাবলী দেখা যায়নি। আবু বকর (রা.) যখন খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হলেন, তখনো এমন কোন নারী ছিলেন না যিনি আবু বকরের মতো যোগ্য ছিলেন। ফলে একথা বলা যাবে না যে, যোগ্য নারী নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীকে শাসক বা নেতৃত্বের পদে বসতে দেওয়া হয়নি। যোগ্যতার ভিত্তিতেই পুরুষদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব এসেছে।

(গ) রাসূল (সা.) এর সময়ে নারীর প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ, শিক্ষার অবারিত সুযোগ দান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার সুযোগে আস্তে আস্তে নারীদের মধ্য থেকে যোগ্য লোক তৈরী হচ্ছিলেন। রাসূলের জীবদ্দশায় হযরত আয়েশা (রা.) এর বয়স কম ছিল। আবু বকরের সময়ও তিনি তুলনামূলক কম বয়সী ছিলেন। দেখা গেছে হযরত উমর ও হযরত উসমানের সময় তিনি পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। হযরত আলীর সময় এসে যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। এতে বুঝা যায়, ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক বছরের মধ্যে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নারী নেতৃত্বও তৈরী হয়ে যায়। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশার বাহিনী পরাজিত হয়। সেদিন যদি আয়েশা বিজয়ী হতেন, তাহলে হয়তো পরবর্তী সময়ে আয়েশার অনুসারীরা তাঁকে খেলাফতের পদে বসাতো বা জাতির নেতৃত্বের আসনে আসীন করতো; এমন কল্পনা অস্বাভাবিক নয়।

(ঘ) হযরত আলী (রা.) এর পর আর ওইভাবে খেলাফত ব্যবস্থা ছিল না। এর পরে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে ইসলামের মূল চেতনা থেকে সরে আসতে থাকে। তখন আর নারীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজে ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে সেটা বিলীন হয়ে যায়। যে কিছু সম্ভাবনাময় নারী নেতৃত্ব তৈরী হচ্ছিলেন, পরে সেই সম্ভাবনা উবে যাওয়ায় নারীদের মধ্য থেকে ওইভাবে আর ব্যাপকহারে নেতৃত্ব তৈরী হয়নি। তবে কিছু সংখ্যক নারী যে বিভিন্ন যুগে নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেননি, তা কিন্তু নয়।

১৩. নারী মাতৃত্বেই বেশি তৃপ্ত হয়। বাইরের কাজের চাইতে তাকে ভেতরের কাজ, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি কাজে তুলনামূলক বেশি সময় দিতে হয়। ফলে মুসলিম সমাজে যদি তার রাজনৈতিক অধিকার পূর্নমাত্রায় প্রতিষ্ঠিতও হতো, তারপরও পুরুষের চাইতে রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বাইরের কাজে নারীর অংশগ্রহণ

[৩১৬]. সৈয়দ আমীর আলী, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

আনুপাতিক হারে কম থাকতো। সব ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় উপস্থিতি হয়তো দেখা যেতো, কিন্তু শতকরা হারে সেই সংখ্যা কম হতো। অবশ্য, ভুল অনুধাবন, অপব্যাখার মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুন্ন না হলে সেটা যে পরিমাণ থাকতো, সেই পরিমাণ আজকের সময়ের চাইতে অনেক বেশি থাকতো এবং ফলশ্রুতিতে নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা নারীর আরো উপস্থিতি দেখতে পারতাম।

১৪. বর্তমান সময়ে অনেকে কট্টরপন্থা পরিহার করে নারীর ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের চেষ্টা করছেন। নারীও তার অধিকার আদায়ে সোচ্চার হচ্ছে এবং বহু পুরুষ তার সাথে কণ্ঠ মেলাচ্ছে। মাঝখানে বহু সময় মুসলিম সমাজে নারীকে অবনমিত করে রাখা হলেও এখন বিভিন্ন দেশে রাজনীতিতে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। মুসলিম বিশ্বে যেসব দেশ তুলনামূলক উন্নতি করছে, দেখা যাচ্ছে যে, সেথায় নারীর ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হচ্ছে এবং উন্নয়ন-অগ্রগতিতে নারীরাও অবদান রাখছে।

ইরানে রাজনীতিতে নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। দেশ হিসেবে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের চাইতে ইরান বেশ ভাল অবস্থানে আছে। তুরস্কেও নারীরা রাজনীতিতে ভালো করছে। ইউরোপের দেশটি মুসলিম বিশ্বে অনেক এগিয়ে রয়েছে। তিউনিশিয়ার ইসলামপন্থীরা এ বিষয়ে বেশ উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে কট্টরপন্থা বিরাজ করছে এবং এসব দেশ তুলনামূলকভাবে পিছিয়েও আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান

১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীদের পুরুষের সমান রাজনৈতিক অধিকার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে[৩১৭]। প্রায় চার দশক থেকে বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুই নারী। তারা আবার বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ শাসন করছেন। সংসদের স্পীকারও নারী, বিরোধি দলীয় নেত্রীও নারী। দুই প্রধান দল ও রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষ পদে নারীর অবস্থানে মনে হয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা অনেক এগিয়ে। আসলে কি তাই? অতীতের সাথে তুলনা করলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে- এটা সত্য; কিন্তু সত্যিকার অর্থে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয় এখনো।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন এর ধারণা ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়। নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। নারীর সবল ও সচেতন অস্তিত্বের বিকাশ ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য[৩১৮]। নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ, নারীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয় নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পৃক্ত। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, রাষ্ট্র এবং আরো বিভিন্ন ফোরামে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, স্বীকৃতভাবে মতামত ব্যক্ত করার, পরিকল্পনা করার ও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা দুর্বল, উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে। অথচ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রধান উৎস ও বিচরণক্ষেত্র[৩১৯]। বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো পুরোপুরী হয়নি। বিভিন্ন ফোরামে অতীতের চাইতে বর্তমানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও রাজনীতিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান এখনো সুসংহত নয়। কারণ বহুবিধ।

সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কাগজে-কলমে এখানে নারী-পুরুষ সকলের অধিকার সমান। কিন্তু দেশটির গণতান্ত্রিক চর্চাও যেমন প্রশ্নের উর্দ্ধে নয়, তেমনি নারী-পুরুষ সকলের সমান অধিকারের বিষয়টিও

---

৩১৭. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০০), পৃ. ৩৪২

৩১৮. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১২), পৃ. ২১

৩১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

সঠিকভাবে মূল্যায়িত নয়। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন অথবা ক্ষমতার বাইরে ছোটো-বড়ো সব রাজনৈতিক দল মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে ফেনা তুলে, দলে গণতন্ত্রের চর্চার কথা বলে, ক্ষমতাসীন হলে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার কথা বলে; কিন্তু প্রতিটি দলই গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়েছে[৩২০]। বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও সুষম গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ও তার অধিকারও ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদে আছেন[৩২১]। তিনি কয়েকবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং এখনো (২০২১) দেশের প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, খালেদা জিয়া ১৯৮৩ সালে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৪ সাল থেকে দলটির চেয়ারপার্সন পদে আছেন। ১৯৯১ সালে তিনি প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন। পরে আরো দুই বার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রক্ষমতায় এই দুই নেত্রীর এই অবস্থান নারীর রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণের কোন প্রতিফলন নয়। কারণ তারা নেতৃত্ব পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পরিবার পরিচালনায় যেমন বাবা, মা উভয়ের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ; তেমনি রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে দুই নারী দ্বারা শাসিত হলেও শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব পেয়েছেন। তারা প্রকৃত অর্থে নারীদের অধিকার ও নেতৃত্বের প্রতিনিধি নয়। সমাজের প্রত্যেক স্তরে পুরুষরা যখন একক সিদ্ধান্ত নেয় তখন পঞ্চাশ ভাগ নারীর প্রয়োজন ও দাবি সম্পর্কে তারা স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞাত থাকেন, এটা তাদের দোষ নয়। এটা পদ্ধতির দূর্বলতা[৩২২]।'

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া প্রকৃত অর্থে যে নারী নেতৃত্বের প্রতিনিধি নন, তার প্রমাণ পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ যেখানে এই দুই জন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকলেও এর বাইরে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্য সংখ্যা না থাকার মতো ছিলো। পঞ্চম সংসদের সদস্য হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ছিলেন সংসদ নেতা; আর তাঁর দল বিএনপি থেকে একমাত্র তিনিই ছিলেন সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত একমাত্র নারী সদস্য। অন্যদিকে শেখ হাসিনা ছিলেন বিরোধী দলীয় নেতা, আর এই সংসদে তাঁর দল আওয়ামী লীগ থেকে

---

[৩২০]. Moudud Ahmed, *Democracy and The Challenge of Development: A Study of Political and Military Intervention in Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited, 1995), p. 364

[৩২১]. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh: A Comparative Analysis* (M.Phil Thesis done under Political Science Dept of Dhaka University, 2019), p. 31

[৩২২]. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ ডিসেম্বর ২০২০

সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী সদস্য ছিলেন আরো মাত্র তিন জন; যার মধ্যে একজন যার স্বামী সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর ময়মনসিংহ-৩ আসন শূন্য ঘোষিত হলে সেখান থেকে উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসেন।

সপ্তম সংসদের সংসদ নেতা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; এর বাইরে তাঁর দল আওয়ামী লীগ থেকে আর দুই জন মাত্র সদস্য ছিলেন, মতিয়া চৌধুরী ও বেগম সালেহা মোশাররফ। শেখ হাসিনা যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব পেয়েছেন, তেমনি পঞ্চম সংসদের রওশন আরা নজরুল এরপর সপ্তম সংসদের সালেহা মোশাররফও উত্তরাধিকার সূত্রে এমপি হন। কারণ, ১৯৯৯ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর আসন তথা ফরিদপুর-৪ আসন থেকে উপনির্বাচনে সালেহা মোশাররফ এমপি হন। মোশাররফ হোসেন ঐ আসন থেকে চার বার এমপি হয়েছিলেন। অন্যদিকে, একই সংসদে বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী হলেও তাঁর দল থেকে আর মাত্র দুই নারী এমপি ছিলেন; তাদের একজন হচ্ছেন খালেদা জিয়ার আপন বড় বোন খুরশিদ জাহান হক আর আরেকজন মমতাজ বেগম। এই সংসদে জাতীয় পার্টি থেকে দুই জন নারী সাধারণ আসন থেকে এমপি হয়েছিলেন; এই দুই জন বেগম রওশন এরশাদ ও তাসমিমা হোসেন তাদের স্বামী যথাক্রমে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এবং সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মনজুর সুবাদে এমপি হয়েছিলেন। ফলে পঞ্চম সংসদের সাধারণ আসনে চার জন নারী সদস্য আর সপ্তম সংদের ছয় জন নারী সদস্য নারী নেৃতত্বের প্রতিনিধিত্ব করেননি, আর করলেও সংখ্যায় কয়জন?

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের প্রধান হওয়ার পর তখন থেকে এ পর্যন্ত দলটির নয়টি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিবারই তিনি সভানেত্রী থেকে যান। অন্য অনেক দলের চাইতে এই দলের কাউন্সিল তুলনামূলক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলেও এটা কেবলই লোক-দেখানো; ফলে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা নেই দলটিতে[৩২৩]। দলের কাউন্সিলে দলীয় প্রধান প্রতিবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ফলে শেখ হাসিনার বার বার দলীয় পদে আসীন হওয়া এবং ৪০ বছর থেকে একই পদে থাকা এটি দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রমাণ করে না; বরং এটা রাজনীতিতে উত্তরাধিকারসূত্র ও পরিবারতন্ত্রের প্রতিফলন।

একই অবস্থা বিএনপির ক্ষেত্রেও। এই দলটিতেও প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। দলটি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিএনপি এখন পর্যন্ত এই ৪৩ বছরে মাত্র সাতটি কাউন্সিল করেছে। বিএনপির চতুর্থ ও ৫ম কাউন্সিলের মধ্যে ব্যবধান ছিল ১৬ বছর; চতুর্থ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে এবং পঞ্চম

[৩২৩]. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh*, Ibid, p. 51

কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে[৩২৪]। ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দলটির চেয়ারম্যান হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে বিচারপতি সাত্তার এরশাদ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ১৯৮৩ সালে খালেদা জিয়া দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। প্রথমে দলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১৯৮৪ সাল থেকে দলের কাউন্সিলে এখন পর্যন্ত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ফলে খালেদা জিয়ারও ৩৮ বছর থেকে একই পদে থাকা কোনভাবেই রাজনীতিতে নারীর উন্নতি বলা যায় না; বরং এটাও উত্তরাধিকারসূত্র, পরিবারতন্ত্র ও দলে প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা না থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে। এমন অবস্থা জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও। স্বামীর সুবাদে রওশন এরশাদ এমপি হন এবং নামেমাত্র বিরোধী দলীয় নেত্রী হন।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অবস্থান

নারীরা আগের তুলনায় অনেক এগিয়েছে, কর্মজীবি নারীর সংখ্যাও তুলনামূলক বেড়েছে। তবে সার্বিক বিবেচনায় নীতি নির্ধারণের জায়গাগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম, কোনোভাবেই আশাব্যঞ্জক নয়[৩২৫]। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ দিন দিন বাড়ছে। নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি বেশির ভাগ প্রশাসনের হাতেই রয়েছে। বাংলাদেশে সরকারের নীতি নির্ধারণে মন্ত্রীদের পরই যাদের ভূমিকা, তারা হলেন সচিব এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা। তারাই রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেন। আশার দিক হচ্ছে, রাজনীতিসহ অনেক অনেক সেক্টরের চাইতে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪টি[৩২৬]। এদের মধ্যে প্রশাসনিক ক্যাডারে নারীর সংখ্যা বাড়ছে। এই ক্যাডারে বর্তমানে (২০২১) কর্মরত মোট ৫,৪৪৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১, ৪৪৭ জন নারী; যা শতকরা হিসাবে প্রায় ২৬ শতাংশ। প্রশাসনের সিনিয়র সচিব, সচিব এবং সমমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করছেন ৭৪ জন কর্মকর্তা। এরমধ্যে সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন ১০ জন নারী[৩২৭]। ৬৪ জন জেলা প্রশাসকের মধ্যে নারী রয়েছেন আট জন। এই সেক্টরে নারীর আগ্রহ ও সংখ্যা বাড়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, প্রশাসন ক্যাডারের নারী কর্মকর্তাগণকে অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় কম বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়[৩২৮]।

---

[৩২৪]. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh,* Ibid, p. 51

[৩২৫]. *নারীর সমতা: জরিপ ও বাস্তবতা* (https://www.dw.com)

[৩২৬]. প্রাগুক্ত

[৩২৭]. দৈনিক মানবজমিন, ৮ মার্চ ২০২১

[৩২৮]. প্রাগুক্ত

দেশের বিচারাঙ্গনেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে এখন পর্যন্ত বিচারপতি হিসেবে কারো আগমন না ঘটলেও হাইকোর্ট বিভাগের ৯২ জন বিচারপতির মধ্যে সাত জন নারী। অন্যদিকে, নিম্ন আদালতে কর্মরত ১,৮৪৫ জন বিচারকের মধ্যে নারী বিচারক রয়েছেন ৫৪৪ জন[৩২৯]। বিচার বিভাগে নারীর সংখ্যাও প্রশাসনিক ক্যাডারের মতো বাড়ছে, বিশেষ করে নিম্ন আদালতের ক্ষেত্রে।

অনেক সময় দেখা যায়, নারীর অগ্রযাত্রাকে আরো উৎসাহিত করতে তুলনামূলক কম যোগ্যতা সম্পন্ন নারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হয়। ফলে ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে কোন কোন সময় এসব নারী এমন কিছু করে ফেলে, যা পুরো নারীসমাজের জন্য বদনামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ২০২১ সালের ১৭ মে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে দৈনিক প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাংবাদিক রোজিনা ইসলামকে পাঁচ ঘন্টা আটকে রেখে লাঞ্ছিত করা এবং পরে পুলিশের কাছে সমর্পণ করার ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের নারী কর্মকর্তারাই বেশি বিতর্কিত ভূমিকা রেখেছিলেন। ঐ ঘটনা ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত হয়। ঘটনার পর পর মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেসা বেগম কর্তৃক রোজিনা ইসলামের গলা চেপে ধরার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। আইন বহির্ভূতভাবে কাজী জেবুন্নেসা ওই নারী সাংবাদিকের শরীরে তল্লাশীও চালান[৩৩০]। এই চরম বিতর্কিত ঘটনায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জাকিয়া পারভিন, শারমিন সুলতানাসহ আরো কিছু নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত ছিলেন। সেদিনের ঘটনায় কিছু পুরুষ কর্মকর্তা-কর্মচারীও জড়িত থাকলেও মূলত নারী কর্মকর্তারা বেশি নিন্দনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

২০২০ সালে কুড়িগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন প্রশাসনের অন্য কিছু কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যা করেন, তাতে রীতিমতো সবাই হতবাক হয়ে যায়। জেলা প্রশাসকের ভূমিকায় মধ্যরাতে স্থানীয় এক সাংবাদিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পরে মাদক মামলায় সাজা দেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বাড়িতে ঢুকে ওই সাংবাদিককে মারধর করেন এবং এনকাউন্টারে দেওয়ার হুমকি দেন বলেও অভিযোগ ছিল। জেলা প্রশাসকের অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেদন লেখার কারণেই স্থানীয় ওই সাংবাদিকের উপর নিগ্রহ চালানো হয় বলে মিডিয়ায় আসে। মধ্যরাতে সাংবাদিককে ধরে নিয়ে সাজা দেওয়ার ঘটনায় দেশব্যাপী তীব্র সমালোচনার মুখে ঘটনার কয়েকদিন পর সুলতানা পারভীনকে প্রত্যাহার করা হয়[৩৩১]।

---

[৩২৯]. দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ মার্চ ২০২১

[৩৩০]. দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল এবং অন্য আরো দৈনিক, ১৮ মে ২০২১

[৩৩১]. দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ এপ্রিল ২০২০

কুড়িগ্রামের সেই জেলা প্রশাসকের ঘটনার পাশাপাশি সময়ে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাইয়েমা হাসান আরেক অবাক কাণ্ডের জন্ম দেন। করোনাকালীন সময়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি তদারকি করতে গিয়ে স্থানীয় একটি বাজারে এই নারী কর্মকর্তা তাঁর পিতার বয়সী তিন বয়স্ক ব্যক্তিকে কান ধরে উঠবস করান। তিনি নিজেই আবার এই ঘটনার ছবি তুলেন। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় উঠলে সাইয়েমা হাসানকে প্রত্যাহার করা হয়[৩৩২]।

অযাচিত এমন আচরণ অনেক সময় পুরুষ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পেলেও সাম্প্রতিক সময়ে এমন ভারসাম্যহীন আচরণ নারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তুলনামূলক বেশি আসছে; অথচ প্রশাসনে এখনো পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। বিচার বিভাগ, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সুনাম ও দক্ষতার সাথে কাজ করলে সেটা নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। নারীকে তার মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা ও সুযোগ দিতে হবে এবং সেই সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী পদায়ন, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বসানোর বিষয়টি চিন্তা করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের নামে অযোগ্যদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলে প্রকৃত ক্ষমতায়ন হবে না।

রাজনৈতিক দলে নারীর প্রতিনিধিত্ব

রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরে নেতৃত্বে ২০২১ সালের আগে তথা ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করার বিধান করে ২০০৮ সালে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২' সংশোধন করা হয়। কিন্তু এখনো (২০২১ ইংরেজি) দেশের একটি রাজনৈতিক দলও এই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। ৪০টির বেশি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটিতে নারীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নেই। ছোট-বড় কোনো রাজনৈতিক দলই এখনো এক-তৃতীয়াংশ নারী নেতৃত্ব গঠনের কাছাকাছিও যেতে পারেনি। আবার যেটুকু প্রতিনিধিত্ব আছে, সেটুকুর একটা অংশ নামেমাত্র। ফলে এটাই সত্য যে, রাজনীতিতে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এখনো বহুদুরের একটি বিষয়[৩৩৩]।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য পদে মাত্র চারজন এবং বিএনপি'র স্থায়ী কমিটিতে রয়েছেন মাত্র একজন নারী। আওয়ামী লীগের ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে দুই জন মাত্র নারী আছেন। ৭৩ সদস্য

[৩৩২]. দৈনিক যুগান্তর, ২৮ মার্চ ২০২০

[৩৩৩]. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh,* Ibid, p. 45

বিশিষ্ট বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদে মাত্র ছয়জন নারী রয়েছেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আটজনের মধ্যে একজনও নারী নেই। অন্যদিকে বিএনপিতে একই পদে ১০ জনের বিপরীতে নারী আছেন দুই জন। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে চারজনের মধ্যে নারী একজন থাকলেও বিএনপিতে একই পদে আটজনের মধ্যে কোনো নারী সদস্য নেই। ৭৮ সদস্য নিয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন ১৫ জন, যা এক-পঞ্চমাংশেরও কম বা প্রায় ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে বিএনপিতে ৫০২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে নারী আছেন মাত্র ৬৫ জন, যা এক সপ্তমাংশও নয় বা প্রায় ১১ শতাংশ।

জাতীয় পার্টি এবং অন্য আরো প্রচলিত দলগুলোর অবস্থাও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো। অনেক ক্ষেত্রে এসব অনেক দলে নারীর প্রতিনিধিত্ব আরো কম। দেশের ইসলামপন্থী দলগুলো নারী নেতৃত্বের বিরোধী; বামপন্থী দলগুলো তাদের দলের নেতৃত্বে নারীর প্রতিনিধিত্বের শর্ত পূরণের পাশাপাশিও নয়। মাত্র চারটি দল দাবী করছে যে, ২০২০ সালের মধ্যে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে। দলগুলো হচ্ছে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), গণফ্রন্ট, খেলাফত মসলিস ও জাকের পার্টি। এই দলগুলোতে বাস্তবে নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি। কাগজে-কলমে শর্ত পূরণ করে নির্বাচন কমিশনকে ও অন্যদের দেখিয়েছে মাত্র; যা মূলত 'লোকদেখানো'। কারণ এসব দলের কার্যক্রমে বাস্তবে নারীর অংশগ্রহণ খুব একটা দেখা যায় না। খেলাফত মসলিস তাদের ওয়েবসাইটে ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন-সাময়িকীতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সভার বিভিন্ন চিত্র দিয়ে থাকে, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ দেখা যায় না। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার এত কম হলেও যেটুকু আছে তা-ও অতীতের চাইতে বেশি। তবে যতটুকু বাড়ার প্রত্যাশা ছিল ততটুকু হয়নি।

বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে কেন্দ্রে ও অঙ্গসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের হতাশার চিত্রের পাশাপাশি তৃণমূলের অবস্থা আরো নাজুক। বহু দলের জেলা, উপজেলাসহ তৃণমূলের বহু কমিটিতে নারীর কোন প্রতিনিধিত্বই নেই। বিভিন্ন দলের নারী কর্মীদের অনেকে অভিযোগ করেন যে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নারীদের কমিটিতে নেওয়া হয় না[৩৩৪]।

বিধান করেও যখন রাজনৈতিক দলগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি, এমনকি তার অর্ধেকও হয়নি; তখন নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বিকল্প ভাবছে। ২০২০ সালের

[৩৩৪]. দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি ২০১৭

মাঝামাঝি সময়ে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনের একটি খসড়া প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের ওপরই ছেড়ে দিতে চায়; কিংবা আইন সংশোধন করে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় বাড়াতে চায়। কোন একটি দলও ৩৩ শতাংশ নারী কোটা পুরণ করতে না পারায় এমন চিন্তা করছে সংস্থাটি। নির্বাচন কমিশন এখন এমন বিধান করতে চায়, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের গঠনতন্ত্রে ৩৩ শতাংশ নারী পদ পূরণের সময়সীমা নিজেরাই উল্লেখ করবে এবং প্রতি বছর তথ্য প্রদানের সময় ইসিকে নিজেদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নারীপদ পূরণের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে[৩৩৫]।

সংসদে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ

সংসদীয় রাজনীতির প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্য থাকলেও সংসদে নারীর ভূমিকা পালনের ইতিহাস ততো পুরনো নয়। সারাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় সীমিত। ১৯১৮ সালে ইংল্যান্ডে কাউন্টেস মারকিউজ নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম কোন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন[৩৩৬]। এরপর আরো বিভিন্ন দেশের সংসদে নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে থাকেন, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। ইংল্যান্ডের সংসদে প্রথম নারী নির্বাচিত হওয়ার পর আমাদের এই ভূখন্ডে সংসদে নারী নির্বাচিত হয়ে আসতে খুব বেশি বছর সময় লাগেনি। পাকিস্তান আমলে আমাদের এখানেও আইন পরিষদে কিছু নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বেগম জাহানারা শাহনেওয়াজ ও বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ এই দুই জন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট থেকে ১১ জন নারী জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তারা হচ্ছেন নুরজাহান মুরশিদ, দৌলতুন নেসা, বদরুন্নেসা আহমদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তাফরুন্নেসা, মেহেরুন নেসা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আরো তিন জন। প্রাদেশিক পরিষদে নেলিসেন গুপ্ত নির্বাচিত হন[৩৩৭]।

সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটে সংসদের সাধারণ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন কিছুটা বাড়লেও আশানুরূপ নয়; এবং যে কিছুটা বেড়েছে তার বড় অংশটি উত্তরাধিকারসূত্রে ও পরিবারতন্ত্রের

---

[৩৩৫]. চন্দন লাহিড়ী, *সংকটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া (নিবন্ধ)*, বিডিনিউজ, ১৯ জুন ২০২০ (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/62160)

[৩৩৬]. জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্টারী শব্দকোষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১০), পৃ. ২৮২

[৩৩৭]. Nazimun Nahar, *Women Empowerment in Local Government in Bangladesh: A Study of Keshabpur Upazila of Jessore District* (M.Phil Thesis done under Political Science Dept of Dhaka University, 2019), p. 96

ফলাফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ.ডি গবেষক তাঁর অভিসন্দর্ভে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ব্যবস্থা বজায় থাকলেও তা কার্যকর অংশগ্রহণমূলক নয়; তবে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যরা সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা রাখেন[৩৩৮]।

৫ম ও ৭ম সংসদের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নোটিশ প্রদান, বিভিন্ন বিধিতে বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া, বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সংসদীয় কার্যাবলীতে সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য ছিল[৩৩৯]।

একাদশ সংসদের সাধারণ আসনের নারী সদস্য

সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসন থেকে সবচেয়ে বেশি নারী নির্বাচিত হয়েছেন একাদশ সংসদ নির্বাচনে। এই সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারীর সংখ্যা ২৩। এর মধ্যে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাসহ ২০ জনই আওয়ামী লীগের। জাতীয় পার্টি থেকে দুই জন এবং জাসদ থেকে একজন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ১৯ জনসহ মোট ২২ জন নারী একাদশ সংসদের নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই অভিসন্দর্ভ লেখার সময় পর্যন্ত এই ২২ জন নারী এমপির মধ্য দুই জন মারা যান। অন্যদিকে উপনির্বাচনের মাধ্যমে আরো তিন জন নারী সাধারণ আসন থেকে সংসদে আসেন। ফলে সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে মোট ১, ৮৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বতন্ত্রসহ নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৯ জন, যা এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু ঘুরেফিরে একই নারী নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন, যিনি অতীতেও নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং যাদের বেশিরভাগ উত্তরাধিকার সূত্রে বা পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনীতিতে আসেন। একাদশ সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত ২৫ জনের (মারা যাওয়া দুই জনসহ) মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে

---

৩৩৮. ফেরদৌস জামান, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধিনে সম্পাদিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৬), পৃ. ১৩৪

৩৩৯. প্রাগুক্ত

কুমিল্লা-২ আসন থেকে নারী উদ্যোক্তা সেলিমা আহমেদ মেরী, কক্সবাজার-৪ আসন থেকে শাহীনা আক্তার চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ-১ আসন থেকে ডা. সৈয়দ জাকিয়া নুর লিপি ও বগুড়া-১ আসন থেকে শাহাদারা মান্নান শিল্পী নতুন মুখ হিসেবে সংসদে এসেছেন। এই চারজনই বেশ ব্যতিক্রমভাবে এবং বিশেষ প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত হন। সেলিমা আহমেদ মেরী বড় ব্যবসায়ী, শাহিনা আক্তার নির্বাচন করেন তাঁর বিতর্কিত স্বামী মনোনয়ন না পাওয়ার কারণে আর বাকি দুই জন উপনির্বাচনে আসেন। এর বাইরে যেসব নারী এমপি নির্বাচিত হয়েছেন, তারা দশম সংসদে বা এর আগের কোন সংসদে সরাসরি নির্বাচিত অথবা সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন।

একাদশ সংসদের সাধারণ আসনের নারী সদস্যরা হলেন:

ক্রমিক	নাম	আসন	মন্তব্য
১.	শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	অতীতের সংসদেও ছিলেন
২.	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী	রংপুর-৬	শেখ হাসিনার আসন থেকে
৩.	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	ফরিদপুর-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
৪.	মতিয়া চৌধুরী	শেরপুর-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
৫.	সাহারা খাতুন[৩৪০]	ঢাকা-১৮	মারা গেছেন
৬.	ডা. দিপু মণি	চাঁদপুর-৩	অতীতের সংসদেও ছিলেন
৭.	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	খুলনা-৩	অতীতের সংসদেও ছিলেন
৮.	ইসমাত আরা সাদেক[৩৪১]	যশোর-৬	মারা গেছেন
৯.	মিসেস হাবিবুন নাহার	বাগেরহাট-৩	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১০.	মেহের আফরোজ চুমকি	গাজীপুর-৫	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১১.	সিমিন হোসেন রিমি	গাজীপুর-৪	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১২.	মাহাবুব আরা বেগম গিনি	গাইবান্ধা-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৩.	সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি	মুন্সিগঞ্জ-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৪.	শিল্পী মমতাজ বেগম	মানিকগঞ্জ-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৫.	জয়া সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ-২	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৬.	রেবেকা মমিন	নেত্রকোনা-৪	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৭.	আয়েশা ফেরদাউস	নোয়াখালী-৬	অতীতের সংসদেও ছিলেন
১৮.	সেলিমা আহমেদ মেরী	কুমিল্লা-২	নতুন মুখ
১৯.	শাহিনা আক্তার চৌধুরী	কক্সবাজার-৪	নতুন/আব্দুর রহমান বদির স্ত্রী
২০.	বেগম রওশন এরশাদ (জাপা)	ময়মনসিংহ-৪	অতীতের সংসদেও ছিলেন
২১.	নাসরিন জাহান রতনা (জাপা)	বরিশাল-৬	অতীতের সংসদেও ছিলেন
২২.	শিরীন আখতার (জাসদ)	ফেনী-১	অতীতের সংসদেও ছিলেন
২৩.	ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি	কিশোরগঞ্জ-১	উপনির্বাচনে (নতুন মুখ)
২৪.	শাহাদারা মান্নান শিল্পী	বগুড়া-১	উপনির্বাচনে (নতুন মুখ)
২৫.	উম্মে কুলসুম স্মৃতি	গাইবান্ধা-৩	উপনির্বাচনে

[৩৪০]. আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি থাকাবস্থায় ৭৭ বছর বয়সে ২০২০ সালের ৯ জুলাই দিবাগত রাতে থাইল্যান্ডে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারা যান।

[৩৪১]. সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক একাদশ সংসদের সদস্য থাকাকালীন ২০২০ সালে মারা যান

পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই ২৫ জন নারী বিভিন্ন সাধারণ আসন থেকে আসলেও এদের বেশিরভাগই পরিবারতন্ত্র বা উত্তরাধিকারের রাজনীতির সূত্রে মনোনয়ন পেয়েছেন। হয়তো স্বামীর মৃত্যুর পর শূন্য আসনের উপনির্বাচনে; নয়তো স্বামীর নির্বাচন করতে না পারার কারণে অথবা অতীতে এই আসন স্বামী বা পিতার আসন হিসেবে পরিচিত ছিল বলে। অবশ্য মাত্র কয়েক জন আছেন যারা রাজনীতির করার মধ্য দিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিতে আসেন পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পর। রাজনীতিতে আসার পর তিনি বিভিন্ন সময় গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে এবং আরো বিভিন্ন আসন থেকে একই সময়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একাদশ সংসদ নির্বাচনে একটি মাত্র আসন থেকে তথা গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর আগে রংপুর-৬ সহ আরো বিভিন্ন আসনে একই সাথে নির্বাচন করতেন ও বিজয়ী হতেন। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী কোন প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে আসেন এবং আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধান পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেটা সবারই জানা।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জাতীয় সংসদের স্পীকার। বিধান অনুযায়ী স্পীকারকে সংসদ সদস্য হতে হয়। তাঁর নিজ জেলা নোয়াখালী হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন হিসেবে পরিচিত রংপুর-৬ আসন থেকে এমপি হন। ড. শিরীন নবম সংসদে সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন এবং তখন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। শেখ হাসিনা দশম সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি রংপুর-৬ আসনেও বিজয়ী হন। পরে রংপুর-৬ আসনটি ছেড়ে দিলে সেখান থেকে উপনির্বাচনে ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী করে আনা হয় এবং দশম সংসদের স্পীকার বানানো হয়।

একাদশ সংসদ নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুটি আসন থেকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফলে গোপালগঞ্জ-৩ ও রংপুর-৬ আসনে মনোনয়নপত্রও জমা দেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ড. শিরীনও রংপুর-৬ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা একটি আসনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজের একটি আসন ছেড়ে দেন। তাঁর ছেড়ে দেওয়া আসনে ভোটে দাঁড়ান জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী[৩৪২]। রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত নোয়াখালির শিরীন শারমীন প্রকৃত অর্থে ভোটে নয়, আনুকূল্য পেয়েই তিনি সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। উত্তরাধিকারসূত্রেও তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আনুকূল্য পান; কারণ শিরীন শারমিনের পিতা রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন

[৩৪২]. দৈনিক প্রথম আলো, ০৭ ডিসেম্বর ২০১৮

এবং প্রশাসনের ক্যাডার থাকাকালীন ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের পিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফলে তিনি শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ট ছিলেন।

ফরিদপুর-২ আসনের এমপি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী একাদশ সংসদে নতুন মুখ নন। তিনি এর আগেও এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে তিনি প্রথম বার এমপি হন ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত আসন থেকে। সপ্তম সংসদেও তিনি সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন। দশম সংসদে সংসদ উপনেতা ছিলেন এবং একাদশ সংসদেও সংসদ উপনেতার দায়িত্ব পালন করছেন। সাজেদা চৌধুরী একবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধিন সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ছিলেন।

মতিয়া চৌধুরী মূলত রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছেন এবং এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এক সময়ে বাম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত মতিয়া চৌধুরী তুখোড় ছাত্রনেত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং একাধিক বার এমপি ও মন্ত্রী হন। মতিয়া চৌধুরী এখন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য। অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনও রাজনীতির করার মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগ থেকে একাধিক বার এমপি ও মন্ত্রী হন। তিনিও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। ২০০৯-২০১৩ সময়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। একাদশ সংসদে ঢাকা-১৮ এমপি থাকাকালীন তিনি মারা যান। তাঁর আসন থেকে ২০২০ সালের ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে এমপি হন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাবিব হাসান।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দিপু মণিও একাদশ সংসদে নতুন মুখ নন। তিনি এর আগের দুই সংসদেরও সদস্য ছিলেন এবং ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর পিতা এম.এ. ওয়াদুদ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এম.এ. ওয়াদুদের কন্যা হিসেবে দলে দিপু মণির মূল্যায়ন রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান খুলনা-৩ আসন থেকে একাধিক বার সাধারণ আসনে এমপি হলেও তিনি প্রথম বার এমপি হয়েছিলেন সংরক্ষিত নারী আসন থেকে। তিনি সপ্তম সংসদের নারী এমপি ছিলেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মোসলেম মিয়া আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং স্বামী আবু সুফিয়ান ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা; মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

ইসমত আরা সাদেক দশম সংসদেরও এমপি ছিলেন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী এএইচএসকে সাদেক ১৯৯৬-২০০১ সময়কার আওয়ামী লীগ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যশোর-৬ আসন থেকে ইসমত আরা সাদেক নির্বাচন করেন ও এমপি নির্বাচিত হন। ইসমত আরা সাদেক একাদশ সংসদের সদস্য থাকাকালীন ২০২০ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর এই আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার জন্য অনেকের সাথে তাঁর মেয়ে নওরিন সাদেকও জোর চেষ্টা চালান; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাননি। ২০২০ সালের ১৪ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শাহীন চাকলাদার বিজয়ী হন।

বাগেরহাট-৩ আসন থেকে মিসেস হাবিবুন নাহারও উত্তরাধিকারসূত্রে এমপি হন। তাঁর স্বামী তালুকদার আব্দুল খালেক এই আসন থেকে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬-২০০১ সময়ে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দশম সংসদের সদস্য থাকাকালীন তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ফলে তাঁকে বাগেরহাট-৩ আসন শূন্য করে দিতে হয়। সেই শূন্য আসনে উপনির্বাচনে এমপি হন তাঁর স্ত্রী হাবিবুন নাহার। দশম সংসদের শেষ বছরের কয়েক মাসের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত হন তিনি। তালুকদার আব্দুল খালেক আসনটি ছেড়ে দিলেও স্ত্রীর মাধ্যমে বাগেরহাট-৩ আসন তাঁর পকেটেই থাকলো[৩৪৩]। পরে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী টিকেটে আবার এমপি হন হাবিবুন নাহার এবং বন, পরিবেশ ও জলবায়ু উপমন্ত্রী হন । মিসেস হাবিবুন নাহার নবম সংসদেরও এমপি ছিলেন; ২০০৮ সালে নবম সংসদ নির্বাচনের সময় তাঁর স্বামী তালুকদার আব্দুল খালেক খুলনার মেয়র ছিলেন।

মেহের আফরোজ চুমকি ২০১৪-২০১৮ সময়ে মহিলা ও শিশু-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি গাজীপুর-৫ আসন থেকে নির্বাচিত হন, এটা তাঁর পিতা মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের আসন হিসেবে পরিচিত ছিলো। ময়েজউদ্দিন বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নিহত হন। মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে গাজীপুর-কালীগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে যথাক্রমে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মেহের আফরোজ চুমকি তাঁর বাবার আসন থেকেই এমপি হন।

---

[৩৪৩]. বাংলা ট্রিবিউন, ২৪ মে ২০১৮

গাজীপুর-৪ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন সিমিন হোসেন রিমি উত্তরাধিকারসূত্রেই। এই আসন থেকে তাঁর বাবা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদও নির্বাচিত হতেন। পরবর্তীতে নির্বাচিত হন তাঁর ছেলে তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। সরকার ও সংসদ থেকে পদত্যাগ করলে উপনির্বাচনেই সোহেল তাজের বোন রিমিকে এই আসনে মনোয়নয়ন দেওয়া হয় এবং নবম সংসদের বাকি সময়ের জন্য তিনি এমপি হন। পরবর্তীতে দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনেও তিনি দলীয় মনোনয়ন পান।

গাইবান্ধা-২ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য মাহবুব আরা গিনির পিতা বা স্বামী এমপি ছিলেন না, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের ঘনিষ্ট এবং আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িত। মাহবুব আরা গিনি হলেন শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার বোনের নাতনি। মুন্সীগঞ্জ-২ আসনের এমপি সাগুফতা ইয়ামসিন এমিলিরও পিতা বা স্বামীর আসন ওটা ছিল না। সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী এমপি হিসেবে একাদশ সংসদে মানিকগঞ্জ-২ আসন থেকে শিল্পী মমতাজ বেগমও নির্বাচিত হয়ে আসলেও তিনি সংসদে নতুন মুখ নন। কারণ এর আগে তিনি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিলেন।

সুনামগঞ্জ-২ আসনের এমপি জয়া সেনগুপ্ত সাবেক রেলমন্ত্রী সুরনজিত সেনগুপ্তের স্ত্রী। দশম সংসদের এমপি থাকাকালীন সুরনজিত মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর শূন্য আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন দেওয়া হয় জয়া সেনগুপ্তকে। তিনি এর আগে কখনো কোন পর্যায়ের নির্বাচন করেননি এবং রাজনীতিতেও সক্রিয়া ছিলেন না। পরে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পন। রেবেকা মোমিন নেত্রকোনা-৪ আসন থেকে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে নির্বাচিত হন। এক সময় এই আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হতেন তাঁর স্বামী আবদুল মোমিন, যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদ মন্ত্রীসভার সদস্যও ছিলেন। ফলে রেবেকা মোমিনও এমপি হয়েছেন উত্তরাধিকাসূত্রে।

নোয়াখালী-৬ আসন থেকে নির্বাচিত আয়েশা ফেরদাউসও স্বামীর আসন থেকে নির্বাচিত হন। তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আলী এই আসন থেকে আওয়ামী লীগের ও জাতীয় পার্টির দলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে মোহাম্মদ আলী জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগে যোগদানের পর ২০০১ সালে ৮ম সংসদ নির্বাচনে দলীয় টিকিটে নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেলেও ঋণখেলাপি হওয়ায় মনোনয়পত্র বাতিল হলে তার স্ত্রী আয়েশা ফেরদাউস স্বতন্ত্র নির্বাচন

করে হেরে যান। মোহাম্মদ আলীর যে মনোনয়ন বাতিল হতে পারে, সেটা তিনি আগ থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে আসনটি নিজ পরিবারের হাতছাড়া করতে চাননি। পরবর্তীতে আয়েশা ফেরদাউস ২০১৪ ও ২০১৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

কুমিল্লা-২ আসন থেকে অনেকটা নাটকীয়ভাবে সেলিমা আহমেদ মেরী নির্বাচিত হন। তিনি একাদশ সংসদের নতুন মুখ হলেও মূলত একজন নারী উদ্যোক্তা এবং দেশের একটি বৃহৎ শিল্প গ্রুপের একজন হওয়ায় আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের আনুকূল্য পেয়ে সংসদ সদস্য হন। মেরী নিটল-নিলয় গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। তাঁর স্বামী আবদুল মাতলুব আহমাদ এই গ্রুপের চেয়ারম্যান। মেরীর বাবার বাড়ি কুমিল্লার হোমনায় হলেও তাঁর স্বামীর বাড়ি চাঁদপুর। একাদশ সংসদ নির্বাচনে তাঁকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন অনেকটা 'বিস্ময়' হিসেবেই এসেছিল দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের কাছে[৩৪৪]। তাঁর মনোনয়নে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন ২০০৮ সালের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যাওয়া মো. আব্দুল মজিদ। জাতীয় পার্টির নেতা আমির হোসেন ভূইয়াও প্রার্থী হয়েছিলেন। বিএনপির বয়কটের মধ্য দিয়ে ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনে হোমনা ও তিতাস উপজেলা নিয়ে গঠিত কুমিল্লার এই আসনে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন আমির হোসেন। তিনি ২০১৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে লাঙল প্রতীক নিয়ে প্রার্থী হন। নির্বাচনের শেষ দিকে এক সভায় নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে সেলিমা আহমেদ মেরীকে সমর্থন জানান তিনি[৩৪৫]।

শাহিনা আক্তার চৌধুরী আওয়ামী লীগের বিতর্কিত এমপি আবদুর রহমান বদির স্ত্রী[৩৪৬]। মাদক ব্যবসাসহ নানা অপকর্মে জড়িত থাকায় স্বামী মনোনয়ন না পাওয়ায় তিনি নির্বাচন করেন। ফলে তিনি প্রকৃত অর্থে নিজ যোগ্যতায় নির্বাচিত নন। শাহিনার এর আগে কোন পর্যায়ের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নেই এবং রাজনীতিতে সক্রিয় বা গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে ছিলেন না। আব্দুর রহমান বদি কক্সবাজার-৪ আসন থেকে নবম ও দশম সংসদের সদস্য ছিলেন।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির দুই জন ময়মনসিংহ-৪ আসন থেকে বেগম রওশন এরশাদ এবং বরিশাল-৬ আসন থেকে নাসরীন জাহান রতনা এমপি হন পরিবারতন্ত্র ও স্বামীর প্রভাবে। রওশন এরশাদ একাদশ সংসদের

---

৩৪৪. বিডিনিউজ, ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮

৩৪৫. প্রাগুক্ত

৩৪৬. প্রথম আলো, ১ জানুয়ারী ২০১৯

বিরোধী দলীয় নেত্রী। এরশাদের স্ত্রী না হলে কি তিনি কখনো এমপি হতে পারতেন? অন্যদিকে, তাঁর দলের রতনা এমপি হন স্বামীর আসন থেকে। জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার দুর্নীতির অভিযোগে নির্বাচন করতে না পারায় দল থেকে তাঁর স্ত্রীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। রতনা দশম সংসদেরও এমপি ছিলেন এবং সেই বারও তিনি একই কারণে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

বাপ ও ভাইয়ের আসন হিসেবে পরিচিত কিশোরগঞ্জ-১ আসনের উপনির্বাচনে একাদশ সংসদের সদস্য ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি। তাঁর বাবা সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং ভাই সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ও সৈয়দ আশরাফ কিশোরগঞ্জের এমপি ছিলেন। ক্যান্সার আক্রান্ত সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম একাদশ সংসদ নির্বাচনের সময় দেশের বাইরে চিকিৎসাধিন ছিলেন। নির্বাচন করার মতো অবস্থানে না থাকলেও তাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়। নির্বাচনের পাঁচদিনের মাথায় শপথ নেওয়ার আগে ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয় এবং কিশোরগঞ্জ-১ আসনটি শূন্য হয়ে যায়। এই শূণ্য আসনের উপনির্বাচনে সৈয়দ আশরাফের ছোট বোন সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি আওয়ামী লীগের টিকেটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. মোস্তাইন বিল্লাহ ও গণতন্ত্রী পার্টির প্রার্থী ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক দোলন মনোয়নয়ন দাখিল করলেও পরে প্রত্যাহার করে নেন। এভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে এবং নিজের দল ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এমপি হয়ে যান তিনি।

বগুড়া-১ আসন থেকে শাহাদারা মান্নান শিল্পী একাদশ সংসদের সদস্য হন জাকিয়া নূর লিপির মতোই উপনির্বাচনে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে। এই আসনের এমপি ছিলেন শাহাদারার স্বামী আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল মান্নান। তিনি এই আসন থেকে পরপর তিন বার এমপি হন। একাদশ সংসদের সদস্য থাকাকালীন ২০২০ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু হলে আসনটি শূন্য হয়। শূন্য এই আসনে ২০২০ সালের ১৪ জুলাই তারিখে উপনির্বাচনে শাহাদারা মান্নান শিল্পী আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হন।

গাইবান্ধা-৩ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতিও একাদশ সংসদে আসেন উপনির্বাচনের মাধ্যমে। এর আগে দশম সংসদে তিনি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিলেন। এখান থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন ইউনূস আলী সরকার। ২০১৯ সালে তাঁর মৃত্যু হলে এই আসনে ২০২০ সালের ২১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি নির্বাচিত হন উম্মে কুলসুম স্মৃতি।

প্রথম থেকে দশম সংসদের সাধারণ আসন থেকে নারী সদস্য

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। সেই নির্বাচনে সাধারণ আসন থেকে কোন নারী নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে পারেননি। ন্যাপ (মোজাফফর) ও জাসদ তিনটি সাধারণ আসনে দুই জন নারীকে প্রার্থী করেছিল[৩৪৭]। প্রথম সংসদে সাধারণ আসন থেকে কোন নারী নির্বাচিত হয়ে না আসলেও সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য ছিলেন ১৫ জন। দেশে প্রথম সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ আসন থেকে কোন নারী নির্বাচিত হন ১৯৭৯ সালে। দেশের দ্বিতীয় সংসদে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সাধারণ আসনের এই এমপি হচ্ছেন সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ। তিনি পরবর্তীতে মন্ত্রীও হয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংসদে উপনির্বাচনের মাধ্যমে আরেক জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোট ২, ১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন মাত্র ১৭ জন।

তৃতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। সেই নির্বাচনে পাঁচ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হন। জাতীয় পার্টি থেকে চার জন ও আওয়ামী লীগ থেকে একজন নারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে চার জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হন। চার জনই জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে এবং সেই নির্বাচনে পাঁচ জন নারী সাধারণ আসন থেকে সরাসরি নির্বাচিত হয়েছিলেন। চার জন আওয়ামী থেকে ও একজন বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিএনপি থেকে নির্বাচিত এই একজন নারী তথা বেগম খালেদা জিয়া সে সময় দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন। ওই নির্বাচনে মোট ৩৯ জন নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের চার জনের তিন জন বর্তমান একাদশ সংসদেরও সদস্য। এরা হচ্ছেন শেখ হাসিনা, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ও মতিয়া চৌধুরী। সেই সংসদে উপনির্বাচনে জয়ী রওশন আরা নজরুল পরবর্তীতে আর এমপি ছিলেন না। অবশ্য তিনি ইতোমধ্যে মারা গিয়েছেন।

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত স্বল্পস্থায়ী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন থেকে নারী সংসদ সদস্য ছিলেন তিন জন এবং এরা সবাই ছিলেন বিএনপির। একই বছরের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ

[৩৪৭]. Nazimun Nahar, *Women Empowerment in Local Government in Bangladesh*, Ibid, p. 96

নির্বাচনে আট জন নারী সাধারণ আসন থেকে বিজয়ী হন। তিন জন আওয়ামী লীগ থেকে, তিন জন বিএনপি থেকে ও দুই জন জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন মোট ৩৬ জন নারী প্রার্থী। ৮ম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। ওই সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী এমপি ছিলেন ৬ জন। তিন জন বিএনপি, দুই জন আওয়ামী লীগ ও একজন জাতীয় পার্টির টিকেটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই নির্বাচনে সাধারণ আসনে মোট নারী প্রার্থী ছিলেন ৩৮ জন।

নবম সংসদে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে মোট ১৯ জন নারী সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে মোট ৫৭ জন নারী প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচিত ১৯ জনের মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগের, ৩ জন বিএনপির ও একজন জাতীয় পার্টির ছিলেন। আওয়ামী লীগের ১৫ জনের মধ্যে ১২ জনই একাদশ সংসদেরও সদস্য। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ছাড়া ওই সংসদের এই দলের বাকি দুই জন ছিলেন কক্সবাজার-১ আসন থেকে হাসিনা আহমদ এবং সিরাজগঞ্জ-২ আসন থেকে রোমানা মাহমুদ। এই দুই জনই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন তাদের স্বামীদের মনোয়নয়ন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে। কারণ মামলা ও সাজা থাকায় কক্সবাজার-১ আসনের দুই বারের এমপি সালাহউদ্দীন আহমদ ও সিরাজগঞ্জ-২ আসনের এমপি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু নির্বাচন করতে না পারায় তাদের স্ত্রীরা ২০০৮ সালে নির্বাচন করেন এবং নবম সংসদের সদস্য হন।

দশম সংসদ গঠিত হয় ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এই সংসদে ১৮ জন নারী সদস্য সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২৭টি আসনে মোট নারী প্রার্থী ছিলেন ২৮ জন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক সাথে দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পরে তাঁর ছেড়ে দেওয়া রংপুর-৬ আসন থেকে উপনির্বাচনে বিনাদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী। বিএনপিসহ দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন বর্জন করায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা কমে যায় এবং সেই কম সংখ্যকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়ে আসার সংখ্যা খুব একটা কমেনি। নবম সংসদ নির্বাচনে যেখানে ৫৯ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯ জন, দশম সংসদ নির্বাচনে সেখানে ২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হন ১৮ জন। এই সংসদে স্বামীর মৃত্যুর পর উপ নির্বাচনে তিনজন, স্বামীর ছেড়ে দেওয়া আসনে ১ জন

এবং প্রধানমন্ত্রীর ছেড়ে দেওয়া আসনে একজন সহ মোট ৫ জন নারী বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসেন[৩৪৮]। এই সংসদেরও বেশিরভাগ সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য নবম সংসদেরও সদস্য ছিলেন।

নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসন থেকে নারী সদস্য সংখ্যা তুলনামূলক বেশি নির্বাচিত হলেও এসব সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারী সদস্য শতকরা ১০ ভাগেরও কম। এই তিন সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা শতকরা হারে আরো কম ছিল। ২০০৮ সালের নবম সাধারণ নির্বাচনে মোট ১,৫৬৬ প্রার্থীর মধ্যে ৫৭ জন নারী প্রার্থী, যা ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। একাদশ সংসদ নির্বাচনে মোট ১,৮৪৮ জন প্রার্থীর মধ্যে মোট পুরুষ প্রার্থী ছিলেন ১,৭৭৯ জন এবং নারী প্রার্থী ছিলেন ছিলেন ৬৯ জন। আনুপাতিক হারে নারী প্রার্থীর সংখ্যা কম হলেও এই সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশি এবং নির্বাচিত হয়ে আসার সংখ্যা ও হারও বেশি। নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩২ শতাংশ নির্বাচিত হয়েছেন; অন্যদিকে পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে পাশের হার প্রায় ১৩ শতাংশ।

পরিবারতন্ত্র ও উত্তরাধিকারসূত্রে সাধারণ আসন থেকে সরাসরি কিছু নারী নির্বাচিত হওয়ার ফলে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার একটু বেড়েছে। তারপরও সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত নারীর সংখ্যা কম। কারণ কী? এটা একটা বড় কারণ যে, নানা হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে সাধারণ আসনে নারীদের মনোনয়ন দেয়া হয় না। সাধারণ নির্বাচনে নারীকে মনোনয়ন না দেয়ার অন্যতম কারণ দেখানো হয়, নারীরা জিততে পারবে না এবং এতে কোনো দলের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরো অনেক কারণ রয়েছে।

সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ও বাস্তবতা

মূলত জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান। এ ধরনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে, যা মূলত আলংকারিক[৩৪৯]। সংরক্ষিত আসনের এই সদস্যরা সংসদে শোভা বর্ধন করেন এবং অলংকার হিসেবে ভূমিকা রাখেন, কাজের কাজ খুব একটা হয় না তাদের দ্বারা। সংবিধান অনুযায়ী, সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে একটি দল থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নারী সদস্য সুযোগ দেওয়া হবে; এবং তা হবে সংসদে ঐ দলের কতজন প্রতিনিধি রয়েছে সেই অনুপাতে। বর্তমান বিধান অনুযায়ী, একটি রাজনৈতিক দলের ৬ জন এমপি

---

৩৪৮. প্রথম আলো, ১ জানুয়ারী ২০১৯

৩৪৯. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়? (কলাম)*, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৮

যদি নির্বাচিত হন, তাহলে ঐ দল থেকে একজন সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি হবেন। এভাবে সংসদে আসন অনুপাতে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য সংখ্যা ভাগাভাগির ফলে এসব সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে কোন ধরনের লক্ষ্য নিয়ে সংসদে আসেন না। ফলে সংরিক্ষত আসনের নারী সদস্যগণ দেশের নারী সমাজের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ বলে মনে করেন না[৩৫০]। যাহোক, একাদশ সংসদের সংরক্ষিত আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ৪৩ জন, বিরোধী দল জাতীয় পার্টির ৪ জন, বিএনপির একজন, ওয়ার্কার্স পার্টির একজন ও স্বতন্ত্র একজন সদস্য রয়েছেন।

একাদশ সংসদের সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিরা হচ্ছেন:

ক্র	নাম	জেলা	ক্র	নাম	জেলা
১	শিরিন আহমদ	ঢাকা	২৬	শামসুন্নাহার ভূঁইয়া	গাজীপুর
২	জিন্নাতুল বাকিয়া	ঢাকা	২৭	রুমানা আলী	গাজীপুর
৩	চিত্রনায়িকা সুবর্ণা মোস্তফা	ঢাকা	২৮	আদিবা আনজুম মিতা	রাজশাহী
৪	শবনম জাহান শিলা	ঢাকা	২৯	নাদিয়া ইয়াসমিন জলি	পাবনা
৫	নাহিদ ইজহার খান	ঢাকা	৩০	মনিরা সুলতানা	ময়মনসিংহ
৬	খাদিজাতুল আনোয়ার	চট্টগ্রাম	৩১	সৈয়দা রুবিনা মিরা	বরিশাল
৭	ওয়াশিকা আয়েশা খানম	চট্টগ্রাম	৩২	কানিজ সুলতানা	পটুয়াখালী
৮	কানিজ ফাতেমা আহমেদ	কক্সবাজার	৩৩	ফরিদা খানম সাকী	নোয়াখালী
৯	পারভীন হক শিকদার	শরিয়তপুর	৩৪	আঞ্জুম সুলতানা	কুমিল্লা
১০	খোদেজা নাসরীন আক্তার হোসেন	রাজবাড়ী	৩৫	আরমা দত্ত	কুমিল্লা
১১	খন্দকার মমতা হেনা লাভলী	টাঙ্গাইল	৩৬	ফজিলাতুন্নেছা	মুন্সিগঞ্জ
১২	মোছা. অপরাজিতা হক	টাঙ্গাইল	৩৭	রত্না আহমেদ	নাটোর
১৩	ফেরদৌসী ইসলাম জেসী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৮	সৈয়দা রাশেদা বেগম	কুষ্টিয়া
১৪	জাকিয়া পারভীন খানম	নেত্রকোনা	৩৯	খালেদা খানম	ঝিনাইদহ
১৫	হাবিবা রহমান খান	নেত্রকোনা	৪০	রাবেয়া আলী	নীলফামারী
১৬	গেন্টারিয়া ঝর্ণা সরকার	খুলনা	৪১	জাকিয়া তাবাসসুম	দিনাজপুর
১৭	উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৪২	শেখ এ্যানী রহমান	পিরোজপুর
১৮	সৈয়দা জোহরা আলাউদ্দিন	মৌলভীবাজার	৪৩	তামান্না নুসরাত বুবলী	নংরসিদী
১৯	সালমা ইসলাম (জাতীয় পার্টি)		৪৪	শামীমা আক্তার খানম	সুনামগঞ্জ
২০	রওশনারা মান্নান (জাতীয় পার্টি)		৪৫	সুলতানা নাদিরা	বরগুনা
২১	মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী (জাপা)		৪৬	তাহমীনা বেগম	মাদারীপুর
২২	নাজমা আক্তার (জাতীয় পার্টি)		৪৭	রেশেমা বেগম	ফরিদপুর
২৩	রুমিন ফারহানা (বিএনপি)		৪৮	নার্গিস রহমান	গোপালগঞ্জ
২৪	লুৎফুন নেসা খান (ওয়ার্কার্স পাটি)		৪৯	হোসনে আরা	জামালপুর
২৫	মোছা. সেলিনা ইসলাম (স্বতন্ত্র)		৫০	বাসন্তি চাকমা	খাগড়াছড়ি

৩৫০. আবেদা সুলতানা, *ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান* (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-৩, ২০০০), পৃ. ১২

বাংলাদেশের প্রথম সংসদে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য না থাকলেও প্রথম সেই সংসদে সংরক্ষিত আসনে ১৫ জন নারী সদস্য ছিলেন। সংসদে নারী আসনের প্রবিধান যুক্ত করা হয়েছিল বাহাত্তরের সংবিধানেই। সেই সংবিধানের ৬৫ (ক) অনুচ্ছেদে দশ বছরের জন্য ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান করা হয়। প্রথম সংসদের ১৫ জন নারী এমপির সবাই আওয়ামী লীগের ছিলেন।

সংবিধানে সংশোধনী আনার মাধ্যমে দ্বিতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়ানো হয়। ফলে ঐ সংসদে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে ৩০ হয়। এই ৩০ জন নারী এমপির সবাই বিএনপির ছিলেন। একই ভাবে ৩০ জন নারী তৃতীয় সংসদেও সংরক্ষিত আসন থেকে এমপি হয়েছিলেন। চতুর্থ সংসদে সংরক্ষিত আসনে কোন নারী সদস্য ছিলেন না। কারণ সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১৯৮৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত চতুর্থ সংসদে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ আর নতুন করে বৃদ্ধি করা হয়নি।

১৯৯০ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরো দশ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। ফলে ১৯৯১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত পঞ্চম সংসদে ৩০ জন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য ছিলেন। এই সংসদে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নারী আসনে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত থাকায় ৩০টি আসনের মধ্যে বিএনপি থেকে ২৮ জন নারী ও জামায়াতে ইসলামী থেকে দুই জন নারী এমপি হন। দেশে কোন ইসলামী দল থেকে এই প্রথম বারের মতো নারী এমপি হয়ে সংসদে আসেন। অবশ্য সংরক্ষিত আসন ছাড়া এর পরে এখন পর্যন্ত কোন নারীকে কোন ইসলামী দল থেকে প্রার্থী করা হয়নি।

ষষ্ঠ সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েকদিন। এই স্বল্পস্থায়ী সংসদে বিএনপির ৩০ জন নারী সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন। একই বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ গঠিত হয়। এই সংসদে বিএনপি নারী এমপি দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ফলে ৩০ জনের মধ্যে ২৭ জন নারী এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং ৩ জন জাতীয় পার্টির।

২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অষ্টম সংসদ গঠিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখনকার বিএনপি নেতৃত্বাধিন চারদলীয় জোট সরকার শুরুর দিকে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। ২০০৪ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে আরো ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা আরো ১৫টি বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয়। আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত নারী আসনে

প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ফলে ৪৫ জন নারী এমপির মধ্যে বিএনপির ছিলেন ৩৯ জন, জামায়াতে ইসলামীর তিন জন, জাতীয় পার্টির দুই জন এবং ইসলামী ঐক্যজোটের একজন ছিলেন।

নবম সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা আরো পাঁচটি বাড়ানো হয়। তখন থেকে নারী আসনের সংখ্যা ৫০টি হয়। এই ৫০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪১ জন, বিএনপির ৫ জন, জাতীয় পার্টির ৪ জন নারী এমপি ছিলেন। দশম সংসদ নির্বাচন অনেকটা একতরফা হয়। বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এই সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে ৩৯ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৬ জন, ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে একজন, জাসদ থেকে একজন ও স্বতন্ত্র তিন জন নারী এমপি ছিলেন।

বর্তমান বাস্তবতায় নারীদের জন্য সংসদে ৫০টি আসন এখন আলংকারিক ছাড়া আর কিছুই না। এসব নারী এমপি সংসদে, রাজনীতি বা নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেন না। বাহাত্তরের সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসনের সুযোগ রাখা হয়। তখনকার প্রেক্ষাপটে নারীদের আসন সংরক্ষণের হয়তো প্রয়োজনীয়তাও ছিল। সেই প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই। কারণ, এত বছর পর এসে সংরক্ষিত আসনের যৌক্তিকতা বা এর কার্যকরিতা নিয়েও ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম হয়েছে[৩৫১]।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সংরক্ষিত নারী আসনের এমপিরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারার কথা উল্লেখ করে সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক একবার বিবিসির সাথে আলাপকালে বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক বিবেচনায় বা রাজনৈতিক পরিবার থেকেই সাধারণত সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচন করা হয়। কাজেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বা সংসদের কার্যক্রমে অবদান রাখতে পারবেন, এরকম বিবেচনায় সাধারণত সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নির্বাচন করা হয় না[৩৫২]।'

সাধারণ আসনে নির্বাচিত এমপিদের একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থাকে এবং সেই এলাকার উন্নয়ন কাজেও তারা ভূমিকা রেখে থাকেন। সেখানকার প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও তাঁকে মান্য করেন। কিন্তু

---

৩৫১. রোকেয়া কবীর, *সংসদে কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে করণীয়*, দৈনিক যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯
৩৫২. বিবিসি, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯

সংরক্ষিত আসনের নারী এমপিকে তাঁরা আমলে নিতে চান না। অনেক সময় সাধারণ আসনের নির্বাচিত এমপিও সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যকে 'উপদ্রব' মনে করেন[৩৫৩]।

সংরক্ষিত নারী আসনে নারী এমপি যে আসলেই প্রতীকি ও আলংকরিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নীতি-নির্ধারণী ফোরামে তাদের যে খুব একটা ভূমিকা নেই, ২০১৮ সালে সংসদে নারী আসনের এমপি নূর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরীর কথাতেই তা উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, 'নারীরা যোগ্য হলেও অনেক সময় মনোনয়ন দিতে চায় না দলগুলো। মনে করে নারীদের অর্থবিত্ত নেই। সংরক্ষিত আসনের এমপিদের জেলা-উপজেলা পরিষদ কোথাও কোনো দাম নেই। কোনো কাজ নেই[৩৫৪]।'

নারীসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে, তা দূরীকরণে সংরক্ষিত নারীর আসনে এমপিরা মোটেও কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। বর্তমানে ৫০টি সংরক্ষিত আসনের জন্য সদস্য নির্বাচনকে ঘিরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে অনেকে এটাকে 'মৌচাক' হিসেবে দেখছেন[৩৫৫]। মধু আহরন করা করা ছাড়া সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের আর তেমন একটা কাজ নেই। একাদশ সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য আওয়ামী লীগ যখন তাদের ৪৩টি আসনের জন্য প্রার্থীতার মনোয়ন পত্র বিক্রি করে, তখন দেড় সহস্রাধিক মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়। দেখা গেছে, বিভিন্ন পেশার কিছুসংখ্যক আগ্রহী নারীও মনোনয়ন ফরম কিনেছেন, যাদের কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিংবা সংসদ সদস্য হওয়ার কোন যোগ্যতা নেই। তাদের মধ্যে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতের বেশকিছু নারীও ছিলেন। ফলে এটা সত্য যে, বাংলাদেশের সংসদে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ নারী সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে সফল হয়নি[৩৫৬]।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে শাসনকার্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তাত্ত্বিকভাবে স্থানীয় সরকার স্থানীয় গণতন্ত্রের মাধ্যম হলেও এ প্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘকাল যাবত নারীদের প্রতিনিধিত্ব এমনকি ভোট প্রদানেরও

---

৩৫৩. প্রথম আলো, ১০ জুলাই ২০১৮

৩৫৪. প্রাগুক্ত

৩৫৫. রোকেয়া কবীর, *সংসদে কার্যকর নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে করণীয়*, প্রাগুক্ত

৩৫৬. ফেরদৌস জামান, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

অধিকার এ অঞ্চলে ছিল না[৩৫৭]। এক সময় কোন নির্বাচনেই নারীর কোন ভোটাধিকার ছিল না। স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠামোর গোড়াপত্তন হয় বৃটিশ আমলে। ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিধারি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এরপর লর্ড রিপন প্রবর্তিত ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের মাধ্যমে দ্বিবিধ পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ, মহকুমা পর্যায়ে স্থানীয় বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে বোর্ড গঠিত হয়[৩৫৮]। এসব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার শুরুতে নারীকে ভোটাধিকার দেয়নি; পরবর্তীকালে ধনী অভিজাত পরিবারভুক্ত নারীদের শর্তসাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও আইনের সংশোধনীর মাধমে আস্তে আস্তে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়; নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমদিকে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা পুরুষদের ইচ্ছায় মনোনীত হতেন। মূলত রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া তাদেরকে কার্যত পুরুষদেরই অধীনস্ত করে রাখে এবং তাদেরকে পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি[৩৫৯]। পরবর্তীতে পুরুষদের মাধ্যমে মনোনীত হওয়ার ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে নারী সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় ১৯৯৭ সাল থেকে। ২০০৯ সাল থেকে উপজেলা পরিষদেও সরাসরি নারীকে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান করা হয়। আমাদের সংসদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষণ-পদ্ধতি থাকলেও তা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। কারণ হলো পদ্ধতিটিই ত্রুটিপূর্ণ। এতে নারীর প্রতিনিধিত্ব মূলত প্রতীকী[৩৬০]।

ইসলামী দলগুলোতে নারীর বিষয়ে নেতিবাচক অবস্থান

বাংলাদেশের আলেম সমাজ এবং ইসলামী রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন নারীর ব্যাপারে বেশ কট্টরপন্থা অবলম্বন করে থাকে। নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে তাদের মোটেও আগ্রহ নেই; কোনভাবেই তারা নারীকে রাজনীতিতে ও সমাজের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠাঁই দিতে চায় না। নারী নেতৃত্ব হারাম-

---

[৩৫৭]. কে. এম. মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

[৩৫৮]. কে. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, 'ইউনিয়ন পরিষদ সমস্যা ও সম্ভাবনা', *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, একাদশ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ. ১০৮

[৩৫৯]. কে. এম. মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮

[৩৬০]. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়?*, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৮

এমন একটি ফতোয়ার উপর আমল করতে ও প্রয়োজনীয় জায়গায় বাস্তবায়ন করতে তারা বদ্ধপরিকর। এমন কট্টর ও মারাত্মক রক্ষণশীল মনোভাব প্রায় সব ক'টি ইসলামী দলেরই।

মুসলিম সমাজে ও দেশের আলেমদের মাঝে নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এই কট্টর মনোভাব বেশ পুরনো এবং এ নিয়ে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কও সৃষ্টি হয়। আমাদের এই ভূখণ্ডে নারী নেতৃত্বের বিষয়টি নিয়ে বড় ধরণের বিতর্ক হয় এবং আনুষ্ঠানিক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। সে সময় আইয়ুব খান ও তার সমর্থকেরা প্রচারণা চালিয়েছিল যে, ইসলামে নারী নেতৃত্ব জায়েজ নেই। তাদের এই প্রচারণা বেশ কাজও দিয়েছিলো।

১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী সরকার প্রধান হন। দেশের ইসলামপন্থীদের মাঝে এই নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নের উদ্রেক হয়। জামায়াতের নেতাকর্মীরা তখন যুক্তি দিতেন যে, তাদের দল নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করেনি এবং কোন নারীকে সরকার প্রধান বানায়নি; দলটি সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিয়েছে এবং বিএনপি খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ইসলামী দল বিএনপির সাথে জোট করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং ৮ম সংসদে কিছু আসনও পায়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধিন দলের সাথে অন্যকথায় খালেদা জিয়াকে জোটনেত্রী মেনে জোটে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে ইসলামপন্থীদের মাঝে বিতর্ক চলে। যেসব ইসলামী দল সেদিন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধিন জোটে অংশগ্রহণ করে, তারা নিজেদের মধ্যে এই যুক্তি দাঁড় করায় যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এটা করছেন; এবং তাদের আরেকটা যুক্তি ছিল যে, তারা বিএনপির সাথে জোট করছেন, খালেদা জিয়ার সাথে নয়; আর খালেদা জিয়া জোটের নেত্রী হলেও ইসলামী দলের নেত্রী নন; অতএব পরিস্থিতির আলোকে এটা মেনে নেওয়া যায়। অন্যদিকে, চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধিন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বিষয়টি মেনে নেয়নি। ফলে তারা জোট করে এরশাদের জাতীয় পার্টির সাথে এই যুক্তিতে যে, এরশাদ একজন পুরুষ, তাঁর সাথে জোট করা যায়। তবুও তারা এরশাদের প্রতি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যে, নারীকে নেতৃত্বে আনা যাবে না।

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন গ্রুপের সাথে সংলাপ করে। ২০১৭ সালে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ সে

সংলাপে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধিত্ব রাখার আইনি বিধানে আপত্তি জানায়[৩৬১]। সে সংলাপে জমিয়ত ১১ দফা প্রস্তাবনা পেশ করে। এই ১১ দফার দ্বিতীয় দফা ছিল রাজনৈতিক দলে নারী সদস্য বিষয়ে। জমিয়তের প্রস্তাব ছিল, 'রাজনৈতিক দল সমূহের সর্বস্তরে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, আমরা মনে করি এটা তাদের অনধিকার চর্চা। তথাকথিত অনেক প্রগতিশীল দেশেও এ ধরনের আইন নেই। দলগুলো নিজেদের স্বার্থেই শ্রেণি, পেশা ও জেন্ডার নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনতার আস্থা অর্জনে যা যা করণীয়, তা করবে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তারাও ভোটার, তাই দলগুলো নিজেদের প্রয়োজনেই নারী সদস্য করা এবং তাদেরকে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ও পদায়ন করার কাজ করবে। অন্যথায় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এ ব্যপারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অতি উৎসাহ প্রদর্শন বা অহেতুক বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রয়োজন নেই[৩৬২]।'

এখানে জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম তাদের প্রস্তাবনায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেনি কৌশলগত কারণে। কিন্তু পরোক্ষভাবে তারা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছে এবং বাস্তবেও তারা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিরোধী। তাদের দলে কোন নারী সদস্য নেই এবং কোন পর্যায়েই নেই। দলটি প্রতিষ্ঠা পায় ১৯১৯ সালে। বিগত ১০২ বছরে কখনো তারা নারীকে গ্রহণ করেনি। জমিয়তের মতো অন্য অনেক ইসলামি দলেও এমন কট্টরপন্থা বিরাজ করছে।

জামায়াতে ইসলামীও নারী নেতৃত্বের বিরোধী হলেও অনেক পরে এসে তারা খুবই সীমিত পরিসরে নারীকে রাজনীতিতে গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাদের দলে এখন নারীর যে অংশগ্রহণ আছে সেটা না থাকারই মতো। কারণ জামায়াতে ইসলামীতে যে মহিলা বিভাগ আছে, এর কার্য্যক্রম সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের মূল দলে নারীর কোনো স্থান নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কোথাও নারীর স্থান নেই মূল দলে। শুরুতে বাংলাদেশের অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের মতো জামায়াতে ইসলামীতেও নারী অন্তর্ভুক্তির কোনো সুযোগ ছিল না[৩৬৩]। অনেক পরে এসে তারা মহিলা বিভাগ গঠন করে। জামায়াতের নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

---

৩৬১. দৈনিক সমকাল, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৩৬২. এহসানুল হক জসীম, *বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০১৯), পৃ. ৩৩৭

৩৬৩. প্রাগুক্ত

সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এ কারণে জামায়াতের মহিলা বিভাগে আমীরের পদ রাখা হয়নি। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের আমীরের নেতৃত্বে মহিলা বিভাগ পরিচালিত হয়।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় মনোভাব এবং দলে সীমিত ও সংকীর্ণ পরিসরে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি রাজনীতিতে সফলতার পথে অন্যতম একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলে অনেক গবেষক ও বিশ্লেষক মনে করেন। অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ বলেন, নারী নেতৃত্বে জামায়াতের দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ বিশেষত মুসলিম নারীদের নিকট সমাদৃত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি[৩৬৪]। হাসান মোহাম্মদ এমন মন্তব্য করেছিলেন জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণা করার পর। তবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী ক্রমশ নমনীয় হচ্ছে। অন্য আরো কিছু ইসলামী সংগঠনের মধ্যে এ নমনীয় ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নামেমাত্র হলেও খেলাফত মসলিসের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৩৩ ভাগ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। অবশ্য এই দলের দলীয় কার্যক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির কোন নারী প্রতিনিধিকে দেখা যায় না।

বাংলায় মুসলিম নারীর জাগরণ

আনুপাতিক হারে কম হলেও এখন প্রায় সকল সেক্টরেই নারীর বিচরণ রয়েছে; হয়তো বা কোথাও কোথাও নারী নানা প্রতিবন্ধকারও সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে শত বছর আগেও নারীর সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেবলই গৃহ। জায়া ও জননী হিসেবে গৃহের মধ্যে নারী ছিল চরম নির্যাযিত ও নিষ্পেষিত। এই ভূ–খণ্ডের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীদের অবস্থা একই রকম শোচনীয় ছিল। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য হিন্দু নারীদের জাগরণ শুরু হওয়ার পর মুসলিম নারীর জাগরণও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষরা আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তন করে বাংলায় নারী মুক্তি আন্দোলন সূচনা করে। পুরুষদের এই আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তনের কারণ এই যে, তারা চেয়েছিলেন সংস্কারের দ্বারা নারীদের খানিকটা আধুনিক করে তুলতে[৩৬৫]। এই সূচনা হয় মূলত সুশীল সমাজ, কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি মহল থেকে। নারী জীবনের অনগ্রসরতা তথা সামাজিক জীবনের পশ্চাদপদতাই ছিলো উনিশ শতকের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের

[৩৬৪]. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, আদর্শ ও সংগঠন* (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৭

[৩৬৫]. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ১৮১

ভাবনার বিষয়[৩৬৬]। তখন শিক্ষাদীক্ষায় পুরুষও অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও নারীর মতো পুরুষের অবস্থা এতো শোচনীয় ছিল না। সে সময় শিক্ষার অধিকারসহ প্রায় সব ধরণের অধিকার থেকে নারী বঞ্চিত ছিল।

১৯০১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী, এক হাজারে একজন বাঙালি মুসলিম নারী শিক্ষিতা এবং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ১০ হাজারের মধ্যে একজন নারী ইংরেজি জানতেন[৩৬৭]। এই পরিস্থিতিতে পুরুষদের দ্বারা সূচিত নারী আন্দোলনে একটা পর্যায়ে এসে নারীরাও সাড়া দেয়। তবে শিক্ষায় চরম পশ্চাদপদতার কারণে নারী জাগরণ ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা নারীর সংখ্যা খুব একটা ছিল না। উনিশ শতকে সেই সময় অবশ্য এদেশের মানুষজনের জন্যও নবজাগরণের সময়। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটে। মূলত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিপর্ব হলো বাংলার মুসলিমদের জন্য নবজাগরণের যুগ[৩৬৮]। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম নারী জাগরণের ঢেউ লাগে। এই সময় স্বাধীকার আন্দোলন নারীদেরকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে প্রভাবিত করে[৩৬৯]। ভারতীয় উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সেই আন্দোলনে 'নারী সমাজের শৃংঙ্খল মোচনের জন্য দেশমাতার শৃংঙ্খল মোচন প্রয়োজন'- এটাই ছিল নারী আন্দোলনের সূচনা পর্বে নারী সমাজের শ্লোগান[৩৭০]।

যে শতকে মুসলিম নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে সেই উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই অমানবিক। হিন্দু সমাজে যেমন ছিল বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ প্রথার মতো অব্যবস্থা, তেমনি মুসলিম সমাজেও ছিল অবরোধ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ও তালাকপ্রথার মতো সমস্যা। শিক্ষাহীনতা তো ছিলই; অর্থনৈতিক জীবনেও নারীরা ছিল পরনির্ভর[৩৭১]। মুসলিম ও হিন্দু নারী উভয় সমাজে নারীর যখন এই শোচনীয় অবস্থা, তখন সে অবস্থার উত্তরণে হিন্দু সমাজে প্রথম নারী জাগরণের সূচনা হয় এবং হিন্দু নারীরা স্কুল যাওয়া শুরু করে। মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ঘটে হিন্দু নারীদের ৫০-৬০ বছর পরে[৩৭২]। তখন হাতে গোনা যে কজন মুসলিম মেয়ে লেখাপড়া শেখেন তারা ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। নানা বাঁধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করেই তবে তারা

---

৩৬৬. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩৬৭. শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৬৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১১

৩৬৯. অধ্যাপক মোঃ আব্‌দুল মান্‌নান ও শাসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩৭০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ৬৮

৩৭১. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩৭২. ওয়াহিদা আক্তার, *নারী জাগরণের ইতিকথা (নিবন্ধ)*, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০

লেখাপড়া শিখেছিলেন। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা প্রসার ও নারীর অধিকার আইন এসব প্রচার আন্দোলনের পুরোভাগে নারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম[৩৭৩]।

যদিও ইসলাম ধর্মে নারীশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তথাপি পর্দার নামে মেয়েদের কঠোর অবরোধের মধ্যে থাকতে হতো বলে মুসলিম সমাজে নারীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলো[৩৭৪]। এই অবস্থার উত্তরণে উনিশ শতকে পুরুষরা কাজ শুরু করলেও নারী সম্পৃক্ত হতে বেশিদিন সময় লাগেনি। একটা পর্যায়ে নারীও তার জাগরণ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে নারীর অংশগ্রহণে বাংলায় মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলন সূচিত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে[৩৭৫]। আর এই কুড়ি শতকই বাঙালি মুসলিম নারীর জীবনে প্রথম শতক, তার আগে বাঙালির ইতিহাসে মুসলিম নারী বস্তুত অনুপস্থিত[৩৭৬]।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি মুসলিম নারী প্রথম বার ঘর থেকে বেরিয়ে সমাজের প্রাঙ্গনে তার সফল পদার্পন ঘটায়। এই শতকের শুরুতে এবং তার আগের শতকের শেষ দিকে কুমিল্লার জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, খায়রুন্নেসা খাতুন, করিমুন্নেসা খানম, মিসেস এম. রহমান, নোয়াখালীর রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী প্রমুখ নারীকে আমরা দেখতে পাই যারা সাহিত্যসেবি ও সমাজসেবক, বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারীর ক্ষতায়নের জন্য এরা সবাই নারীশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। নারী শিক্ষিত হলে পরে একটা পর্যায়ে সে তার রাজনৈতিক অধিকার আদায় করে নেবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ সব ধরনের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হবে, এমন ভাবনা থেকে তখন নারীশিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুসলিম নারী জাগরণে এসব নারীর ভূমিকার ফলাফল এই ভূখণ্ডে আজকের নারীর উন্নতি। নবাব ফয়জুন্নেসা আর বেগম রোকেয়ারা সোচ্চার হয়েছিলেন বলে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিরবে-নিভৃতে অবরুদ্ধ ও নির্বাক থাকার পর কুড়ি শতকে সাধারণের মধ্যে বাঙালি নারীর প্রথম কণ্ঠস্বর শুনা গেছে। পুরুষের মতো নারীরও কিছু বলবার আছে, ঘরের

---

৩৭৩. অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান ও শাসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৩৭৪. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৭৫. শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩৭৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ* (ঢাকা: সূচীপত্র, ২০২০), পৃ. ৮৬

ভেতরে শুধু সন্তান প্রতিপালন ও রান্না বান্নায় নয়, সমাজ ও দেশের কাজেও তার মেধা ও ক্ষমতা আবশ্যক, সেটা জানা গেলো এই কুড়ি শতকে[৩৭৭]।

বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে সবার আগে আসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম। নারীকে শিক্ষা-দীক্ষাসহ নানাভাবে এগিয়ে নিতে, বিশেষ করে বন্দিনী নারীকে গৃহের কোণ থেকে বের করে নিয়ে আসতে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তিনি সবচেয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন; কিন্তু আরো আগে উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম নারী জাগরণে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। সে সময় নারী আন্দোলনে কলকাতা কেন্দ্রিক কিছু ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। সে সময়ই কলকাতার বাইরে ১৮৭৩ বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদেশে এটিই মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয়[৩৭৮]। মুসলিম মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে করা হলেও সেই বিদ্যালয়ে অন্য ধর্মের মেয়েরাও পড়তো। শুধু তাই নয়, নবাব ফয়জুন্নেসার প্রতিষ্ঠিত সেই বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই অধিক পরিমাণে পড়তো[৩৭৯]। এই কাজটি করে তিনি তৎকালীন সময়ে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

শুধু বালিকা বিদ্যালয় নয়, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী নারীদের জন্য আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ সবার জন্য কাজ করেছেন। এই কারণে কুমিল্লায় নিজ মৌজায় চারটি প্রাথমিক বালক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পশ্চিমগাঁয়ে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন[৩৮০]। তিনি মসজিদ, খানকাহও প্রতিষ্ঠা করে এবং আরো বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দিয়ে জনহিতকর কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। মূলত নবাব ফয়জুন্নেসা উনিশ শতকের সেই পূর্ববঙ্গীয় প্রতিনিধি যিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অবস্থার উন্নয়নে বিশ্বাসী ছিলেন। সকল প্রকার গোঁড়ামী সংকীর্ণতাকে পরিহার করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমাজকর্মে। নবাব ফয়জুন্নেসার জীবনই তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ[৩৮১]।

---

৩৭৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

৩৭৮. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৭৯. সোনিয়া নিশাত আমিন, *নারী ও সমাজ*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৫৯

৩৮০. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৫৩৪

৩৮১. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৩৩

এই মহিয়সী নারী বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও বাল্যবিবাহ থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন মাতা আফরান্নেছার ভূমিকায়। এদেশীয় হাজার হাজার নারী যে সময় স্বামী দেবতার খামখেয়ালীপনায় আত্মাহুতি দিচ্ছিল, সে সময়েই নবাব ফয়জুন্নেসা দৃঢ়তার সাথে আত্মোদ্ধার করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সমকালে এটি ছিল কল্পনাতীত। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ২৬ বছর বয়সে ১৮৬০ সালে গাজী চৌধুরীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়[৩৮২]। এমনকি যে মোহরানা অদ্যাবধি এদেশে কেবল ধার্য হয়, আদায় হয় না; ফয়জুন্নেসা মামলার মাধ্যমে তা-ও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন[৩৮৩]। গাজী চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে মোহরের এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি আদায় করেছেন[৩৮৪]। তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যে, অধিকার আদায়ের নারীকেই সোচ্চার হতে, প্রতিবাদী হতে হবে, বজ্রকণ্ঠে কথা বলতে হবে।

ইসলাম প্রদত্ত নারীর এই অধিকার আদায়ের জন্য যে তিনি সেই স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করার উদ্যোগ নেন, তা বুঝা যায় তাঁর সামগ্রিক কার্যক্রমে। কারণ, তখনকার সময়ে এক লক্ষ টাকা পরিমাণে অনেক বেশি হলেও নবাব ফয়জুন্নেসার জন্য এই পরিমাণ মোটেও বেশি ছিল না। কারণ তিনি জমিদার ছিলেন, তাঁর বিশাল সহায়-সম্পত্তি ছিল, কোন কিছুর কমতি ছিল না, তিনি অনেক বড় মাপের হৃদয়বান ও দানবীর ছিলেন। নিজের সম্পদ ও পকেটের টাকা খরচ করে সেই সময়ে তিনি অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন ও প্রচুর জনহিতকর কাজ করেছেন। যিনি জনহিতকর কাজে অবিরাম ব্যয় করেই যাচ্ছিলেন, এমন একজন নারীর কাছে স্বামীর মোহরানার অংশ আদায় করা কী প্রয়োজনীয় কোন ব্যাপার ছিল? হ্যাঁ, মুসলিম নারী জাগরণের জন্য এটা প্রয়োজনীয় ছিল এই কারণে, নারীকে এই কথা বুঝানোর জন্য যে, তাকে জাগতে হবে, ইসলাম প্রদত্ত তার সকল অধিকার বুঝে নিতে হবে।

বাংলায় ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে নারী শিক্ষার সামান্যই বিকাশ হয়। রক্ষণশীল হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যে অভিভাবকরা তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন, তারা তাদের একঘরে করে রাখেন[৩৮৫]। এমন প্রতিকূল অবস্থায়ও বাংলার নারীদের লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৫০-এর দশকে[৩৮৬]। সেই সময় বিদ্যালয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়েও ঘুমন্ত নারীকে জাগানোর

---

[৩৮২]. রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার, *জ্যোতির্ময়ী নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (নিবন্ধ)*, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ জানুয়ারি, ২০২০

[৩৮৩]. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[৩৮৪]. রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার, *জ্যোতির্ময়ী নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী*, প্রাগুক্ত

[৩৮৫]. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ৩৮

[৩৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

প্রয়াস চালিয়েছেন নবাব ফয়জুন্নেসা। তিনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *রূপজালাল* রচনা করে মুসলিম নারীর নবজাগরণে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। এই গ্রন্থটি ১৮৭৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার গিরিশ মুদ্রণযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়[৩৮৭]। এটিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুসলিম নারী রচিত প্রথম গ্রন্থ[৩৮৮]।

উপন্যাস গ্রন্থ *রূপজালাল* ছাড়াও নবাব ফয়জুন্নেসার আরো দু'খানি গ্রন্থ হচ্ছে, 'সংগীত সার' ও 'সংগীত লহরী'। শুধু নাম উল্লেখ ছাড়া বই দুটোর বাস্তব অস্তিত্বের কোন সন্ধান এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি[৩৮৯]। এমনো তো হতে পারে যে, সময়ের ব্যবধানে এসব গ্রন্থের কোন কপি আর অবশিষ্ট থাকেনি। তবে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর সাহিত্য প্রতিভা মূল্যায়নের জন্য তাঁর *রূপজালাল* গ্রন্থটিই যথেষ্ঠ। পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, ইসমাঈল হোসেস সিরাজী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, নওসের আলী খাঁ ইউসফজী, শেখ সোবহান প্রমুখ মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও পুরো শতাব্দীজুড়ে একজন নারী কবি ও সাহিত্যিকের নাম উল্লেখযোগ্য হিসেবে পাওয়া যায় এই নবাব ফয়জুন্নেসাকে।

অবশ্য নবাব ফয়জুন্নেসা ছাড়াও ঐ সময়কালে আরো দু'একজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, যারা মুসলিম নারী শিক্ষা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিবি তাহেরুন্নেসা ও করিমুন্নেসা খানম। তাহেরুন্নেসা মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায় না। অন্যদিকে, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদারপত্নী করিমুন্নেসা খানম ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যপ্রেমী[৩৯০]। অনেকে বলে থাকেন যে, নবাব ফয়জুন্নোর পূর্বে এই দুই জন বাঙালি মুসলিম নারী সাহিত্যিকের নাম ও তাঁদের রচিত সাহিত্য সম্পর্কে জানা গেলেও বিচারে সবদিক থেকে নবাব ফয়জুন্নেসাই বিশিষ্টতা অর্জন করে আছেন[৩৯১]।

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এই মহিয়সী নারী ইসলাম ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও নারীকে অধিকারবিহীন থাকার খুব বিরোধি ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। নবাব ফয়জুন্নেসা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রোকসানা ফেরদৌস

---

৩৮৭. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৫৮

৩৮৮. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৮৯. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩৯০. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

৩৯১. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

মজুমদার একটি নিবন্ধে লিখেন, 'ফয়জুন্নেছার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় সবসময় একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম নিষ্ঠা বিরাজ করত। তিনি শেষরাতে উঠে ওজু করে নামাজ আদায় করতেন। নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াত শেষে আটটায় নাস্তা করতেন। তারপর আটটা থেকে ১১টা পর্যন্ত জমিদারির কাজকর্ম শেষ করে অন্দর মহলের পুকুরে গোসল ও সাঁতার কাটতেন। আহারাদি ও জোহরের নামাজ সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার জমিদারির কাজ করতেন। আছরের নামাজ পড়ে কিছু সময় সাহিত্য সাধনা করতেন[৩৯২]।'

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত অনেক নারীকে অনেকে পর্দাপ্রথার বিরোধি হিসেবে দাঁড় করান। আসলে এমন নয়। এসব মহিয়সী নারী পর্দাপ্রথার অপব্যবহার ও এটাকে কেন্দ্র করে নারীকে অবরোধ করে রাখা এবং ইসলাম প্রদত্ত সুযোগ-সুবিদাসমূহ থেকে বঞ্চিত রাখার বিরোধি ছিলেন। নবাব ফয়জুন্নেসাও এমনই একজন ছিলেন, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক থাকার পাশাপাশি পর্দা মেইনটেইন করেই বিভিন্ন কার্য্যক্রমে জড়িয়েছেন। একজন গবেষক লিখেন, 'নবাব ফয়জুন্নেসা জমিদারী পরিচালনা করেছেন, নারী-পুরুষ সব ধরনের প্রজাদের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখতেন; তবে তিনি পর্দার খেলাপ করেননি; তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যসেবী[৩৯৩]।' শালীনতা বজায় রেখেই ইসলামের বিধি-বিধান মেনেই থেকেছেন মুক্ত আলো-বাতাসের সংস্পর্শে। নবাব ফয়জুন্নেসা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামের সঠিক অনুধাবনের অভাবে নারী বঞ্চিত হচ্ছে ও বঞ্চিত করা হচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারীকে বহিঃস্থ কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেনি; মুসলিম সমাজে গোঁড়ামীর কারণে এমনটি করা হয়।

উনিশ শতকে মুসলিম নারী জাগরণে নবাব ফয়জুন্নেসারা এগিয়ে এলেও সামগ্রিক দিক বিচারে বাংলার মুসলিম নারী জেগে ওঠার ক্ষেত্রে ১৯২০-এর দশকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় মুসলিম সমাজের অনেক নারী ও তরুণী সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার বিশেষ করে নারীর অধিকার অর্জনের জন্য সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা উপেক্ষা করে অন্দর থেকে বাইরে বেরুনোর উদ্যোগ নেন। পত্র-পত্রিকার লেখালেখির মাধ্যমে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখেন[৩৯৪]। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে শিক্ষিত মুসলিমগণ নারীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন[৩৯৫]। বিশ শতকের গোঁড়ার দিকে নারী জাগরণের ঢেউ তৈরী হওয়ার ক্ষেত্রে নবাব ফয়জুন্নেসাদের ভূমিকা রয়েছে; কারণ নারীকে জেগে উঠার জন্য উনিশ শতকের শেষ দিকেই তারা জোরালো আহ্বান জানিয়ে গেছেন; নবাব ফয়জুন্নেসা বিশ শতকের বিশের

---

৩৯২. রোকসানা ফেরদৌস মজুমদার, *জ্যোতির্ময়ী নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী*, প্রাগুক্ত

৩৯৩. রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩৯৪. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩৯৫. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

দশকে নারী জাগরণের জন্য উনিশ শতকের শেষ দিকে মুয়াজ্জিনের ভূমিকা পালন করে আযান দিয়ে গেছেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনেরও আবির্ভাব এই ১৯২০-এর দশকে। তিনি শুধু মুসলিম নারীই নয়, বাংলার পুরো নারী সমাজের মুক্তির দিশারী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন[৩৯৬]।

বেগম রোকেয়া মেয়েদের জন্য রোকেয়া-সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। নারী জাগরণের জন্য তিনি সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং নারীদের জন্য কাজ করার নিমিত্তে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামে ১৯১৬ সালে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষার বিকল্প নেই, এই চিন্তা থেকে তিনি নারী শিক্ষার প্রসারে বেশ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৭ সালে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত এক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তব্য রেখে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেন[৩৯৭]। অবশ্য তখন সমাজপতিদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন[৩৯৮]।

বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত এই কারণে যে, তিনি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও নিজ চেষ্টা, সাধনা এবং একাগ্রতা দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ও সময়কে অতিক্রম করেছিলেন[৩৯৯]। তিনি ছিলেন সমকালের সবচাইতে অগ্রগামী নারী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে মোতাহার হোসেন সুফী মন্তব্য করেন, 'সমাজের নানাবিধ কুপ্রথা, কূপমণ্ডুকতা ও স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার মুসলিম নারী সমাজকে জাগরণের মন্ত্রে তিনিই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন[৪০০]।'

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লেখালেখি ও সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে নারীর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাংলার ঘুমন্ত মুসলিম নারীকে জাগাতে চেয়েছিলেন, অধিকারহীন সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তার ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে কট্টরপন্থা, গোঁড়ামী এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অপব্যাখা পরিহার করে ইসলাম প্রদত্ত নারীর প্রকৃত অধিকারগুলো বাস্তবতার আলোকে উদার পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইসলামের মূল চেতনাকে ধারণ করে তিনি নারী ইস্যুতে অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

---

৩৯৬. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩৯৭. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬

৩৯৮. ওয়াহিদা আক্তার, *নারী জাগরণের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত

৩৯৯. অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ও শামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

৪০০. মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ৩২

নারী ইস্যুতে তাঁর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মতিচুর (১৯০৪), Sultana's Dream (১৯০৫), অবরোধবাসিনী (১৯২৮) ইত্যাদি।

বেগম রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধসমূহে নারীর উন্নয়ন, জাগরণ ও শিক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর লেখনির মূল উদ্দেশ্যই ছিল নারী ও তার ক্ষমতায়ন। বেগম রোকেয়ার সমগ্র চিন্তায় ও কর্মে ছিল নারী জাতির উন্নয়ন প্রসঙ্গ। তাঁর সমস্ত মেধা জুড়েই এই বিষয়টি স্থান পেয়েছে। অন্যকিছু তিনি খুব একটা ভাবার সময়ই পাননি। আব্দুল মান্নান সৈয়দ লিখেন, প্রাবন্ধিক বা মানবিক ধর্ম তো রোকেয়ার সহজাত। ফলে তাঁর সব রচনার মধ্যে থাকে চিন্তার শিরদাঁড়া[৪০১]। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাতও হয়েছিল নারী জাগরণ নিয়ে। ১৯০৪ সালে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম *আমাদের অবনতি* শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে সমাজে নারীর অসম অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান[৪০২]।

কেউ কেউ মনে করেন, বেগম রোকেয়া ইসলামের পর্দার বিধানের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন, ইসলাম-বিরোধি মানসিকতার অধিকারী ছিলেন এবং পর্দার কারণে নারীসমাজ পিছিয়ে আছে বলে রোকেয়ার পর্যবেক্ষণ। তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। বেগম রোকেয়া ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ছিলেন। ইসলামের আসল পর্দার বিধানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পর্দাপ্রথার নামে মুসলিম সমাজে যে গোঁড়ামী এবং ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে সামগ্রিকভাবে মুসলিম নারী যে পিছিয়ে পড়েছিল, রোকেয়া পর্দার এই অপব্যবহার ও অররোধপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সোজা কথায়, পর্দাপ্রথাসহ ইসলামের কোন বিধানের বিরুদ্ধে নয়; বেগম রোকেয়া ছিলেন কট্টরপন্থা, গোঁড়ামী, পশ্চাদপদতা এবং ধর্মের অপব্যাখা ও অপব্যবহারের ঘোর বিরোধী। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর একজন একান্ত সচিব (অতিরিক্ত সচিব) ওয়াহিদা আক্তারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি একটি নিবন্ধে লিখেন, 'তাঁর (রোকেয়া) সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি ইসলাম ধর্মের কোনো বিষয়ে কটূক্তি না করে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি বিরূপ সমালোচনা না করে কঠোর পর্দাপ্রথা যে নারীর জীবনের দুর্দশার কারণ হচ্ছে তা উল্লেখ করেন[৪০৩]।'

বেগম রোকেয়া *বোরকা* প্রবন্ধে পর্দা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। পর্দা অর্থে তিনি সুরুচি ও শালীনতা বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যারা ঘরের ভেতরে থেকে চাকরদের সম্মুখে অর্ধ নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাদের অপেক্ষা

---

৪০১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬), পৃ. ৫৭

৪০২. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০

৪০৩. ওয়াহিদা আক্তার, *নারী জাগরণের ইতিকথা (নিবন্ধ)*, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০

যারা ভাল পোশাক পরে মাঠে বাজারে বের হন, তাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়[৪০৪]। তাঁর এই অভিমত পর্দা-বিরোধী কোন বক্তব্য নয়; পর্দার অপপ্রয়োগ বিরোধি। অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বেগম রোকেয়ার কোন অভিমত এবং মন্তব্য ইসলামের মূল বক্তব্যের বিরোধি নয়; হতে পারে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের অনেকের চিন্তার বিরোধি।

পর্দা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, *বোরকা* প্রবন্ধে প্রদত্ত বেগম রোকেয়ার অভিমত তারই একটা প্রতিফলন। পর্দা মানে যদি শালীনতা হয়, সেই শালীনতা বাড়ির অভ্যন্তরেও করার নিয়ম। চাকর যদি পুরুষ হয়, তাহলে সেই পুরুষের সামনে অর্ধনগ্ন হওয়া পর্দার বিধানের সম্পূর্ণ খেলাফ। অন্যদিকে, ইসলাম নারীকে বাইরে কার্য্যক্রমে অংগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। পর্দার নামে অবরোধ আরোপ করে নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রাখার কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও বলা হয়নি। সেই কথাগুলোই বেগম রোকেয়ার লেখনিতে প্রতিবাদী কণ্ঠে এসেছে। সভ্যতার সাথে তিনি পর্দা প্রথার বিরোধ মোটেও দেখতে পাননি, পর্দার সাথে তিনি উন্নতিরও বিরোধ দেখতে পাননি। তিনি পর্দা প্রথার কঠোরতার বিরোধিতা করেন। অন্যায় পর্দা ছেড়ে আবশ্যকীয় পর্দা গ্রহণের পক্ষে তিনি ছিলেন[৪০৫]। বেগম রোকেয়া যে পর্দার কথা বলছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পর্দাও সেটা।

উনিশ শতকের পুরোটা জুড়ে আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলিম নারী সমাজ কঠোর পর্দা প্রথার সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পৌছে এবং এটাকেই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়। গোলাম মুরশিদ লিখেন, 'উনিশ শতকের বাঙালি নারীরা সম্ভবত সবচেয়ে কঠোর ও ভয়ানক ধরনের পর্দা প্রথার শিকার হন[৪০৬]।' এমন কঠোর পর্দাপ্রথার কারণে নিম্নশ্রেণীর নারীদের অবস্থা তুলনামূলক উন্নত ছিলো; অন্তত উচ্চশ্রেণীর নারীদের মতো তারা অন্তঃপুরে বন্দি ছিলেন না। কারণ, উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে পর্দার কঠোরতা ছিল আরো বেশি। এসব পরিবারের ছোট ছোট মেয়েদেরও পর্দার বিধান মেনে চলতে হতো। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এমন অযৌক্তিক পর্দাপ্রথাকে মেনে নিতে পারেননি। সেটার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন, প্রকৃত পর্দা ও হিজাবের বিরুদ্ধে নয়।

নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণকারী রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী কুড়ি শতকের শুরুর দিকের একজন শক্তিমান মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক। এই মহিয়সী নারীও বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের একজন অগ্রদূত। মুসলিম নারী শিক্ষাসহ

---

৪০৪. শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৪০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৪০৬. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী* (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৯), পৃ. ৬৫

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতায় তাঁর মন পীড়ায় উদ্বিগ্ন থাকতো। তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি লিখেছেন। রাজিয়া খাতুন চৌধুরানীর নারী সমাজের অবস্থা সম্পর্কিত প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে 'সমাজ ও গৃহে নারীর স্থান', 'নারীর কথা', 'পর্দা ও অবরোধ', 'ইসলামে নারীর স্থান', 'মায়ের শিক্ষা' ইত্যাদি। এসব প্রবন্ধে তিনি নারী সমাজের উন্নয়নে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। ভুলব্যাখা ও অপব্যাখার বিপরীতে কুরআন-হাদীসের সঠিক উপলব্ধি এবং ইসলামের নারী সংক্রান্ত বাণীগুলোর যথার্থ ও বাস্তবস্মত উপলব্ধির মধ্যে তিনি নারীর মুক্তি খুঁজেছেন। 'ইসলামে নারীর স্থান' প্রবন্ধে তিনি লিখেন, ইসলামই নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে অন্য ধর্মের সঙ্গেও তুলনা করেছেন[৪০৭]।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার নামে যে অবরোধ প্রথা চালু ছিল এবং পর্দার দোহাই দিয়ে নারীকে যে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল; এসব দিকও ফুটে উঠেছে রাজিয়া খাতুনের লেখায়। অবরোধ প্রথাকে পর্দাপ্রথা হিসেবে গ্রহণ না করে তিনি অবরোধ প্রথা ও বাল্য বিবাহকে নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় মনে করেন[৪০৮]। নারী শিক্ষার মধ্যে তিনি নারীর মুক্তি খুঁজেছেন এবং নারীশিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বিভিন্ন লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মায়ের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি মায়েদের শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে পুত্রের চেয়ে কন্যার বেশি সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন এবং সমাজের মঙ্গলের নিমিত্তে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার[৪০৯]।

অবরোধ প্রথার ঘোর বিরোধি এই কবি নারীবাদ ও নারী স্বাধীনতার জিগির তুলে নারীকে পণ্য বানানোর বিরোধিতা করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত বিধানের মধ্যে তিনি নারীর উন্নতির মন্ত্র পেয়েছেন। আর তাইতো *নারী ধর্ম* গল্পে রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী[৪১০] তথাকথিত নারীবাদ ও নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারের দিকগুলো তুলে

---

৪০৭. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৪০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৪০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৪১০. 'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা..' - বাংলা সাহিত্যের এই অমর কবিতাটির রচয়িতা হচ্ছেন কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী। তিনি নোয়াখালী জেলার হরিরামপুর গ্রামে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ২৭ বছর বয়সে ১৯৩৪ সালে মারা যান। এই অল্পজীবনে তিনি বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কুমিল্লার নামকরা রাজনীতিবিদ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, যিনি এক সময় অবিভক্ত পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মেয়ে বেগম রাবেয়া চৌধুরী দেশের একজন প্রখ্যাত নারী রাজনীতিবিদ, যিনি এখন বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান পদে থাকলেও বয়সের কারণে কার্য্যক্রমে খুব একটা নেই। ৯০ বছর বয়সী রাবেয়া চৌধুরী সংরক্ষিত নারী আসন থেকে কয়েক বার এমপি হয়েছিলেন। তাঁকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের রেখে তাঁর মা রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী মারা যান।

ধরেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন, গোঁড়ামী ও ধর্মের অপব্যবহারের কারণে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা বা অন্য কারো দ্বারে যাবার প্রয়োজন নেই; ইসলামকে সঠিকভাবে উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে সমাধান।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে আরো কিছু নারী মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। খুজিস্তা আক্তার বানুও তাদেরই একজন। ১৯০৯ সালে তিনি 'সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন[৪১১]। পাবনা জেলার অধিবাসী মুনশী মেহেরুল্লাহর কন্যা খায়রুন্নেসাও এই সময় মুসলিম নারী জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এই মুসলিম নারী সাহিত্যিক নারীর জন্য কলম ধরেছিলেন এবং গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বেগম রোকেয়ার মতো তিনিও নারীশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর *সতির পতি* গ্রন্থে সমাজের অনুন্নত ব্যবস্থার জন্য নারী শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। নারী শিক্ষার সমর্থক হলেও খায়রুন্নেসা মা ও স্ত্রী রূপে নারীর চিরাচরিত ভূমিকার উপরেই জোর দিয়েছেন[৪১২]। তিনি মনে করতেন, একজন ভাল মা ও একজন ভাল স্ত্রী হওয়ার জন্য নারীর জন্য শিক্ষা অপরিহার্য।

খায়রুন্নেসার চিন্তা-চেতনায় বুঝা যায়, তিনি ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। মুসলিম সমাজে গোঁড়ামী ও ইসলামের সঠিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত থাকায় পর্দাপ্রথার নাম করে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। ১৯০৪ সালে নবনূর পত্রিকায় মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নতিকল্পে কিছু সুপারিশ করেন। সুপারিশের মধ্যে তিনি ইসলামের পর্দার বিধানকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে পর্দাপ্রথা অনুসরণ করে মুসলিম বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলেন[৪১৩]।

মুসলিম নারীর নবজাগরণে ১৯২০-এর দশকের আরেক সংগ্রামী নারী হচ্ছেন মিসেস এম. রহমান। সমসাময়িক অন্যান্য মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত নারীদের মতো তিনিও লেখালেখির মধ্য দিয়ে নারীকে জাগাতে চেয়েছেন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নারীর প্রতি চলে আসা দীর্ঘদিনের বৈষম্য দুর করতে তিনি ছিলেন বেশ সোচ্চার। তাঁর রচনার বিষয় ছিল নারীর দৈন্যদশা। তাঁর *চানাচুর* গ্রন্থটিতে নারীর শিক্ষা, নারীর দৈন্যতা প্রভৃতি

---

৪১১. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১

৪১২. শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৯৮-৯৯

৪১৩. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪২

বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে[৪১৪]। তাঁর *বাড়বানল* প্রবন্ধে ভারতের মুক্তির লক্ষ্যে নারী সমাজকে আহ্বান জানান, অন্যায়, অশুভ, ভণ্ডামী ও পাশবিকতার মুখে আগুন ধরিয়ে দিতে[৪১৫]।

মিসেস এম. রহমান[৪১৬] তাঁর প্রবন্ধে ধর্মের ভণ্ডামী, গোঁড়া কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা বজ্রনির্ঘোষ, বিদ্রোহী নারীর আক্রোশ ভরা। সমাজের অনিয়ম দূর করে সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান রয়েছে এতে[৪১৭]। তাঁর প্রবন্ধসমূহে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী সত্তার প্রভাব পড়েছে। আমাদের জাতীয় কবি মিসেস এম. রহমানকে মা বলে সম্বোধন করতেন[৪১৮]। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিষের বাঁশি কাব্যগন্থের উৎসর্গে লেখিকাকে 'নাগমাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি কবিতাও রচনা করেছেন এবং তাঁর কবিতার মধ্যেও কাজী নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার প্রভাব রয়েছে। 'মোহররম' শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতায় তাঁর ইসলামী ভাবাদর্শ এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীরতার ছাপ পাওয়া যায়। মিসেস এম. রহমান লিখেন, 'মোহররমের চাঁদ ওঠার তো আজিও অনেক দেরি/ কোন কারবালা-মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি/ ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে/ নিখিল-এতিম ভিড় ক'রে কাঁদে আমার মানিস-লোকে! মর্সিয়া-খান গা'সনে অকালে মর্সিয়া-শোকগীতি, সর্বহারার অশ্রু প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি!.....'

মিসেস এম. রহমান একজন আধুনিক ধার্মিক মুসলিমের অবস্থানে থেকে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, কন্যার শিক্ষার জন্য পিতাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। তিনি তাঁর এক লেখায় নারীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদেশ ও ইসলামের শাসন শিরোধার্য করে নেবো; তবে পদদলিত করে যাবো অন্যায় অধর্মরূপ সমাজের নিয়ম-কানুন[৪১৯]। তাঁর এই কথা থেকে বুঝা যায়, তিনি ইসলামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন; কিন্তু ধর্মান্ধতা বিরোধি ছিলেন। স্বার্থান্বেষী ধর্মান্ধরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী অবরোধে বন্দি রাখে, তিনি এটার অবসান চেয়েছেন।

---

৪১৪. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৪১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪১৬. তাঁর নাম ছিল মাসুদা খাতুন। স্বামী মাহমুদুর রহমান ছিলেন কলকাতার রেজিস্ট্রার। মাসুদা খাতুন তাঁর স্বামীর নামের শেষ অংশের সাথে মিলিয়ে মিসেস এম. রহমান ছদ্মনামে লিখতেন এবং শেষ পর্যন্ত এই নামে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। মাসুদা খাতুন হুগলী জেলার আরামবাগের শেখপুরে ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৬ সালে মারা যান। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কাজী নজরুল খুব শোকাহত হয়েছিলেন।

৪১৭. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৪১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৪১৯. ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৮

মিসেস এম. রহমান অবরোধ ও পর্দা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পর্দার দোহাই দিয়ে নারীকে বঞ্চিত করায় কেবল নারী নয়, সমগ্র মুসলিম জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৪২০]। এই কথায় তাঁর পর্দাপ্রথা বিরোধি মনোভাব ফুটে উঠে না; অবরোধ প্রথার বিধোধি মনোভাব ফুটে উঠে। সে সময়ে পর্দার আসল মর্ম পরিত্যাগ করে পর্দাপ্রথার নাম করে মুসলিম নারীকে অবরোধ করে রাখা হতো। আর তাইতো এই নারী লেখকের মতে, পর্দা রক্ষার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বোরকার বিরুদ্ধে কথা বলা আর পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলা এক জিনিস নয়। বোরকার উৎপত্তি ইসলামী সমাজে নয়; এটা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ও পারস্য সভ্যতা থেকে যে এসেছে, তা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মিসেম এম. রহমানের আবরু রক্ষাকারী পোশাক আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে, তখনকার সমাজে নারীরা যে পোশাক পরতো, তাতে আবরু ও লজ্জাস্থান ঠিকমতো গোপন রাখা যেতো না। চরম বাজে ও অসুন্দর পোশাকের কারণে নারীরা কোন কারণে বাইরে হলে বোরকা না পরলে উপায় ছিল না; না হয় তাকে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় দেখা যেতো। তখন বাংলাদেশের নারীরা একমাত্র শাড়ি পরতো। লম্বা শাড়ি পরলেও প্রকৃত পক্ষে বাঙালি নারীরা প্রায় উলঙ্গই থাকতেন এবং এরূপ পোশাক জনসমুক্ষে পরার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়[৪২১]।

অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাইরে বের হলে বোরকা পরার পাশাপাশি অনেক পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধও নারীকে বোরকা পরতে বাধ্য করতো। মিসেম এম. রহমান লিখেন, নারীদের নির্ভয়ে চলাচল করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হলো পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি। লেখিকা বলেন, পুরুষের পশুত্ব যখন দায়ী, তখন অবরোধের দরকার কার? হিংস্র পশুকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা হয় না মানুষকে? কয়েদি করে রেখে যে সতীত্ব বজায় রাখতে হয়, সে সতীত্বে মূল্য কী[৪২২]?

নবাব ফয়জুন্নেসা, বেগম রোকেয়া, কবি রাজিয়া খাতুন, মিসেস এম. রহমানসহ উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের শুরুর দিকে কিছু প্রতিভাময়ী মুসলিম নারীর নাম আলোচনায় থাকলেও একজনের নাম অনেকটা আড়ালে থেকে গেছে। বহু নারীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, অনেক গবেষণা হয়েছে, বহু নারীবাদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এই নারী কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধে উল্লেখিত হননি। দীর্ঘদিন পর সাম্প্রতিক সময়ে সেই নারীকে নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে দেখা গেছে। তিনি হচ্ছেন রেজিয়া খান।

---

৪২০. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪২১. গোলাম মুরশিদ, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৪২২. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

মাত্র ১৭ বছর বয়সে এই মেধাবী কবি, নারীবাদী লেখিকা ও রাজনীতি সচেতন নারীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর *সওগাত* পত্রিকা (ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যা) তুলে ধরে, তিনি 'অতুলনীয় বুদ্ধিমতি ও রাজনীতিকা' ছিলেন[৪২৩]। খুবই অল্পবয়সে এই নারী ও তাঁর বড় বোন রহিমা খাতুন গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১০ সালের ১৭ মার্চ খুলনা শহরের টুটপাড়া এলাকায় এই নারীর জন্ম হয়[৪২৪]। পশ্চাৎপদ মেয়েদের জন্য রেজিয়া খাতুনের অসামান্য আগ্রহ ও উদ্যোগ ছিল। তিনি নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়ে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বপক্ষে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। লেখালেখির মাধ্যমেও তিনি নারীর উন্নতি-অগ্রগতির জন্য ছিলেন সোচ্চার।

বিভিন্ন আন্দোলনে বাংলাদেশের নারীসমাজ

সামগ্রিকভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হলেও এই ভূ-খণ্ডে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রাজনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের পথে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। সংখ্যায় কম হলেও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের পথ ধরে বাংলাদেশে আস্তে আস্তে রাজনীতিতে নারীর আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বেড়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে নারী জাগরণের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণেরও সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিটি পর্যায়ে নারীদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ এই উপমহাদেশে নারী জাগরণ ত্বরান্বিত করেছিল[৪২৫]। নারীর রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৫২ একটি উল্লেখযোগ্য সাল। এই সনে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। সেই আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি কিছু ছাত্রীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে প্রথম ব্যারিকেড ভঙ্গ করে মিছিলকারীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রওশন আরা বাচ্চুও ছিলেন। সেই মিছিলে পুলিশের গুলি হয় এবং রচিত হয় রক্তে রাঙানো অমর অধ্যায়। একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন মুলতবির দাবিতে বিরোধী দলের নেতা মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের সাথে একমাত্র বিরোধীদলীয় নারী সংসদ সদস্য আনোয়ারা বেগমও অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন।

---

৪২৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪২৪. প্রাগুক্ত

৪২৫. শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে ১৪ জন নারী আইন পরিষদে নির্বাচিত হন[৪২৬]। ১৯৫৫ সালের নভেম্বরে আইন পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য নূরজাহান মুরশিদ, রাজিয়া বানু ও বেগম দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়[৪২৭]।

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কিছু নারীর রয়েছে সংগ্রামী ভূমিকা। আমেনা আহমেদ নামে একজন নারী রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি আজ অনেকটা বিস্মৃত। ছয়-দফার আন্দোলনের একটা পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান রহমান যখন জেলে যান, তখন দলটির হাল ধরেছিলেন আমেনা। মতিয়া চৌধুরীরা সে সময় বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

৪২৬. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা (নিবন্ধ)*, দৈনিক সমকাল, ২৭ অক্টোবর ২০২০

৪২৭. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯), পৃ. ১৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যাপারে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে শর্ত অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তেমন কোনো সুফল আসেনি। কোন একটি দলও কমিটিগুলোতে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। এমন শর্ত জুড়ে দেওয়ার পরও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও আগ্রহ কোনটাই বাড়েনি। বরং আগ্রহে আরো ভাটা পড়েছে, যদিও সংসদের সাধারণ আসনে ও সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্য সংখ্যা বেড়েছে; এটা প্রতীকি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে, যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্যাপ্ত যদিও নয়, সরকারী ও বেসরকারী নানা উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ জীবনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কিছুটা হলেও সাফল্য এসেছিল। ২০০৮ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের আগেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার আগের চাইতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছিল; তবে এ অংশগ্রহণ সাধারণ পর্যায়ে যতটা বেড়েছে, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ততটা বাড়েনি। শিক্ষকতা, ওকালতি, প্রশাসন, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, রাজনীতিতে সেই হারে বাড়েনি। তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে, অতীতের চাইতে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিতে নারীর সংখ্যা বাড়লেও সাম্প্রতিক সময়ের চাইতে ইদানিং বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও আগ্রহ কমেছে।

তৃণমূলের রাজনীতির জন্য স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকারের যে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে তৃণমূলে কাজ করে, সেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে ১৯৯৭ সালে প্রত্যক্ষ নির্বাচন চালুর পর প্রতিবারই নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমছে এবং ১৯ বছরের ব্যবধানে নারী প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর সংখ্যা ৫৬ শতাংশ কমেছে। ১৯৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ, সাধারণ সদস্য পদ এবং সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য পদে মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৯০,০০০ (নব্বই হাজার)। ২০০৩ সালের ইউপি নির্বাচনে সে সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,৬৭৬ জনে, ২০১১ সালে ৪৬,২০০ জনে এবং ২০১৬ সালে ইউপি নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৯,৫৩০ জন[৪২৮]। ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছিলেন ২২৬ জন,

[৪২৮]. 9th (2016) UP Election Observation Report (prepared by Democracy Watch)

জয়ী হন ২৩ জন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যানের সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি; প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউপিতে ২৯ জন নারী চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হন।

উপজেলা পরিষদে ২০০৯ সালে প্রথম বারের মতো নারী ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৯০০-এর একটু বেশি। ২০১৪ সালে ৪৫৮টি উপজেলা নির্বাচনে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫০৭ জনে[৪২৯]। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছরে উপজেলা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কমেছে প্রায় ৫০ শতাংশ। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হার আরো কমেছে। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে মাত্র ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ নারী মেয়র পদে জয়লাভ করেন।

নির্বাচন ও রাজনীতির প্রতি নারীর আগ্রহ কমছে কেন? ২০১৪ সালের উপজেলা নির্বাচনের নির্বাচনের পর রাজধানীতে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁধাকে দায়ী করেন[৪৩০]। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে আরো বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা তুলে ধরা হলো:

১. পারিবারের অনাগ্রহ ও চাপ
২. সাংসারিক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা
৩. নারীর নিজেরও আগ্রহের ঘাটতি
৪. দরিদ্রতা
৫. আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা
৬. পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পেশীশক্তির প্রভাব
৭. ধর্মের অপব্যাখা, কট্টরপন্থা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা
৮. পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধ
৯. সহিংসতা
১০. আইনগত সীমাবদ্ধতা

[৪২৯]. সূত্র: নির্বাচন কমিশন
[৪৩০]. বিডিনিউজ, ১৩ মে ২০১৪ (https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article785991.bdnews)

১১. পরিবারতন্ত্র

১২. নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি

১৩. রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব

পরিবারের অনাগ্রহ ও চাপ

একজন মানুষ তথা একজন নারী সমাজের বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে মেলে ধরার আগে নিজের পরিবারেই আগে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায় কিংবা এখানেই প্রথমে বাঁধাগ্রস্ত হয়। সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা আইনগতভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ার আগে যদি কোন নারীর পরিবার তার অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে কোন নারীর রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে জড়ানোর সুযোগ বেশ কঠিন হয়ে যায়। কদাচিৎ হয়তো কেউ কেউ বিদ্রোহী ও বিপ্লবী হয়ে সুযোগ আদায় করে নেয়; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। সিমোন দ্য বোভ্যয়ার[৪৩১] যেমনটি বলেন, একটা মেয়ের আশেপাশের সবকিছু একথা বুঝাতে সাহায্য করে যে, মেয়েরা আসলেই পুরুষের পোষ্য। এমনকি পিতামাতাও বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে একথা বুঝাতে সচেষ্ট থাকেন[৪৩২]।

নারীবিদ্বেষী সমাজ এবং আরো বিভিন্ন বৈরিতার মাঝে আমাদের দেশে একজন নারীর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া পরিবারের দিক থেকে অনেক বেশি কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। পরিবারের অনাগ্রহের কারণে অনেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চিন্তা করতে পারে না। আবার অনেকে চিন্তা করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত পরিবারের চাপের কারণে তার আর রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া হয়ে ওঠে না। শিক্ষা গ্রহণের ফলে অনেক সময় অনেক যোগ্য নারী রাজনীতিতে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, সে ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তার পরিবার[৪৩৩]। কারণ অনেক পরিবার নারী সদস্যকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলেও রাজনীতি করা সুযোগ দিতে চায় না। এই বিষয়ে প্রয়োজনে অনেক পরিবার বেশ চাপও সৃষ্টি করেন। এই কারণে বাংলাদেশের নারীরা বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলেও আমাদের সমাজে তারা এখনো ব্যাপকভাবে বঞ্চিত, নিগৃহীত, নির্যাতিত ও অবহেলিত[৪৩৪]।

---

৪৩১. ফরাসি নারীবাদী সিমন দ্য বোভ্যয়ার বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনের পুরোধা। তাঁর পুরো নাম Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, জন্ম ১৯০৮ সালের ৯ জানুয়ারি এবং মৃত্যু ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল। তিনি দর্শন, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়ালির উপর প্রচুর লেখালেখি করেন ও গ্রন্থ রচনা করেন। সারাজীবন অবিবাহিত এই নারীর *'দ্য সেকেন্ড সেক্স'* গ্রন্থটি বিশ্ব জুড়ে তাঁর অনন্য খ্যাতি এনে দেয়। গ্রন্থটি নারীরাদের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

৪৩২. সিমোন দ্য বোভ্যয়ার, *সেকেন্ড সেক্স*, ফয়সল মোকাম্মেল অনূদিত (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১৮), পৃ. ১৬

৪৩৩. রুমিন ফারহানা, *যোগ্য নারীদের রাজনীতিতে আসার পথ রুদ্ধ করছে যারা*, দৈনিক যুগান্তর, ১০ মার্চ ২০২০

৪৩৪. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়?*, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৮

বাংলাদেশের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর কারণে বৈষম্যের শিকার হয়ে অসংখ্য নারী শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। শুরুতেই যদি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে একজন নারী বঞ্চিত হয়, তাহলে রাজনীতিতে তার পা রাখার সুযোগ কই? ফলে নারী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ হারায়, রাজনীতিতে আগমনের সুযোগ পায় না এবং পুরুষের অধিনস্থ হয়েই তাকে থাকতে হয়। মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একটি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিলেন প্রথমে ভাইয়ের এবং পরে তাঁর উচ্চশিক্ষিত স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায়। রক্ষণশীল পরিবার পুরোপুরী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে বেগম রোকেয়া কি এতদূর হাঁটতে পারতেন?

বাংলাদেশের নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কাঙ্খিত পরিস্থিতির অনেক নিচে, কারণ এটি অনেকাংশেই পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এমনটি শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর অপরাপর বহু দেশেও। সাংসারিক জীবনে পদার্পনের পর অনেক নারীর রাজনীতিতে যোগ দেবার সম্ভাবনা কম। কেননা, রাজনীতিতে মেয়েদের পুরুষ কর্তৃক প্রত্যাখানমূলক পরিস্থিতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান[৪৩৫]। ফলে বিবাহিত জীবনে বহু নারী রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়।

দেশের খ্যাতিমান চিত্রনায়িকা সারাহ বেগম কবরীর তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে দীর্ঘ ৩০ বছরের দাম্পত্য জীবন ২০০৮ সালে ভেঙে যায় রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। সে বছর অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনে নারায়নগঞ্জ-৪ আসনে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান ও বিজয়ী হন। এই মনোনয়ন লাভকে কেন্দ্র করে স্বামীর সাথে মনোমালিণ্যের কারণে স্বামী শফিউদ্দীন সারোয়ার কবরীকে তালাক দেন। কবরী তখন নিজেই সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের নমিনেশন পাওয়ায় তাঁকে তাঁর স্বামী তালাক দেন। (Reason behind the divorce is I've got the Awami League's nomination.[৪৩৬])

একথা বলতেই হয় যে, বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো তেমন একটা হয়নি; যতটুকু হয়েছে তা আশানুরূপ নয়। নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত নারী শিক্ষা এবং এই জায়গায় নারীর উন্নতি হয়েছে। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর উপস্থিতি বেড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার

[৪৩৫]. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, নূরুল ইসলাম খান অনূদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১), পৃ. ৭৪
[৪৩৬]. UNB, Daily Star, November 20, 2008

স্তরগুলোতে নারী এখানো পিছিয়ে রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে পুরুষ পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণের কারণে নারীর অবাধ মুক্ত বিচরণ মেনে নেয় না। আর এই পশ্চাৎপদতা কার্যকরভাবে অবসান করতে হলে প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন[৪৩৭]।

সাংসারিক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা

নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টা ও অবদানে মানবসভ্যতা গতিশীল রয়েছে। পুরুষ একটা ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে, তো আরেক ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে নারী। পুরুষের জীবনে যেমন পুত্র, স্বামী, বাবা ইত্যাদি অধ্যায় রয়েছে; তেমনি নারীর জীবনে কন্যা, স্ত্রী, মা অধ্যায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। প্রকৃতিগত কারণে পুরুষরা সাধারণত উপার্জনমুখী, আর নারীরা হয় সংসারমুখী। সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার পরিচালনাও একটি কঠিন ও দুরুহ কাজ। এই পরিবারের নেতৃত্বের ভূমিকায় পুরুষ থাকলেও সাংসারিক নানা প্রয়োজনের তাগিদে নারীকে সব সময় পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিতেই হয়। ফলে সাংসারিক সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তার কারণে অনেক সময় সুযোগ হয়ে ওঠেনা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের। এটা একটি চিরন্তন বাস্তবতা।

অ্যাঙ্গাস ক্যাম্পবেল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের *অ্যামেরিকান ভোটার* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মা ও স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর রাজনৈতিক সত্তা বিকাশের সুযোগ খুবই কম। কারণ, নারীদের যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের সন্তানের লালন-পালনই নিত্যদিনের দায়িত্ব[৪৩৮]। আর তাই নারীকে রাজনীতিতে যোগ দিতে হলে তাকে অবশ্যই নিজ সন্তানের বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। রাজনীতিতে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য যেমন পুরুষকে লেগে থাকতে হয়; তেমনি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারীনি হওয়ার জন্য নারীকে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট কর্মজীবনে লেগে থাকতে হয়। যেসব নারীর সন্তান ছোট তাদের ঘরের গণ্ডির বাইরে জীবনবৃত্তির সূচনা বিলম্বিত হওয়ার কারণে তাদের সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা কম[৪৩৯]।

এটাই সত্য যে, রাজনীতি করতে হলে অনেক সময় পরিবারকে ঠিকমতো সময় দেওয়া যায় না, সন্তান-সন্ততিকে ঠিকমতো সময় দেওয়া যায় না। একজন নারী যখন পরিবারের কাজ এবং সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে নিজেকে

---

৪৩৭. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়?*, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৮
৪৩৮. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৪৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

ব্যস্ত রাখেন তখন সহজে রাজনীতি করা হয়ে ওঠেনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌথ ভূমিকায় একটি সন্তানের জন্ম হয়। কোন বাউন্ডেলে পুরুষ যদি সন্তানের জন্মের পর পরই কিছুদিনের জন্য লাপাত্তা হয়ে যায়, সেটার প্রভাব পরিবারে পড়বে, দেখা যাবে মা কষ্ট করে সন্তানকে কোন রকমভাবে লালন-পালন করতে পারবে। কিন্তু সন্তানের ওই মা যদি লাপাত্তা হয়ে যায়, তাহলে নবজাতক বড় করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ধরণের সমস্যা হয়ে যাবে। সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পিতার চাইতে মায়ের বেশি ভূমিকা থাকে, বেশ সময় দিতে হয়। এটা একটা দিক; সংসারে আরো নানা প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে নারীকে অনেক বেশি সম্পৃক্ত থাকতে হয়।

বিয়ে হয়ে যাবার পর কখনো কখনো বয়সও নারী জন্য একটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নারী তাদের প্রথম রাজনৈতিক পদে যোগ দেবার সময় অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী হয়ে থাকে। ফলে তাদের রাজনৈতিক জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং রাজনৈতিক শীর্ষ পদগুলিতে খুব বেশি অধিষ্ঠিত হতে পারে না[৪৪০]। সমসাময়িক ও সাম্প্রতিক সময়ে যেসব নারীকে আমরা রাজনীতির শীর্ষপদে দেখি, যদিও তাদের অনেকে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে এসেছেন; তাদের মধ্যে অনেকে জীবনের একটা পর্যায়ে রাজনীতিতে আসেন, যখন সাংসারিক কর্তব্যের পরিধি অনেকটা কমে আসে। সংসার জীবনে প্রবেশের আগে যারা রাজনীতির খাতায় নাম লিখান তাদের কেউ কেউ রাজনীতি থেকে কিছুদিন বিরতি নিয়ে সন্তান জন্ম দেন এবং সন্তান একটু বড় করে আবার রাজনীতিতে ফিরেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক বছর পর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। ভারত থেকে দেশে ফিরে তিনি যখন আওয়ামী লীগের হাল ধরেন তখন তিনি দুই সন্তানের মা এবং তাঁর সন্তানেরাও ততটা বড় হয়েছে, যতটা বড় হলে একজন মাকে আর সার্বক্ষণিক সময় না দিলেও চলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পুর্বে শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাজনীতির উত্তাল মাঠে ব্যস্ত এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় যখন গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানের জেলে চলে যান, সেই সময় শেখ হাসিনা সন্তান গর্ভে ধারণ ও জন্মদান নিয়ে ব্যস্ত।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও রাজনীতিতে আসেন শেখ হাসিনার মতো একটা পর্যায়ে। তাঁর স্বামী জিয়াউর রহমান দেশের প্রেসিডেন্ট ও বিএনপির চেয়ারম্যান হলেও খালেদা জিয়া গৃহিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর দুই বছর পর দলের এক সংকট মুহূর্তে দলের পদে আসেন এবং একটা পর্যায়ে দলীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। এই সময়ে তাঁরও দুই সন্তান কিশোর বয়সী হয়ে গেছে। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেসব নারী সেই

৪৪০. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং বিরতিহীনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন, এসব নারী রাজনীতিবিদদের মধ্যে বড় অংশটির সাংসারিক সীমাবদ্ধতা কম ছিল।

সাম্প্রতিক বিশ্বের একজন আলোচিত রাজনীতিবিদ ছিলেন বৃটেনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। আপোষহীন ও অনঢ় মনোবলের কারণে তিনি লৌহমানবী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। একজন রাজনীতিবিদ হলেও মার্গারেট থ্যাচার পঞ্চাশের দশকে কয়েক বছর রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিয়ে, সংসার ও দু'টি সন্তান জন্মদান ও বড় করার জন্য। সেই সময় রাজনীতিতে তাঁর নয় বছর ছেদ পড়ে[৪৪১]। ১৯৫৩ সালে তিনি যমজ সন্তানের জননী হন। রাজনীতিতে তিনি তখনই ফেরেন যখন তার সন্তানরা স্কুলে যাওয়ার মতো উপযুক্ত ও বড় হয়ে উঠে। যমজ সন্তান না হলে তাঁর রাজনীতিতে ফিরতে হয়তো আরেকটু সময় লাগতো।

নারীর নিজেরও আগ্রহের ঘাটতি

নারীর নিজেরও আগ্রহের ঘাটতি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা। পুরো মুসলিম সমাজের একটা বড় অংশের নারীর মতো বাংলাদেশের বহু নারীও এক্ষেত্রে একেবারে দোষমুক্ত নন। পুরুষতন্ত্রের অধিনে থাকতে থাকতে একটা পর্যায়ে নারীরাও তাদের পছন্দ-অপছন্দ পুরুষদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশে পরিতৃপ্ত হয়ে এই দুঃখজনক অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করেছে[৪৪২]। মুসলিম সমাজের বহু নারী অধস্তন থাকার মধ্যেই নিজেদের স্বার্থকতা দেখতো। তাদের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, পুরুষ ব্যতিত নারীর অস্তিত্ব নেই। ফলে দীর্ঘদিন সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়নি।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের নারীর অবস্থাও তদ্রুপ ছিলো। পুরুষের শোষণের যাঁতাকালে পিষ্ট হতে থাকলেও নারী সহজে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি। এখন নারীর অবস্থার অনেক উন্নতি হলেও একসময় আমাদের এই বঙ্গে নারীদের অবস্থা চরম শোচনীয় ছিলো। তাদের মুক্তির জন্য এবং অধিকার আদায়ের জন্য বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের একটি অংশ এগিয়ে আসেন। কিন্তু নারী জাগরণের আন্দোলনের সূচনা নারীর হাত দিয়ে হয়নি। বাংলার নারী বন্দিনীদের মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এদেশের পুরুষরাই[৪৪৩]। অবশ্য এই বাস্তবতাও

---

৪৪১. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৪৪২. প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৪৪৩. ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

ছিল যে, শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে নারীর মুক্তি আন্দোলন শুরু করার মতো যোগ্য নারীও সৃষ্টি হয়নি। যখন কিছু যোগ্য নারী তৈরী হয়েছে, সেই যোগ্য নারীদের মধ্য থেকে কিছু নারী তাদের মুক্তি আন্দোলনে শামিল হয়েছে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশে এখনো অনেক নারী তার নিজ ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে চায়। সে পরিবারের ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, কিন্তু নতুন কোন চিন্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সমাজের প্রচলিত কাঠামোর বাইরে আসতে চায় না এবং রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চায় না। সরাসরি রাজনৈতিক দল কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই যে কেবল নারীকে রাজনৈতিক হতে হবে; এমন নয়। তবে তার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে তাকে রাজনীতি-সচেতন হতে হবে। 'নারীর নিজেকে ভিন্নভাবে জানার মধ্যে সর্বাগ্রে 'রাজনীতি' সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। পুরুষের নির্মিত রাজনীতির সংজ্ঞার বাইরে নারীর নিজস্ব রাজনীতি হচ্ছে 'ব্যক্তিগত জীবনও রাজনৈতিক'[৪৪৪]। নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে তার নিজেকেই আগে সচেতন হতে হবে। কারণ তার নিজস্ব গুণাবলী, নির্ধারিত মর্যাদা ও তার জৈবিক পরিচয়ের গুরুত্ব বুঝার মাধ্যমে নারী নিজে আত্মপরিচয় লাভ করে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সনাতন নারীরা ধরে নেয় যে, তাদের সামাজিক ও দৈহিক জীবন পরিসরের ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যত কোনই প্রভাব নেই; থাকলেও তা যৎসামান্য। তারা ঐ অঙ্গনে নিষ্ক্রিয় থাকবে। বরাবরের মতো অনাগ্রহী থাকবে রাজনীতিতে[৪৪৫]। সেটা চলে বংশ পরম্পরায়। কারণ, মেয়েরা সাধারণত মাকে অনুকরণ করে বেশি এবং মায়ের সংস্কৃতিতে সে গড়ে উঠতে চায়।

সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারীকে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হতে হয় জন্মলগ্ন থেকেই। সমাজের নানা প্রথার চর্চা শুরু হয় শিশুর উপর। বৈষম্যমূলক ও পুরুষতান্ত্রিক আচরণের পাশাপাশি নারীর নিজের আগ্রহের ঘাটতি থেকে সে মানুষ হিসেবে সমমর্যাদা না পেয়ে আলাদাভাবে 'নারী' হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা মেয়ে শিশুটি একদিন বুঝতে পারে, সে নারী এবং তাকে অনেক কিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত নারীবাদী সিমন দা বুভোয়্যরের বিখ্যাত উক্তিটি প্রাসঙ্গিক, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বড় হতে হতে নারী হয়ে যায়।'

---

৪৪৪. নাসিম আখতার হোসাইন, *জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স: নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৪৪৫. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

দরিদ্রতা

একটি দেশ ও সমাজের দরিদ্রতার পাশাপাশি নারীর নিজের দরিদ্রতা ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা তাকে অনেক সময় পিছিয়ে দেয়। ফলে একটি দেশের সামগ্রিক দরিদ্রতা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আর নারীর নিজের দরিদ্রতা ও পরিবারের উপর নির্ভরশীলতাও একটি বড় প্রতিবন্ধতা। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে নারীর ক্ষমতাহীনতার মৌল কারণ হিসাবে নারীর হাতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণহীনতাকে চিহ্নিত করা হয়[৪৪৬]। এটার উত্তরণে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয় সেই সম্মেলনে।

নারীর যে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণহীনতার কথা বলা হয়েছে সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্রতার মধ্যে পড়ে। আবার অনেক সময় সেটাকে দরিদ্রতা বলা না গেলেও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হয়। কারণ বড় অংশের নারীর আয় থাকে না, আবার যাদের আয় থাকে সেই আয়ের উপর তাদের বড় অংশটির পুরোপুরী নিয়ন্ত্রণও থাকে না। এদিকে স্বামী ও তার পরিবারের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতার অভাবে নারীকে এমন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় যার ফলে সে রাজনীতিতে আগ্রহী হওয়ার সুযোগই পায় না।

বাংলাদেশে এখনো নারীর সমানাধিকারের দাবী রয়ে গেছে নীতিসাপেক্ষ। এখনো বাস্তবক্ষেত্রে নারীর গৃহশ্রমের কোন স্বীকৃতিই নেই; আর পেশার জগতে যার স্বীকৃতি অর্ধেকের কাছাকাছি[৪৪৭]। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে কাজ করে একজন পুরুষ ৪০০ টাকা মজুরী পান, সেই একই কাজ করে একজন নারী পান ২৫০ টাকা। অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য শুধু সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক[৪৪৮]। ফলে বহু নারী দরিদ্রতা জয় করতে পারে না। ক্ষমতায়নের জন্য স্বাবলম্বিতা ও অমুখাপেক্ষিতারও প্রয়োজন হয়।

অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে একজন নারী অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির ময়দানে নিজেকে হাজির করতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি এতটাই কলুষিত ও নোংরা যে, টাকা ছাড়া রাজনীতি হয় না। নির্বাচনে প্রচুর টাকার ছড়াছড়ি থাকে। প্রায় সকল পর্যায়ের নির্বাচন এখন দলীয় হওয়ার কারণে অনেক সময় বড় অংকের

---

৪৪৬. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০০), পৃ. ২১৬

৪৪৭. সুলতানা কামাল, *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৩

৪৪৮. প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০২০

টাকার বিনিময়ে দলীয় মনোনয়ন বাগিয়ে আনতে হয়। অন্যদিকে, নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থিতার ঘোষণার পর আরো অনেক টাকার প্রয়োজন পড়ে। নির্বাচনগত পদ্ধতির ত্রুটির কারণে বাংলাদেশের নির্বাচনে টাকা খরচ করতে হয় এবং পেশীশক্তি কাজে লাগাতে হয়। পেশীশক্তি ব্যবহারের জন্যও টাকা লাগে। নারীদের সাধারণত এত টাকা থাকে না। টাকার অভাবের নির্বাচন ও রাজনীতির প্রয়োজনে সে সহজে পরিবারের সমর্থন ও সহযোগিতাও পায় না। ফলে দরিদ্রতার কারণে নারীকে রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকতে হয়।

আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিও জড়িত। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথে আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতাকে একটি কারণ হিসেবে নিতে হয়। বর্তমানে প্রশাসন, পুলিশসহ বিভিন্ন অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ার এটা একটা কারণ যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসব মাঠ প্রশাসনের সরকারী কর্মকর্তাকে তৃণমূলে কাজ করতে হয়। নানা কারণে এক সময় গ্রামে নারীর জন্য কাজ করা প্রায় অসাধ্য ছিল।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে মাঠ প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সভাপতি ও খাদ্য সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুমসহ মাঠ পর্যায়ের অনেক নারী কর্মকর্তা মনে করেন। একটি জাতীয় দৈনিকের সাথে আলাপকালে ড. নাজমানারা খানুম মন্তব্য করেন, বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, নীতি সহায়তা আগের চেয়ে এখন অনেক অনুকূলে। এখন দেশের আনাচে-কানাচে রাস্তাঘাট অনেক ভালো। আগে নারীকে অনেক কষ্ট করে মাঠ প্রশাসনে কাজ করতে হতো। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা থাকা অবস্থায় প্রচুর হাঁটতে হয়েছে। অনেক জায়গায় গাড়ি যেত না। হেঁটে যেতে হয়েছে। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার কারণে আমাদের নারী সহকর্মীদের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে[৪৪৯]।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর অনেকটা উন্নতি হলেও এখনো মাঠ পর্যায়ে নারীর জন্য কিছু আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা আছে। ২০২০ সালে ফরিদপুর জেলার সদরপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পূরবী

[৪৪৯]. দৈনিক মানবজমিন, ৮ মার্চ, ২০২১

গোলদার তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও উপজেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে যেতে হয় উপজেলার নানা জায়গায়। কখনো কখনো অবৈধভাবে ইলিশ মাছ ধরা বন্ধে রাতবিরাতে ছুটতে হয় নদীতে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ, অবৈধ উচ্ছেদসহ আরো নানা কাজ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়কারী হিসেবে ঝুঁকি নিয়েই ইউএনওদের এসব কাজ করতে হয়। তবে নারী হিসেবে বাড়তি কিছু চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি থাকে। স্বাস্থ্যগত ও মানসিক ঝুঁকি তো আছেই; পরিবারের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হয়। কখনো কখনো রাতের বেলায় কোনো অভিযান চালাতে গেলে একজন নারীকে আলাদা কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়[৪৫০]।'

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীবান্ধব অবকাঠামোগত উন্নয়ন তেমন একটা না হওয়ায় বহিঃস্থ কর্মমকাণ্ডে নারী অংশ নিতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় নতুন করে অনেক নারী উৎসাহিত হচ্ছে না। একজন ধার্মিক মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে এই সমস্যায় আরো বেশি পড়তে হয়। একজন নারী যখন রাজনীতির খাতায় নাম লেখায়, তাকে তখন বাইরে সময় দিতে হয়। একজন নামাজি পুরুষ রাজনীতিক বাহিরে যে কোথাও নামাজ আদায় করতে পারলেও নারীর ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হয়। সর্বত্র মসজিদ থাকলেও নারীর জন্য নামাজের ব্যবস্থা বেশির ভাগ মসজিদে নেই। যেসব মসজিদের আছে, সেটাও সীমিত পরিসরে। রাজনৈতিক দলের অফিস, মার্কেট এবং অন্য পাবলিক প্লেসে পুরুষের জন্য নামাজের ব্যবস্থা থাকলেও নারীর জন্য নেই। ফলে একজন নামাজি নারী রাজনীতির প্রয়োজনে বাইরে যাবার সময় তাকে ভাবতে হবে নামাজের কথা। এভাবে অবকাঠামোগত দিক তাকে রাজনীতিতে নিরুৎসাহিত করে।

অবকাঠামোগত আরো নানা অপ্রতুলতা রয়েছে যা একজন নারীকে বাইরের কাজে সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করে। অনেক সময় স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে নারীকে মাঠে কাজ করতে হয়। যেমন রাজধানী ঢাকায় কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই বের হতে হলেও শৌচাগার ব্যবহারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ দিয়েই অভ্যস্ত হচ্ছেন বহু কর্মজীবি নারী। কারণ বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য রাজধানীতে গণশৌচাগার আছে মাত্র ১০২টি। নারীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী গণশৌচাগারের সংখ্যা মাত্র ২৯টি[৪৫১]। রাজধানীর গুলিস্তানের একটি শৌচাগার প্রতিদিন ব্যবহার করে প্রায় ২০০ লোক। এর মধ্যে নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫-২০ জন[৪৫২]।

---

৪৫০. দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

৪৫১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩ এপ্রিল, ২০২১

৪৫২. প্রাগুক্ত

টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত নারীদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বেশ ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় একজন পুরুষ সদস্য যেনতেনভাবে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে পারলেও নারী সেটা পারে না। দৈনিক প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনে একজন ট্রাফিক নারী পুলিশ সদস্যের ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে, 'টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লেই তো চিন্তায় পড়ে যাই। ছেলেরা চাইলে যেকোনো টয়লেট ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মেয়েদের জন্য তো সব টয়লেটে যাওয়া সম্ভব হয় না। হুট করে অন্য প্রতিষ্ঠানের টয়লেট ব্যবহার করতে একটু সংকোচও কাজ করে।' দৈনিকটির এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, রাসেল স্কয়ারে ডিউটিতে থাকলে সেখানকার বাস কাউন্টারগুলোর শৌচাগার ব্যবহার করেন কিছু নারী ট্রাফিক পুলিশ সদস্য। সময় নষ্টের কথা ভেবে প্রায় সময়ই প্রস্রাব চেপে রাখেন তাঁরা। আবার এসব ঝামেলা এড়াতে পানিও কম পান করেন। শৌচাগারের সমস্যার কারণে অনেকের মধ্যেই পানি কম পান করা ও প্রস্রাব চেপে রাখার প্রবণতা রয়েছে[৪৫৩]।

প্রশ্রাব বেশিক্ষণ আটকিয়ে রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তলপেটে ব্যথা ও দেহে যে জীবাণু থাকে সেগুলোরও বৃদ্ধি ঘটে। শৌচাগারসহ নানা কারণে কর্মজীবি নারীরা এবং বাইরে বের হওয়া নারীরা পানি কম খাওয়ার ফলে ইউরিনে ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি থাকে, যা পরবর্তী সময়ে কিডনির সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হাইড্রেশন বজায় রাখা প্রয়োজন।

রাজনীতি হোক, চাকুরী হোক আর নারীর যে কোন বহিঃস্থ কাজে অংশগ্রহণ হোক, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন একটি জরুরী বিষয়। আর্থ-সামাজিক নানা বাস্তবতায় বাংলাদেশের বহু নারী রাজনীতিতে সহজে আগ্রহী হয়ে ওঠে না।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও পেশীশক্তির প্রভাব

নারীর মনোজগতের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ তার মতামতকে করেছে অধীনস্থ[৪৫৪]। সিমন দ্য বোভ্যয়ার ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর সাড়া জাগানো নারীবাদি গ্রন্থ *দি সেকেন্ড সেক্স* এ শুধু লিঙ্গ বৈষম্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে নারী সমাজকে এক ভাষাহীন, স্বপ্নহীন এবং সামাজিক দুর্বল জীবে পরিণত করে রাখতে সবসময় সচেষ্ট থাকে তা তিনি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

৪৫৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

৪৫৪. হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ২৪

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পুরুষের স্বার্থকেই সংরক্ষণ করে এবং নারীর জন্য এক ধরণের মর্যাদার স্তরায়নের অবস্থা তৈরী করে। এই স্তরায়নের কারণে নারীরা গৃহ অভিমুখী হয় এবং বহিঃস্থ কর্মকাণ্ড ও রাজনীতি থেকে দুরে থাকে। এই স্তরায়নের ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে এমন ভাবনা লালন করা হয় যে, নারীর মূল কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন ও কেবলই সাংসারিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এসব মানসিকতার কারণে সমাজে নারী শৈশব থেকেই কতগুলো বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করে যা তাকে কতগুলো 'নারীত্বের বোধ'-এ আবদ্ধ করে ফেলে[৪৫৫]।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে যে কোন সমাজে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় এবং তার ক্ষমতায়ন সহজে হয় না। কারণ, পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ নারীকে প্রাকৃতিকভাবে দুর্বল ও নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করে অরাজনৈতিক ও ক্ষমতাহীন গৃহের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে[৪৫৬]। এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা আমাদের দেশের নারীর রাজনীতিতে আগমনের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বাংলাদেশে এমন পরিবেশ গড়ে উঠেনি, যাতে নারীরা নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসতে পারেন। এখনো দলীয় রাজনীতি অনেকটা পেশিনির্ভর এবং সেই পেশিনির্ভরতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের কারণে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের নারীদের অনেকে পেশিনির্ভর রাজনীতির ভয়, আতংক ও বিতৃষ্ণার কারণে দুরে থাকে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের একজন নারী রাজনীতিকের মন্তব্যে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। দশম সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের এই সদস্য তারানা হালিমকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল। প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৭ সালে রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন, 'যখনই একজন নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চান বা নির্বাচনে অংশ নিতে চান তখন সঙ্গে সঙ্গে (পুরুষ) সহকর্মীরা তার প্রতিদন্দ্বী হয়ে যান। প্রতিদ্বন্দ্বীরা জয়ীও হন, কারণ কিছু ক্ষেত্রে তারা অর্থব্যয় করতে পারেন, তাদের বাহিনী থাকে যারা তাদের বিভিন্নভাবে প্রমোট করে এবং সেই সঙ্গে এলাকায় একটি আধিপত্যও সৃষ্ট করে।' তাঁর মতে, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা তিনটি 'এম'- ম্যান, মাসল অ্যান্ড মানি[৪৫৭]।

---

৪৫৫. ইসরাত আহমেদ ও আনিসুর রহমান, *নারীর অবস্থান ও অধিকার: একটি রূপরেখা* (প্রবন্ধ), (আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ৪২

৪৫৬. নাসিম আখতার হোসাইন, *জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স: নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪৫৭. বিডিনিউজ, ১২ মার্চ ২০১৭ (https://bangla.bdnews24.com/politics/article1301775.bdnews)

তারানা হালিমের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাংলাদেশে নারী ইস্যুতে যারা কাজ করেছেন, তাদের পর্যালোচনায় নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে বাঁধাগুলোর মধ্যে রয়েছে, মাস্তান সংস্কৃতি, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার, কালো টাকা ও যৌন নিপীড়নের ভয়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে পুরুষরা এসব পারে, নারীরা সহজে পারে না। যেমনটি বলেন অধ্যাপক ড. রওনক জাহান। তিনি উল্লেখ করেন, পেশিশক্তি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অন্যতম উপাদান, যা নারীর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ফলে, এক্ষেত্রে নারীরা তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বির তুলনায় পিছিয়ে পড়ে[৪৫৮]।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের মতে, নারীদের প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে প্রমাণ করে এগোতে হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা হয় না। বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় 'মানসিকতা পরিবর্তন'ই মূল চ্যালেঞ্জ বলে তিনি মনে করেন। তারানা হালিমের আরেকটি কথায় স্পষ্ট হয় যে, নানা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে একজন নারী রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে যাবার পরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'যখন আমি মন্ত্রণালয়ে গেলাম, তখন দেখলাম, অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন যাদের মধ্যে একটা সমস্যা কাজ করছে, আমার লিডারশিপটা মেনে নেওয়ার সমস্যা[৪৫৯]।'

রাজনীতিতে পুরুষও সহিংসতার মুখোমুখি হয়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রভাব, উদ্দেশ্য ও মাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে যা নারীকে অধস্তন অবস্থানে রাখতে ব্যবহৃত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করে[৪৬০]।

কিছু আইন, বিধি-বিধান ও কাঠামোর কারণে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কিছু নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে নারী পেরে উঠছে না। এমন একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ জনপ্রতিনিধিদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হয়ে নারী জনপ্রতিনিধিরা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন না। কোভিড-১৯ কালীন সময়ে ঘরবন্দি দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় অংশের নারী প্রতিনিধিরা সরকারী উদ্যোগের অংশীদার হতে পারেননি। ত্রাণ বিতরণসহ মানুষকে সচেতন করার কাজে তাদের

৪৫৮. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা (নিবন্ধ)*, দৈনিক সমকাল, ২৭ অক্টোবর ২০২০
৪৫৯. বিডিনিউজ, ১২ মার্চ ২০১৭ (https://bangla.bdnews24.com/politics/article1301775.bdnews)
৪৬০. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

যুক্ত করা হয়নি; অনেক নারী জনপ্রতিনিধির অভিযোগ, তাদের উপেক্ষা করে পুরুষ প্রতিনিধিরা ত্রাণ বিতরণসহ সরকারী নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন[৪৬১]।

গেল শতকের গোড়ার দিকে বেগম রোকেয়াসহ আরো অনেকে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা রোধে কাজ করেছেন। বেগম রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচন করতে যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে আচ্ছন্ন দুর্বল নতজানু আত্মসম্মান বোধহীন নারী সমাজকে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন[৪৬২]। কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনসমূহ পুরুষবেষ্টিত থাকায় তাদের চেতনার মধ্যে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কোন স্থান ছিল না[৪৬৩]।

ইসলাম পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে সমর্থন করেনা। ইসলাম সমর্থিত পরিবারব্যবস্থা হলো পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতন্ত্র আর পুরুষতন্ত্র এক নয়। পরিবার পরিচালনা, অভিভাবকত্ব ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালনের সাথে পিতৃতন্ত্রের বিষয়টি জড়িত। অন্যদিকে, নারীকে অধিনস্ত করে রাখা এবং এক ধরণের মর্যাদার স্তরায়ন তৈরী করে তার উপর কর্তৃত্ব ফলানো পুরুষতন্ত্রের মধ্যে পড়ে। প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর সাথে জোড়া হিসেবে আল্লাহ হাওয়া (আ.) সৃষ্টি করেন এবং একটা পর্যায়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আদম ও হাওয়ার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক ও অধস্তনতার কোন সম্পর্ক ছিল না; ছিল সাম্য ও সমঅধিকারের সম্পর্ক। তারা দুই জন মিলেই পৃথিবী আবাদ করা শুরু করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির প্রয়োজনে যে নারীকে দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে পুরুষের চাইতে তুলনামূলক কোমল ও নরম করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাকে অপব্যবহার করে মানুষই পুরুষতন্ত্র তৈরী করেছে এবং নারীকে করেছে অধস্তন। লিখিত ইতিহাসের কালের আগের মানুষের রেখে যাওয়া চিহ্ন, অংকন, বাসন-কোসন থেকে যতটুকু আঁচ করা যায় তাতে একসময়ে সমাজে নারীর যে অধস্তন অবস্থা ছিল না তার পক্ষে যুক্তিই প্রবল হয়ে উঠে[৪৬৪]।

ইসলামে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেরও অনুকূল। কিন্তু মুসলিম সমাজেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপব্যবহার করে পুরুষতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে। যাহোক, বিভিন্ন গবেষণায়ও দেখা গেছে,

---

৪৬১. চন্দন লাহিড়ী, *সংকটে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া (নিবন্ধ)*, বিডিনিউজ, ১৯ জুন ২০২০ (https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/62160)

৪৬২. আনু মোহাম্মদ, *নারী পুরুষ ও সমাজ* (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৯

৪৬৩. কে. এম. মহিউদ্দিন, *ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৪৬৪. আনু মোহাম্মদ, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলোর ছেলেরা রাজনীতিতে কম আগ্রহী থাকে। রবার্ট হেস ও জুডিথ এক সমীক্ষা পরিচালনা করে বলেন, বাবার পরিবর্তে মায়েরা যেসব পরিবারের কর্তৃত্বশীল, এমন পরিবারের ছেলেরা রাজনীতিতে কম আগ্রহী থাকে[৪৬৫]। কেনেথ পি ল্যাংটন ক্যারিবীয় অঞ্চলের মাতৃপ্রধান পরিবারগুলোর উপর একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পরিচালনা করে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, পরিবারে মায়ের আধিপত্য থাকলে 'তার প্রভাবে পুত্রসন্তানেরা সাধারণত হীনবীর্য হয়ে পড়ে। তবে কন্যাসন্তানের ওপর তুলনামূলকভাবে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। মাতৃপ্রধান পরিবারের ছেলেরা পিতৃপ্রধান পরিবারের ছেলেদের চাইতে রাজনীতিতে কম আগ্রহী[৪৬৬]।'

ধর্মের অপব্যাখা, কট্টরপন্থা ও বিভিন্ন প্রথা

রাজনীতি ও নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে গ্রহণ করার বিষয়ে নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ এবং সেই নেতিবাচক অবস্থান থেকে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অসম আচরণ করা হয় ধর্মের নাম নিয়ে কিংবা গোঁড়া অবস্থানে থেকে ধর্মের ভুলব্যাখা ও অপব্যাখা করে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের চাইতে অন্যান্য ধর্ম ও সেসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নারীর ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা বেশি বিদ্যমান। নারীকে পুড়িয়ে মারা পুণ্যের কাজ এবং সমাজ রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ হিসেবে বিভিন্ন বিধান যে বিভিন্ন কালে-স্থানে তৈরী করা হয়েছে সে তথ্য ইতিহাসের অঙ্গ[৪৬৭]। তবে ইসলাম ধর্মে নারীকে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হলেও ধর্মের ভুল ও অপব্যাখার মাধ্যমে নারীর ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরাও।

কোনো কোনো ইসলামপন্থী গ্রুপ নারীর বিষয়ে এত কঠোর যে, তারা কট্টরপন্থাকেও হার মানিয়েছে। আফগানিস্তানে তালেবানরা যুদ্ধ করে এবং বিজয়ী হয়। তারা ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় নারী শিক্ষাকে সংকোচন করে, নারীর আরো বহু অধিকার ক্ষুন্ন করে। এটা ইসলামের বিধান নয়, ইসলামের শিক্ষা নয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সেখানে আজো নারী শিক্ষার কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের আলেম-উলামাদের বড় অংশটি এবং ইসলামপন্থী দলগুলোর কয়েকটি দেওবন্দি তরিকার। ফলে এসব ইসলামী দলে নারীর কোনো স্থান আজো হয়নি ও দেওবন্দি আলেম-উলামাদের কারণে মুসলিম সমাজে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

---

৪৬৫. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৪৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৪৬৭. আনু মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অনেকে নারী সংক্রান্ত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসকে ভুলভাবে ব্যাখা করে নারীর প্রতি ইসলামের কঠোর মনোভাব তুলে ধরেছেন। কুরআনকে গভীরভাবে উপলব্ধি না করে আক্ষরিকভাবে অর্থ তুলে ধরায় তারা অগভীর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নারী জাতি সম্পর্কে কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়েছেন অথবা পুরুষতান্ত্রিক ও স্বার্থপর মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীসের নারী সংক্রান্ত বিষয়াদি একপেশে করে ব্যাখা করেছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার ফলে কুরআনের আয়াত বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কুরআনের উপযোগিতা কিয়ামত পর্যন্ত। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কুরআনের আসল মর্ম অনুধাবন করা দরকার। ইসলামের মুল উদ্দেশ্য সর্ব ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানবতার উন্নতি সাধন করা; কট্টরপন্থা লালনের মধ্য দিয়ে সেই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়।

ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারীকে যথাযথ সুযোগ না দিয়ে ইসলামপন্থীরা তাদের লক্ষ্যে পৌছবে কিভাবে? ইউসুফ আল কারজাভি বলেন, 'নারীদের আন্দোলন পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষরা কখনোই নারীদের গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং তাদের নেতৃত্বে মেধা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়নি। এ সুযোগ দিলে পুরুষদের আধিপত্য ছাড়াই নারীরা তাদের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণের সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারত। ইসলামী আন্দোলন যদি দাওয়াত, চিন্তাধারা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে তাহলে নারীদের ইসলামী কাজ সফল হবে। প্রতিভাবান পুরুষদের মতো প্রতিভাময়ী নারীও আছে। উৎকর্ষতা পুরুষদের একচেটিয়া নয়। পবিত্র কুরআন বিনা কারণে আমাদের সামনে এ কাহিনী বর্ণনা করেনি যেখানে একজন নারীর বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্বে তার স্বজাতি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন সাবা'র রাণি[৪৬৮]।'

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী হচ্ছে নারী। বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার মধ্যে কোনো সুফল নেই। প্রয়োজন ইসলামের নারীর অধিকার বিষয়ে আরেকটু উদার হওয়া। যেসব দেশে ইসলামপন্থীরা ভালো করছে, দেখা যাবে সেখানে নারীও অনেক এগিয়ে এসেছে রাজনীতিতে। মুসলিম জাতির অবস্থা পরিবর্তন করা দরকার। আর এ পরিবর্তন তাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই সর্বাগ্রে হতে হবে। সর্বপ্রথম ব্যক্তিকে পরিবর্তিত হতে হবে। কারণ ব্যক্তির সংশোধন হয়ে গেলে সমাজ সংশোধিত হবে।

[৪৬৮]. ইউসুফ আল কারজাভি, *আধুনিক যুগ : ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭১-৭২

প্রত্যেক জাতির কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে যা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত[৪৬৯]। কিন্তু আমাদের দেশের মুসলিম সমাজে নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ঠ্য ও সামাজিক প্রথা তৈরী হয়েছে, যা ইসলাম ধর্মের মূল মর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, যা নারীর স্বার্থকে চরমভাবে ক্ষুন্ন করে। যেমন একটি প্রথা হচ্ছে, বিয়েতে নারীর সাধারণত নিজস্ব মতামত থাকে না। এই প্রথা সাধারণত গ্রামীণ সমাজে বেশি, শহুরে সমাজেও আছে। তবে ইদানিং বিয়েতে নারীর মতামতের গুরুত্ব কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। যাহোক, এই যে বিয়েতে নারীর মতামতের মূল্য নেই বা কম, এমন সামাজিক প্রথা নারীর মধ্যে অধস্তন মানসিকতা তৈরী করে। সে মনে করে, নারীর যেহেতু নিজস্ব মতামত নেই, পুরুষের মতামতের উপর নির্ভরশীল হওয়া দরকার; অতএব রাজনীতিতে আগমনের কোন আগ্রহই তার মধ্যে তৈরী হয়না। এমন সামাজিক প্রথা ইসলামও অনুমোদন করেনা।

সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার না দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সমাজে একটি নিরব ঐক্যমত আছে। ইসলাম নারীকে সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে, এটা কট্টরপন্থী ও উদারপন্থী সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু স্বার্থপরতা ও সামাজিক প্রথাকে সংরক্ষণ করতে গিয়ে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার চাওয়া অনুচিত, এমন একটি মানসিকতা ও সামাজিক প্রথা তৈরী হয়ে আছে। অনেকে এটাকে ইসলাম প্রদত্ত তার অধিকার মনে করলেও সামাজিক প্রথাকে গুরুত্ব দিয়ে বাপের বাড়ির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার চাওয়া থেকে বিরত থাকে।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এরকম আরো অনেক অনৈসলামিক প্রথা ও সামাজিক কুসংস্কার বিদ্যমান। এর কিছু ঐতিাসিক কারণও আছে। 'বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমের পূর্বপুরুষগণ নিম্নবর্ণের হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইসলাম ধর্ম তুলনামূলকভাবে একটুখানি উদার বলে নতুন ধর্মান্তরিতরা তাদের আগের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা তাদের পুরনো লৌকিক বিশ্বাস ও আচারপ্রথা পরিত্যাগ করেনি। সে-ভাবেই স্থানীয় লোকজ রীতিনীতি ও নতুন ধর্মের শিক্ষা প্রভৃতির সমন্বয়ে বাংলাদেশে একটি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি গড়ে ওঠে[৪৭০]।'

এসব গোঁড়ামী ও মুসলিম সমাজে ভুল সামাজিক প্রথা বিদ্যমান থাকার কারণে নারী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমন সামাজিক প্রথা আরো বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান। এসব প্রথা ভেঙে যেসব নারী রাজনীতিতে সক্রিয় হয় তারা সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। এমন কিছু রাজনীতি সফল ও বিপ্লবী নারী আছেন, যাদেরকে

---

৪৬৯. কবি আল মাহমুদ, *নারীনিগ্রহ* (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ. ৬৬

৪৭০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

রাজনীতিতে জড়িত হতে গিয়ে সমাজে নিন্দার পাত্রী হতে হয়; রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকার কারণে তাদের কপালে 'কুমাতা'র বদনাম জোটে। এ ধরনের ঝামেলা রাজনীতি-সফল কোনও পুরুষকে পোহাতে হয় না[৪৭১]।

পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধ

অনেকে সমাজে নানা অঘটনের জন্য নারীর উপর আগেই দোষ চাপিয়ে দেন, অন্য কথায় নারীর বেহায়াপনা, বেপর্দা অবস্থা ও ঘরের বাইরের কাজে সম্পৃক্ত হওয়াকে দায়ী করেন। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের অনেকে যুক্তি দেখান যে, নারীর তার নিরাপত্তার জন্যই তাকে রাজনীতি ও বহিঃস্থ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। হিজাব-বোরকা ব্যবহার না করার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, ইভটিজিং এবং আরো বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে বলে তারা অনেকে যুক্তি দেখান।

নারী গৃহের মধ্যে থাকলেই যে নিরাপদ, তা কিন্তু নয়। তাই বলে বেহায়াপনা ও বেপর্দা অবস্থাকে মেনে নেওয়া যায় না। তবুও নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য প্রথমেই নারীর পোশাক কিংবা অন্য কিছুকে আগে দায়ী করা যাবে না। যদি এমনো হয় যে, ধর্ষণ কিংবা অন্য কোন নির্যাতনের ঘটনার জন্য নারীরও পরোক্ষ দায় থাকে, সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, অপরাধ যার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, আগে তাকে অপরাধী বলতে হবে, আগে তাকেই দায়ী করতে হবে। কেউ যদি নিজের দোষে অন্য কারো দ্বারা পরিকল্পিতভাবে নিহতও হয়, তাই বলে খুনিকে সমর্থন করা যায় না। যে কোন কারণেই হোক, খুন জঘন্য অপরাধ। এজন্য নিহত ব্যক্তিকে আগে দায়ী করে খুনীকে দায়মুক্তি দেওয়া যাবে না। নারীর পোশাক কিংবা বেপর্দা অবস্থাকে দায়ী করে ধর্ষক কিংবা নারী নির্যাতকের পক্ষ নেওয়া যাবে না। আগে পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধকে দায়ী করতে হবে।

যে সমাজে নারী নিরাপদ নয়, তার মানে এই নয় যে, নারীর সমস্যা তথা বাইরে কাজকর্মে সে নিজেকে সম্পৃক্ত করায় এবং পর্দা-হিজাব না করায় নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। বহু দেশ ও সমাজ আছে যেখানে পর্দাপ্রথা খুব একটা রক্ষা করা হয় না, বাইরের জগতে নারী অবাধে বিচরণ করছে; দেখা যাচ্ছে সেসব দেশ ও সমাজের নারীরা বাংলাদেশের নারীদের চাইতে বেশি নিরাপদ। গৃহবন্দি থাকা ও কেবলই বোরকা-হিজাবের মধ্যে যদি নারীর নিরাপত্তার গ্যারান্টি পাওয়া যেতো তাহলে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাময় দেশের মধ্যে অমুসলিম দেশের নামই আসতো না।

৪৭১. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

পর্দার বিপক্ষে বলা হচ্ছে না; শালীনতার জন্য পর্দা-হিজাব প্রয়োজন; কিন্তু বন্দিত্বের জন্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, হিজাব-বোরকা নারীর জন্য অনেক ক্ষেত্রে রক্ষাকবচ। এটাও মাথায় রাখতে হবে, ইসলামের সূচনা যে আরব সমাজে হয়েছে, সেখানে নারীরা বেপর্দা ও বেহায়াপনার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, খুব খোলামেলাভাবে চলাচল করতো, পতিতাবৃত্তিতে সেই সমাজের বহু নারী সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সেসব সাহাবী তাদের উন্নত মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রের কারণে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত ছিলেন। তাদের উন্নত মূল্যবোধ বেহায়া-বেপর্দা নারীর প্রতি তাদেরকে টানেনি। বেপর্দা নারীকে দেখে তারা অন্যায় চিন্তা মাথায় আনেননি। এতে বুঝা যায়, ধর্ষণসহ নারীর প্রতি যে কোন অন্যায় আচরণের প্রতিরোধে আগে প্রয়োজন পুরুষের উন্নত মূল্যবোধ।

মূলত ভয়ংকর পুরুষ যে সমাজে আছে সে সমাজে নারী বাইরে নিরাপদ থাকে না; গৃহের মধ্যেও নিরাপদ থাকে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু অঞ্চলে নারীরা সাধারণত নিরাপদ নন। সেখানে যদি তারা তাদের ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়দের সাথেও থাকেন তবুও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। ভয়ংকর পুরুষ যেখানে থাকবে, সেখানে নারী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগবেই। সে নারীর পিছু নেবেই যদিও সেই নারী বোরকা ও হিজাবও পরে থাকে। অবশ্য, বোরকা ও হিজাবধারী নারীরা এমন সমাজে একটু বেশি নিরাপদ। সমাজে যারা ইসলামী শালীনতা যথাসম্ভব মেনে জীবনযাপন করে তাদের ওপর যথেচ্ছ যৌন আক্রমণ কিংবা ধর্ষণের মত পৈশাচিকতার অভিযোগ অপেক্ষাকৃত কম[৪৭২]।

বাংলাদেশের সমাজে সামগ্রিকভাবে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটেছে। পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধের কারণে নারী ঘরে ও বাইরে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। এমন নিরাপত্তীন অবস্থায় পুরুষের আক্রমণের শিকার থেকে বাঁচতে বহু নারী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাজনীতি থেকে দুরে থাকার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। পুরুষের মূল্যবোধ যদি এমন হয় যে, তারা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রাস্তাঘাটে নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয় না, নিরাপত্তাহীন পরিবেশ সৃষ্টির মতো কোন কাজ করে না; তাহলে এমন সমাজে নারীর রাজনীতিকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অনেকটা চলে যায়।

সহিংসতা

বাংলাদেশের নারীর প্রধানতম সমস্যা হলো নিরাপত্তাহীনতা। ধর্ষণ যেন মহামারীর আকার ধারণ করেছে, নারীর প্রতি অন্যান্য সহিংসতা আছেই। এই অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছিল, অতীতের চাইতে সাম্প্রতিক অতীতে

[৪৭২]. কবি আল মাহমুদ, *নারীনিগ্রহ* (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ. ৯২

রাজনীতিতে নারীর আগ্রহ বাড়লেও ইদানিং সে আগ্রহে ভাটা পড়ছে। তার অন্যতম কারণ এই সহিংসতা। নারী অবরুদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে যখন একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দিকে যাচ্ছিল, তখন দেখা যায় নারীর প্রতি সহিংতার হারও বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়। আশির দশক থেকে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে[৪৭৩]।

অন্য আরো বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা বাংলাদেশের সমাজে প্রায়ই ঘটে; তবে নারী ও শিশু সাধারণত আমাদের দেশে বেশি হয়রানীর শিকার হয়ে থাকে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য দেশে কড়া আইন করা হয়েছে। এমনকি ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও করা হয়েছে। তবুও নারী নির্যাতন কমছে না; কড়া আইন করার পরও দেশে নারী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ইত্যাদি দিন দিন আরো বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নারী যেভাবে হত্যা, ধর্ষণ, ইভটিজিং এবং আরো নানা ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয় তাতে সে রাজনীতির প্রতি আগ্রহী হয়ে আবারো পিছু হটে। ২০১৯ সালে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পুলিশ সদর দফতরের হিসেব অনুযায়ী এর আগের পাঁচ বছরে ধর্ষণের মামলা হয়েছে ১৯ হাজারের বেশি, যার গড় দৈনিক ১১টি[৪৭৪]। ধর্ষণের সব ঘটনায় মামলা হয় না। ধর্ষণের শিকার বিকারগ্রস্ত হলে, গুরুতর আহত হলে বা সবাই জেনে গেলে তখনই পরিবার মামলা করে। তার মানে দেশে প্রতিদিন আরো অনেক বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যা মিডিয়ায় আসে না।

নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন একটি বড় কারণ। নারী শুধু বাইরে নয়; নিজ গৃহেও সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। এমনকি নিজের ঘরেও সে ধর্ষণের মতো ঘটনারও মুখোমুখি হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। স্বামীদের হাতেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন তারা। ব্র্যাকের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, নির্যাতনের শিকার নারীদের শতকরা ৮২ ভাগই বিববাহিত নারী। নানা দিক চিন্তা করে অধিকাংশ নারী তাদের নির্যাতন ও পাশবিকতার কথা প্রকাশ করেন না। যে নারী ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, সেই নির্যাযিত নারী নিজেকে বিকশিত করার চিন্তা করবে কিভাবে?

---

৪৭৩. শাহানারা হোসেন, *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৪৭৪. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯

নারী রাস্তায় বের হলে বিভিন্নভাবে ইভটিজিং ও নির্যাতনের শিকার হয়। পেশাজীবি নারীদের সিংহভাগকেই বাসস্থান ও কর্মস্থলে যাতায়াত করতে হয় গণপরিবহনে, যেখানে নিয়মিতভাবে তাদের যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। এসব অপরাধে যুক্ত থাকে একইসঙ্গে পুরুষ যাত্রী এবং পরিবহন শ্রমিকরা। অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এবং ব্র্যাকের দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ৮৮ জন নারী রাস্তায় চলার পথে যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্যের শিকার হন, যেখানে সিংহভাগ পারপ্রেটরই গণপরিবহনের চালক ও হেলপার[৪৭৫]। এমন পরিস্থিতি নারীকে বহিঃস্থ কর্মকাণ্ডের প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে তোলে।

নারীকে ইভটিজিং ও হয়রানীর শিকার হতে হচ্ছে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে। যে কেউ যখন-তখন স্বনামে ও বেনামে অ্যাকাউন্ট খুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীদের একটা বড় অংশ নারীর প্রতি অবমাননাকর তথ্য, শব্দ, ছবি ইত্যাদি পোস্ট করে থাকে। যখন কোন নারী ব্যবহারকারী কোনো কিছু পোস্ট করে, তখন দেখা যায় অনেকে বাজে, আক্রমণাত্মক, অশ্লীল ও অসংবেদনশীল মন্তব্য করে থাকে। ফেসবুকের ইনবক্সগুলো প্রায়ই নারী ব্যবহারকারীদের জন্য একটা আতঙ্কের নাম। অন্য অনেক অশোভনীয় কথাবার্তার পাশাপাশি পর্ন ক্লিপও পাঠিয়ে থাকে অনেকে। সব মিলিয়ে সেখানে নিপীড়নমূলক যৌনতাভিত্তিক একটা সমাজের প্রতিচ্ছবিই যেন ফুটে ওঠে।

অন্যান্য অনেক জায়গায় সহিংসতার পাশাপাশি রাজনীতিতেও প্রায় সময় উত্তাল ও সহিংস পরিবেশ বিরাজ করে। এই কারণে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দেশের রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহিংস পরিবেশকেও দায়ী করা যায়। সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলমের মতে, দেশের রাজনীতি ও নির্বাচনী সহিংসতা এবং সংঘাতের দিকে হাঁটার কারণেই দলের কার্যক্রমে ও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ কম একটি বড় কারণ[৪৭৬]।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. রওনক জাহান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক থাকলে সংঘাতের রাজনীতি থাকত না। ১৯৯১ সালের পর থেকে কে কীভাবে ক্ষমতায় যাবে, দলগুলো এ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে সংঘাত বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, ক্ষমতায় গেলে অন্তর্দলীয় কোন্দল বেড়ে যায়। ক্ষমতায় থাকাকালে নেতা যদি চান, দলকে সংগঠিত ও সংস্কার করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন না। কারণ,

---

৪৭৫. রোকেয়া কবীর, *নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ*, দৈনিক যুগান্তর, ১৩ জুন ২০১৯

৪৭৬. বদিউল আলম মজুমদার, *রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়?*, প্রথম আলো, ১৩ মার্চ ২০১৮

তাঁরা মনে করেন, নির্বাচনে যদি হেরে যান, তখন মাস্তান লাগবে[৪৭৭]। তাঁর কথায় বুঝা গেলো, ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায়ও মাস্তানদের পৃষ্ঠপোষকতা দেন নোংরা রাজনীতির প্রয়োজনে। যে রাজনীতিতে মাস্তান গুরুত্ব পায়, সেই সহিংস রাজনীতির প্রতি স্বাভাবিকভাবে নারীর আগ্রহ কম থাকে।

আইনগত সীমাবদ্ধতা

দেশে এতো কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ না হওয়ার কারণ কী? নানা কারণ রয়েছে এর পেছনে। পুরুষের অনুন্নত মূল্যবোধ, দেশে ও সমাজে নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের পাশাপাশি আইনের মধ্যেও নানা সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকফোকর রয়েছে। নারীর নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানে ত্রুটি ও ফাঁকফোকর থাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা যেমন রোধ হচ্ছে না, তেমনি অন্য অনেক ক্ষেত্রেও নারীর উন্নয়ন আশানুরূপ হচ্ছে না।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বেশ কঠিন হওয়ায় এবং এটার মধ্যে ত্রুটি থাকায় এই আইনে সহিংসতার শিকার নারী ও শিশু বিচার না পেয়ে উল্টো বহু নিরপরাধ পুরুষকে হয়রানীর কাজে আইনটির অপপ্রয়োগ বেশি হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার বহু নারী নির্যাতনের পর পুনরায় মানহানি ও হয়রানির ভয়ে এগোতে চায় না। আবার বিচার পায় মাত্র ৩ শতাংশ[৪৭৮]। অর্থাৎ সহিংসতার শিকার ৯৭ শতাংশ নারী বিচার পায় না। ভিকটিম যদি বিচার না-ই পায়, তাহলে এমন আইন নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করবে কিভাবে? বিষয়টি খোদ আইন কমিশনের একটি রিপোর্টেও উঠে এসেছে। আইন কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণ সন্তোষজনক নয়। বিগত বছরগুলোতে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের অসংখ্য ঘটনা ঘটলেও অল্পসংখ্যক আসামী শাস্তি বা দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। আইনটির অপপ্রয়োগের হারও আশংকাজনক[৪৭৯]।'

দেখা যায় যে, নারীরা রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা অপমান, চরিত্রের ওপর হামলা, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েও হয়রানি ও অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়[৪৮০]। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ত্রুটিপূর্ণ আইন থাকলেও রাজনীতিতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলার জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। আইনের সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে আইনের

৪৭৭. দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ এপ্রিল ২০১৫
৪৭৮. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত
৪৭৯. বাংলাদেশ আইন কমিশন, রিপোর্ট নম্বর: ১৫৮ *'নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০২১ সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়নের ধারণাপত্র'*
৪৮০. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

শাসনের অভাব এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সামগ্রিক উন্নয়নে ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

অনেক আইন ও বিধানের মাধ্যমে নারীর জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু আইন ও বিধানের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতার সুযোগ নেয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ; ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে না সহজে। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যদের মূলধারার রাজনীতি ও ভোটারদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। আইন প্রণয়ন, সংসদীয় কার্যাবলী এবং অন্য অনেক কাজে তাদের সেরকম অংশগ্রহণ নেই। রওনক জাহান উল্লেখ করেন, কদাচিৎ সংরক্ষিত আসনের সদস্যরা নারীর সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করেন। সংরক্ষিত আসনের নারীরা কেবলই Status quo[৪৮১] বজায় রাখেন[৪৮২]। নারী সদস্যদের এমন হওয়ার কারণ আইনগত সীমাবদ্ধ। সংবিধানে লেখা আছে, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন থাকবে; কিন্তু তাদের কাজ সুনির্দিস্ট করে দেওয়া হয়নি।

স্থানীয় সরকারেরও বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা যায়, অনেক নারী খুব উৎসাহ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়; কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর কাজের পরিবেশ পায় না। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে পরিষদের পুরুষ সদস্যরা যেমন নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজ করার সুযোগ খুব একটা দেন না; তেমনি আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিরাও তাদের কাজের সুযোগ আদায় করে নিতে পারেন না। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মেয়র বা চেয়ারম্যান ছাড়া বাকি যেসব সদস্য/কাউন্সিলর নির্বাচিত হন, তারা প্রত্যেকে একেকটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়ে আসেন। আর সংরক্ষিত আসনের নারীদের প্রত্যেককে তিন ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হয়। যিনি একই সাথে তিন ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন, তার ক্ষমতা ও কার্যপরিধি এক ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধির চাইতে তিনগুণ বেশি হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, তিন ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত নারী সদস্য সাধারণ এক ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যের চাইতে অর্ধেকও কাজ করার সুযোগ পান না। সেখানেও নারী জীবনের সহিংসতা ও অসম্মানের বিষয়ও থাকছে। নির্বাচিত সদস্য বলে তাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে না। আইন ও বিধি-বিধানে নারীর কাজ স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকায় নারী প্রতিনিধিরা কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না।

---

৪৮১. Status quo (স্ট্যাটাস কো) একটি ল্যাটিন বাগধারা। এটার দ্বারা বুঝানো হয় এমন একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি যা ইতোমধ্যে বিদ্যমান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত লোকজন এটাকে সহজে গ্রহণ করে নেয়।

৪৮২. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

পরিবারতন্ত্র

নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী নয়, জনগণের মধ্যে ক্ষমতা থাকবে এমন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে পুরোপুরী গণতন্ত্রের সংস্কৃতি চালু হয়নি। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চার ব্যাপক অভাব রয়েছে। দলে ও রাজনীতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব দিন দিন প্রকট হচ্ছে। দেশ ও সরকারের ওপরও ব্যক্তি ও পরিবার-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু পরিবারকর্তৃক দেশ শাসিত হচ্ছে কয়েক দশক থেকে। বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতন্ত্র আজ পরিবারতন্ত্রে রূপ নিয়েছে[৪৮৩]। দল, রাজনীতি, দেশ ও সরকারে যেখানে পরিবারের ভূমিকা মুখ্য এবং জনগণের ভূমিকা গৌণ, সেখানে জনগণ থেকে সহজে নেতৃত্ব উঠে আসবে না। আর সেটা না হলে নারীর মধ্য থেকেও সহজে নেতৃত্ব উঠে আসবে না।

আরো বিভিন্ন দেশে পরিবারতন্ত্র আছে। তবে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে এর প্রভাব বেশ মারাত্মক। দক্ষিণ এশিয়ায় মূলত নারীরা রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। এই অঞ্চলে প্রধান দলগুলোর নেতৃত্ব একই পরিবারের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মকে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে সীমিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বস্তরে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অন্যতম অন্তরায়[৪৮৪]।

বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর চেয়ারম্যান বা সভাপতি পদে যারা আছেন তারা তাদের দলে খুবই শক্তিশালী এবং বহু বছর ধরে একই পদে আছেন। দলীয় প্রধান মারা গেলেও একই পদে আসছেন পরিবারের কেউ। দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ নির্ধারিত হচ্ছে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কার্য্যক্রম অনুযায়ী। দুই পরিবার দ্বারা দুই দলই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিএনপির মরহুম নেতা ব্যরিষ্টার মওদুদ আহমদের লেখায় সেটা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। তিনি বলেন, 'হাসিনা ও খালেদা যতদিন পর্যন্ত দেশে আছেন, তারা বন্দী আর মুক্ত যা-ই থাকুক না কেন, তারাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে যাবেন[৪৮৫]।' দলীয় প্রধানই কেবল পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে আসেন না, দলের অন্যান্য পর্যায়েও একই ধারা বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভীর ২০১৫ সালের একটি বক্তব্যে এমন বাস্তবতা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'মাঠপর্যায়ে নেতৃত্ব নির্বাচন

---

৪৮৩. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh*, Ibid, p. 26-27

৪৮৪. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

৪৮৫. মওদুদ আহমদ, *কারাগারে কেমন ছিলাম (২০০৭-২০০৮)*, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩), পৃ. ৮০

করার ক্ষেত্রে কয়েকটি কাউন্সিলে উপস্থিত থেকে যেমনটি দেখেছি, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের পর বাকি পদগুলো পূরণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করা হয়। একজনের এক ভোট- এ ব্যবস্থায় তাঁরা ভোটে যেতে চান না[৪৮৬]।' ফলে দেখা যায়, কেউ একজন হয়তো কোন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কোন ভাল পদে আছেন কিংবা কেন্দ্রে অবস্থান শক্তিশালী; উনার নিজ জেলার জেলা কমিটি এবং তৃণমূলের অন্যান্য কমিটি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে উনার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে প্রাধান্য পান।

প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে যেমন পরিবারতন্ত্র বিদ্যমান, দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলেই তেমনি পরিবারতন্ত্র বিদ্যমান। বর্তমান একাদশ সংসদের প্রধান বিরোধি দল জাতীয় পার্টিও বিএনপির মতো জন্মের পর থেকে পরিবারের বলয়ে আছে। দলটির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ মারা গেলে দলের নিয়ন্ত্রণ নেন তাঁর স্ত্রী ও ভাই যথাক্রমে রওশন এরশাদ ও জিএম কাদের। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর, তাঁর মৃত্যুর পর দলটির চেয়ারম্যান হয়েছেন তাঁরই ছেলে ব্যরিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ। জাতীয় পার্টির আরেক অংশের চেয়ারম্যান ডা. এমএ মতিনের মৃত্যুর পর এই অংশের নেতৃত্বে আছেন তাঁরই ছেলে ডা. এমএ মুকিত। জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) এর সভাপতি শফিউল আলম প্রধানের মৃত্যুর পর দলটির নেতৃত্বের আসনে বসেন তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা রেহানা প্রধান, এবং তাঁরও মৃত্যুর পর দলের সভাপতি হন তাদের মেয়ে ব্যরিস্টার তাসমিয়া প্রধান। এভাবে রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবারতন্ত্র খুবই শক্তিশালী।

দেখা যায়, একজন নারী মাঠঘাটের রাজনীতি করেও যথাযথ মূল্যায়িত হন না। পরিবারতন্ত্রের কারণে রাজনীতিতে অন্য একজন আনকোরা নারী সহজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। ফলে অনেক নারী রাজনীতিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে সাধারণত দলীয় প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত থাকেন দলের পদ-পদবী দেওয়ার ব্যাপারে। এই গুলোতে পরিবারতন্ত্র বিদ্যমান এবং পরিবারতন্ত্রের প্রভাব দলের অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃত্বেও পড়ে[৪৮৭]।

সংরক্ষিত আসনের সাবেক এমপি সাবিনা আক্তার তুহিন একবার বিবিসির সথে আলাপকালে বলেছিলেন, পরিবারতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নারী এমপি নির্বাচন না করে একজন নারীর অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

[৪৮৬]. দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ এপ্রিল ২০১৫

[৪৮৭]. Mohammad Faisal Akbar, *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh,* Ibid,, p. 26

এমপি নির্বাচন করলে সংরক্ষিত আসনের এমপিরা সংসদে আরো গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারবে[৪৮৮]। তাঁর এ কথায় দু'টো দিক ফুটে ওঠে। প্রথমত বেশিরভাগ নারী এমপি যে পরিবারতন্ত্রের কারণে পদ-পদবী পেয়ে যান বা এমপি হন, সেকথার প্রতিফলন রয়েছে। দ্বিতীয়ত পরিবারতন্ত্র নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নিরব প্রতিবন্ধকতা, সেকথারও প্রতিফলন রয়েছে।

পারিবারিক ও উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে নারীর আগমনের বিষয়টি অন্যান্য দেশেও আছে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মাত্র ৭০ জন নারী মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এদের অর্ধেকেরও বেশি কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়েছেন কেবল তাঁদের পুরুষ আত্মীয়রা কংগ্রেসে নির্বাচিত হওয়ার পর। আর বাকি অর্ধেক নিযুক্ত কিংবা নির্বাচিত হয়েছেন সাধারণত তাদের স্বামী মারা যাওয়ায় কংগ্রেসের শূন্য পদে[৪৮৯]। তবে সেসব দেশে পরিবারতন্ত্রের প্রভাব ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

আমাদের দেশের নারী এমপিদের ব্যাপারে পর্যালোচনা করে বলা যায়, তাঁদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ এমপি হন উত্তরাধিকার সূত্রে; পিতা, স্বামী কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের আসন হিসেবে পরিচিত আসন থেকে নির্বাচন করে। ২০১৭ সালে দশম সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম সে সময় মন্তব্য করেন, 'ট্রেন্ডটা হচ্ছে, আপনারা দেখবেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির স্ত্রী বা কন্যাকে নমিনেশন দেওয়া এবং অন্য একজন নতুন নারী প্রার্থীকে নমিনেশন না দেওয়া। এর কারণ, ওই এলাকায় আগে থেকেই ওই মেয়েটির (জনপ্রতিনিধির স্ত্রী/কন্যা) একটি অবস্থান থাকে। পার্টি কিন্তু তখন আর রিস্ক নিচ্ছে না[৪৯০]।'

নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি

রাজনৈতিক দলে ও দেশে নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতিতে রাজনীতি করে সাধারণ পরিবারের একজন নারীকে এমপি হওয়া, দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়া, নীতি-নির্ধারণী ফোরামে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ কঠিন। একবার এক আনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহানসহ আরো অনেকে বলেন, বাংলাদেশের তাত্ত্বিক গণতন্ত্র, সুষ্ঠু দলব্যবস্থা ও বহুত্ববাদের ধারক হলেও

---

৪৮৮. বিবিসি, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯

৪৮৯. রিটা মে কেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪৯০. বিডিনিউজ, ১২ মার্চ ২০১৭ (https://bangla.bdnews24.com/politics/article1301775.bdnews)

প্রয়োগের দিক থেকে বিশাল ফারাক রয়েছে। এখানে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি পরিণত হয়েছে 'পার্টিক্রেসি'তে[৪৯১]। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর রিজভী দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই সেটা স্বীকার করে বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র নেই, এটা অস্বীকার না করেই বলছি, তারপরও এই রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে কিছু দিতে পারছে[৪৯২]।' এমন বাস্তবতার পর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমাদের দেশে নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতি রয়েছে। কারণ ডেমোক্রেসি পার্টিক্রেসিতে পরিণত হওয়ার ফলে বহু যোগ্য পুরুষও যেখানে বঞ্চিত হচ্ছে, সেখানে রাজনীতিতে নারীর অগ্রগতি আরো বহুদুর থেকে যায়।

রাজনীতিতে নারীবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চা। গণতান্ত্রিক পরিবেশের অনুপস্থিতি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা। যেসব দেশে রাজনীতিতে নারী ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেসব দেশে সাধারণত দেখা যায় গণতন্ত্রের চর্চা রয়েছে। যেসব দেশে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা অন্য কোন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান, সেসব দেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকারও অনেকটা সংকুচিত।

রাজনীতিতে যুক্ত হতে গিয়ে কিংবা পদ-পদবী পেতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় নারীকে রাজনৈতিক নেতাদের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়তে হয়। কোন কোন সময় এমনো অভিযোগ পাওয়া যায় যে, পদ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে নেতা ব্যবহার করেছেন কোন নারীকে, কিন্তু সেই পদ আর ওই নারীর ভাগ্যে জোটেনি। ২০২০ সালের বহুল আলোচিত পাপিয়াকণ্ড নিয়ে আলোচনায় এসব দিক পরিস্কার হয়ে যায়। পাপিয়া ঘটনায় অনেক বিষয়ের সঙ্গে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে তা হচ্ছে, রাজনীতিতে পদ-পদবি পেতে নারীর জন্য যে জিনিসটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে তা হল যৌনতা। এসবকে কাজে লাগিয়েই পাপিয়া নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ পান। মিডিয়ায় প্রকাশ, পাপিয়া নাকি ১০ কোটি টাকা ঘুষ দেন এমপি হওয়ার জন্য। সেই টাকা যৌনতার মাধ্যমে কামানো। এমন ঘটনা প্রমাণ করে, পাপিয়া আসলে একটি শ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করেন যে শ্রেণির আকার রাজনীতিতে বাড়ছে প্রতিদিন[৪৯৩]। রাজনৈতিক দলে নারীর জন্য পদ-পদবীর ক্ষেত্রে যদি যৌনতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এমন পরিবেশে দেশে অনেক নারী রাজনীতিতে আসতে আগ্রহ বোধ করবে না। কারণ এমন পরিবেশ রাজনীতিতে নারীর অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে ফেলে, যোগ্য একটি মেয়েকে রাজনীতিবিমুখ করে তোলে।

---

৪৯১. দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ এপ্রিল ২০১৫

৪৯২. প্রাগুক্ত

৪৯৩. রুমিন ফারহানা, *যোগ্য নারীদের রাজনীতিতে আসার পথ রুদ্ধ করছে যারা*, দৈনিক যুগান্তর, ১০ মার্চ ২০২০

একাদশ সংসদের বিএনপি দলীয় নারী এমপি ব্যরিষ্টার রুমিন ফারহানা তাঁর একটি লেখায় লিখেন, 'নারীর জন্য রাজনীতির পথ যে শুধু অনিশ্চিত তাই নয়, বাংলাদেশের মতো দেশে এর চেয়ে অনিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ, পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত, ঈর্ষা-বিদ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা-প্রতিশোধপরায়ণতাপূর্ণ কোনো ক্ষেত্র আছে বলে আমার জানা নেই। রাজনীতির আর সব কষ্ট, ঝুঁকি মোকাবেলা করা একজন নারীর জন্য খুবই কষ্টকর সন্দেহ নেই; কিন্তু চরিত্রের ওপর এ অপবাদ অগ্রাহ্য করে এ সমাজের ক'জন নারী পারবে রাজনীতিতে আসতে?[৪৯৪]'

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নারী সৃষ্টির পরও নারীদের কর্ম ও যোগ্যতার যথাযথ স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এখনো হচ্ছে না। বহুক্ষেত্রে যোগ্য নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং নারীদের মর্যাদা ও মূল্যায়নকে পুরুষদের তুলনায় খাটো করে দেখা হয়। তাদের ওপর বর্বর আক্রমণের ঘটনাও ঘটে বিভিন্ন সময়। এসব কারণে নারীরা অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে চায় না; এমন অবস্থা নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও।

রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব

বাংলাদেশের নারীশক্তি সন্দেহ নেই এক প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি, এই প্রচণ্ডতা সংঘবদ্ধ হলে একদিন নারীরা বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এক বিপুল ব্যাপকতা নিয়ে এদেশের অনেক সমস্যার মূলোৎপাটন ঘটাতে সক্ষম হবেন[৪৯৫]। কিন্তু এক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোরও সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। তারা চায় না যে, নারীরা বিপুল ব্যাপকতা নিয়ে এগিয়ে যাক। এই কারণে নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা খুব একটা নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কিছু উদ্যোগ নিতে; কিন্তু সেটা আইনি বাধ্যবাধকতা এবং আরো নানা কারণে। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে নারীর ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর বিভিন্ন প্রকল্প পেতে[৪৯৬]। রওনক জাহানও লিখেন, 'তৎকালীন সামরিক সরকার তাদের ভিত্তিকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে দাতাদের সহযোগিতায় নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে[৪৯৭]।'

---

৪৯৪. রুমিন ফারহানা, *যোগ্য নারীদের রাজনীতিতে আসার পথ রুদ্ধ করছে যারা*, প্রাগুক্ত

৪৯৫. কবি আল মাহমুদ, *নারীনিগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪৯৬. Sohela Nazneen, Naomi Hossain & Maheen Sultan, *National Doscourses on Women's Empowerment in Bangladesh: Continuities and Change* (Dhaka: BRAC Development Institute (BDI Working Paper: 3, BRAC University), 2011), P. 38

৪৯৭. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় নারী নির্যাতন ও সহিংসতা রোধে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এক নিবন্ধে লিখেন, 'বর্তমানে দু'টি বৃহৎ দলের উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সামাজিক আন্দোলন করতে দেখা যায় না[৪৯৮]।'

সংসদের সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের খুব একট মূল্যায়ন করে না দলগুলো। নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষরাই অগ্রাধিকার পায়। অথচ নির্বাচনী প্রচারণা, সভা ও র‍্যালিতে নারীকে ব্যবহার করা হয়[৪৯৯]। প্রায় সময় দেখা সময় মিছিলের সামনে নারীকে রাখা হয়, কিন্তু নারীকে রাজনৈতিক দলগুলো সহজে নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় আনতে চায় না। নির্বাচনী রাজনীতিতে অস্ত্র ও পেশীশক্তির উত্থান নারী প্রার্থিতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে[৫০০]।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এবং আরো বিভিন্ন কারণে সদিচ্ছার অভাব থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াচ্ছে, যদিও সেটা আশানুরূপ নয়; কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও তৃণমূলে নারীর জন্য সুযোগই দিতে চায় না। ২০১৯ সালে নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়ন মহিলালীগের ৫ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফেরদৌসি আহমেদ বিবিসির সাথে আলাপকালে আক্ষেপ করে বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত থাকলেও মূল দলের স্থানীয় কোন কমিটিতেই এতদিনে আসতে পারেননি। তিনি বলেন, 'আমি তো মহিলালীগের মধ্যেই আটকে আছি। আসলে নারীদের কেউ প্রধান্য দিতে চায় না। আওয়ামী লীগের ভিতরে আমাদের তেমন গুরুত্ব দেখিনা[৫০১]।' রূপগঞ্জে বিএনপিতেও একই অবস্থা। রূপগঞ্জ উপজেলা বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা হাওয়া বেগম বিবিসিকে বলেন, দলের ১০১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিতে তিনিসহ নারী আছেন মাত্র চার জন। দলে স্থানীয়ভাবে যেমন নারীদের খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি যারা নারী নেত্রী আছেন, তারাও উচ্চাকাঙ্খী নন। তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি করি ১৯৯১ সাল থেকে। এতোদিনে আমার অর্জন হলো কমিটির মহিলা সম্পাদিকা। আমার সময়কার পুরুষ নেতারা এখন অনেক বড় বড় পোস্টে। আমাদের গুরুত্ব কম দেওয়া হয়[৫০২]।'

---

৪৯৮. সাদেকা হালিম, *নারী, রাজনীতি ও অধস্তনতা*, প্রাগুক্ত

৪৯৯. প্রাগুক্ত

৫০০. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান, *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫০১. বিবিসি বাংলা, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯

৫০২. প্রাগুক্ত

সুপারিশমালা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে এবং জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সময়ে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে; যদিও নানা কারণে ইদানিং কিছুটা ভাটাও পড়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর রাজনীতি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান, চলমান বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে গবেষণালব্ধ কিছু প্রস্তাবনা পেশ করছি:

১. কট্টর ধর্মীয় মনোভাব ও ধর্মীয় অপব্যাখা পরিহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

ইসলাম ধর্মের অনুসারী যারা আছেন, তাদের বড় একটি অংশের মধ্যে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে কট্টর মনোভাব রয়েছে; সে সাথে কুরআন-হাদীসের নারী সংক্রান্ত বাণীগুলোর ব্যাপারে উপলব্ধির অভাব ও ভুলব্যাখারও অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে, হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারী পুরোপুরি বঞ্চনার শিকার। ফলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং আরো বিভিন্ন অধিকারের ব্যাপারে খুবই কট্টর অবস্থানে থাকেন। যাহোক, ইসলামে নারীর অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি পুরোপুরী স্বীকৃত। বাংলাদেশের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ফলে এদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকারের চর্চার সাথে মুসলিম সমাজের জনমানসের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে অনেকের কট্টর ধর্মীয় মনোভাব এবং নারীর বিষয়ে ধর্মের ভুল ও অপব্যাখা দুরীকরণে যা করা যায়-

(ক) নারী নেতৃত্ব হারাম, ইসলামে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই- এসব ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুসলিম সমাজকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়ন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে নারী স্বাধীনতা, বহিঃস্থ কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক কর্মাকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ, পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে নারীর রাজনীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচরণের অনাগ্রহ বা কমতির কারণ নিয়ে বিভিন্ন শিরোনামে যুগোপযোগী গবেষণা করা। এসব বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার পাশাপাশি আলেম সমাজকেও গবেষণায় এগিয়ে আসা।

(খ) ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং বিভিন্ন যুগে যেসব নারী নিজের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, যারা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন কিংবা জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে বা মানবসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ অবদান রেখেছেন; তাদের অবদান এবং সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে কাজ করা ও গবেষণা করা এবং তাদেরকে নিয়ে বই রচনা করা ও প্রকাশ করা।

(গ) ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করার জন্য আলাদা গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সামগ্রিকভাবে নারী ইস্যুতে কাজ করে বাংলাদেশ মহিলা সংস্থা, কর্মজীবি নারীসহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। ফলে এমন একাধিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার যারা সময় সময় নারী ইস্যুতে ইসলামের সঠিক ব্যাখা তুলে ধরবে; সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়েজন করবে; নারী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তদারকি করবে; এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে। একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধিনে নারীর অধিকার বিষয়ক একটি সেল গঠন করা যায়। একই কাজ করা যায় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে।

২. পাঠপুস্তকে ও উচ্চশিক্ষায় নারী বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভূক্তি

নারীর নানামুখী কার্যক্রমের ব্যাপারে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে পাঠ্যপুস্তক ও উচ্চশিক্ষায় নারী বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভূক্তি করা দরকার। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার বিষয়ে যেসব পাঠ্যক্রম আছে, সেখানে বিভিন্ন সংযুক্তি ও সেগুলোকে পরিমার্জন করে আরো সমৃদ্ধ করা করা দরকার। পাঠ্যক্রমে নারী বিষয়ে পাঠ ভূক্তি বিষয়ে যা করা যায়-

(ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিয়ে পাঠ অন্তর্ভূক্ত করা। যেসব বইয়ে অল্প পরিমাণে যেটুকু আছে, সেটুকুকে পরিমার্জন করে এমনভাবে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা, যাতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে ভুল ধারণা দূর হয় এবং স্কুল জীবন থেকেই একটি মেয়ে শিক্ষার্থী তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়। সে সাথে একটি ছেলে শিক্ষার্থীও যেন স্কুল জীবনেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা পায় এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ পরিহার করতে পারে।

(খ) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখার জন্য সাধারণ মানুষ সাধারণত কওমী মাদ্রাসা থেকে আগত আলেমদের উপর বেশি নির্ভর করে। কিন্তু দেখা যায়, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষিতরা এবং এ ধারা-কেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী নারীর ব্যাপারে বেশি কঠোর মনোভাব পোষণ করে থাকেন। তাই দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোর দাওরায়ে হাদীসের ক্লাসসহ বিভিন্ন ক্লাসে 'ইসলামে নারী অধিকার' বিষয়ক সম্পূর্ণ আলাদা ও পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করা এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা দরকার। এই কাজটি বাস্তবায়নে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাবোর্ড 'আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ'- কে কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ এই

বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে এবং কওমী মাদ্রাসার জন্য আলাদা একটি নীতিমালা তৈরী করে সেখানে নারী ইস্যুটি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। এই নীতিমালায় উল্লেখ থাকবে যে, দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতে যাতে ইসলামের নারী অধিকার সংক্রান্ত পাঠ যেন পূর্ণাঙ্গভাবে দেওয়া হয়।

(গ) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামিক স্টাডিজ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, পপুলেশন সাইন্স ইত্যাদি বিষয়ে 'ইসলামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন' বিষয়ে আলাদা কোর্স চালু করা। যেসব বিভাগে এরকম কোর্স চালু আছে, সেটাকে আরো পরিমার্জিত ও গতিশীল করা।

৩. নারীর উচ্চ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া

নারীর ক্ষমতায়নের নারী শিক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বাংলাদেশে নারী শিক্ষার উপর এখন যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। অন্য আরো অনেক দেশে নারী শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষা, কর্ম, চিকিৎসাসহ কোন ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না রাখার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীরা পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্তরে কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু সেটা এখনো তুলনামূলকভাবে কম।

উচ্চশিক্ষায় নারীর উপস্থিতি বাড়লে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং আরো বিভিন্ন অধিকার সে সহজে আদায় করে নিতে পারবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, এটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু মাদরাসাগুলোতে নারী শিক্ষার হার এখোনো তুলনামূলক কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায়ের ক্লাসগুলোতে, যেমন আলিয়া মাদ্রাসার কামিল এবং কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসে পড়ুয়া নারীর সংখ্যা নিচের দিকের ক্লাসগুলোর চাইতে আনুপাতিক হারে খুবই কম। কওমী মাদ্রাসায় নিচের স্তরের ক্লাসগুলিতেও ছাত্রীদের সংখ্যা একেবারেই কম। অনেক জায়গায় মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও কামিল বা দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা দেশে খুব একটা নেই। সরকারীভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার যাতে কামিল/দাওরায়ে হাদীস ক্লাস পর্যন্ত ছাত্রীদের সংখ্যা নিচের ক্লাসগুলোর চাইতে আনুপাতিক হারে খুব একটা কমে না আসে এবং উচ্চ ক্লাস পর্যন্ত দেশে মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায়। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগে আলাদা

একটি ডেস্ক তৈরী করে সেখানে একজন যুগ্ম সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া যায়। নারীর উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করা দরকার যাতে পরিবারও উদ্যোগী হয়ে নারীকে উচ্চশিক্ষিত করতে আগ্রহী হয়। নারী উচ্চশিক্ষিত হলে তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়নও হবে।

৪. নারীকে সরাসরি নির্বাচিত করিয়ে নিয়ে আসা

নারীর জন্য সংসদে ৫০টি আসন সংরক্ষিত, যেখানে নারী এমপি নির্বাচিত হন, আসলে তারা নির্বাচিত হননা, দলীয় সিদ্ধান্তে কিছু নারী এমপি হয়ে যান; কিন্তু বিধান অনুযায়ী বলা হয় নির্বাচিত। এই সংরক্ষিত আসনের নারী এমপি মূলত প্রতীকি। যখন এটা করা হয়েছিল, তখনকার প্রেক্ষাপটে ঠিক ছিল। প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীকে নিয়ে এখন যা করা যায়:

(ক) সংসদের নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিধানটি অব্যাহত রাখা যায়; কিন্তু বর্তমান এই পদ্ধতি পরিবর্তন করে এই ৫০ জনকে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত করিয়ে নিয়ে আসার বিধান করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি সদস্য পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এক সময় তারা সরাসরি নির্বাচিত হতেন না, পুরুষ প্রতিনিধিদের দ্বারা মনোনীত হতেন। ১৯৯৭ সাল থেকে ইউপিতে এই তিন নারী সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এমনি করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় নারী সদস্যদের আসন সংরক্ষিত থাকে এবং তারা সরাসরি নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত এই ৫০টি আসনেও নারীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান করা দরকার। বিশাল একটি নির্বাচনী আসন থেকে নারীকে নির্বাচন করিয়ে নিয়ে আসা বেশ জটিলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিকল্প কিছু বিষয়ও ভাবা যায়।

I. এখনকার নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনে নারীকে নির্বাচিত করিয়ে আনা যায়; তবে সংসদের সংরক্ষিত আসনে এমন নারীদের মধ্য থেকে সংসদে নিয়ে আসতে হবে যাদের ইতোপুর্বে প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অতীতে নির্বাচিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কিংবা অতীতে সরাসরি নির্বাচনে এমপি হয়েছেন এমন নারীও সংরক্ষিত আসনের জন্য মনোনয়ন পেতে পারেন।

II. এভাবে ৫০টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত না রেখে বিধান করা যায় যে, যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, তারা যে সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন দেবে তার কমপক্ষে শতকরা ৩৩ ভাগ প্রার্থী নারী

হতে হবে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা 'আরপিও'তে নিবন্ধিত সব দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী রাখার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে প্রত্যেক নির্বাচনেও অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল থেকে প্রার্থী হিসেবে ৩৩ শতাংশ নারীকে রাখার বিধান যুক্ত করে এটাকে বাধ্যতামূলক করা যায়। তাহলে দেখা যাবে, সরাসরি সাধারণ নির্বাচনী আসন থেকে বহু নারী নির্বাচিত হয়ে আসবে। সংরক্ষিত ৫০টি সহ বর্তমান একাদশ সংসদে মোট ৩৫০ আসনের মধ্যে ৭৩ জন সদস্য নারী। যদি রাজনৈতিক দলগুলোর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ৭৩ এর বেশি সংখ্যক নারী সাধারণ আসন থেকেই চলে আসবেন।

(খ) নির্বাচনে ৩৩ ভাগ নারী প্রার্থী দেওয়ার বিধান করলেও সেটা কার্যকর করতে আরেকটু সময়ের প্রয়োজন। এখন সংসদে সংরক্ষিত আসনের যেসব নারী এমপি আছেন, তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা দরকার। এসব এমপির কার্যপরিধির ব্যপ্তি বা দায়িত্বের বিষয়ে সংবিধানে আলাদাভাবে কিছু উল্লেখ নেই। শুধু বলা আছে, সংসদে নারীর জন্য আলাদা সংরক্ষিত আসন থাকবে। ফলে এসব নারী এমপি সংসদে এবং রাজনীতিতে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারছেন না; কেবলই সাজ হিসেবে আছেন তারা। সংসদের যারা সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য আছেন তাদের সমান সুবিদা থাকা উচিত। নারী সদস্যদের কার্যপরিধি স্পষ্ট করা দরকার। আইনপ্রণয়ন, সংসদের বিভিন্ন কার্যাবলী এবং আরো বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদেরকে সক্রিয় করার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ।

(গ) সংসদে যারা নারী সদস্য আছেন, তাদের নিজেদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সরকার এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ নারী এমপিদের সক্রিয় করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিক আর না-ই নিক; নারী এমপি যারা আছেন তারা নিজেরাও সংসদীয় কার্য্যক্রম এবং আরো বিভিন্ন কার্য্যক্রমে নিজেদের আগ্রহ ও উদ্যোগে আরো সক্রিয় হবেন।

৫. নারীর জন্য উপরাষ্ট্রপতি, ডেপুটি মেয়র, ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা

বাংলাদেশে বিভিন্ন আমলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা উপরাষ্ট্রপতির একটি পদ ছিল। সর্বশেষ এরশাদের আমলে এই পদটি ছিল এবং ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদের পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের সর্বশেষ উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। সংবিধান সংশোধন করে এই পদটি আবারো ফিরিয়ে আনা দরকার। বিধান এভাবে করা দরকার যে, রাষ্ট্রপতি যদি পুরুষ হন, তাহলে নারীর জন্য উপরাষ্ট্রপতি পদটি সংরক্ষিত থাকবে।

একইভাবে আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই দ্বিতীয় প্রধান পদটি সৃষ্টি করা দরকার। যেমন উপজেলা পরিষদে দুই জন ভাইস চেয়ারম্যানের একটি পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত আছে; কিন্তু সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে নারীর জন্য কাউন্সিলর ও সদস্য পদ সংরক্ষিত থাকলেও ডেপুটি মেয়র ও ভাইস চেয়ারম্যান পদ নেই। তাই আইন সংশোধন করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দুইটি ডেপুটি মেয়র পদ সৃষ্টি করা দরকার, যেখানে একটি পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্যদিকে জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে উপজেলা পরিষদের মতো নারীর জন্য একটি ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা দরকার। একবার ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটা পরে আবার বিলুপ্ত করা হয়। তবে সেই ভাইস-চেয়ারম্যান পদটি সংরক্ষিত ছিল না; এখন দুইটি করে একটি পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। এটা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬. নারীর জন্য দলে পদ সৃষ্টি করা

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩% নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের শর্ত দেওয়া হয়েছে। এই শর্ত পূরণ হলে অনেক নারী দলের কমিটিতে স্থান পাবেন। কিন্তু দলের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এবং তৃণমূলের বিভিন্ন কমিটিতে প্রভাব বিস্তার করার মতো অবস্থানে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হলে দলীয় গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নারীকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসতে হবে। যেমন দলের প্রেসিডিয়াম, স্থায়ী কমিটি এবং নির্বাহী কমিটি বা কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক পদের মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা; একইভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলোতেও এসব পদে এক তৃতীয়াংশ নারী রাখা।

৭. নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করা

দেশে নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণে অনেক নারীর রাজনীতিতে আগ্রহ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর নেতৃত্বের বিষয়ে অঙ্গীকার পূরণ করতে হলে তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। তবে সংখ্যা পূরণই একমাত্র প্রতিকার নয়। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে অবকাঠামোগত উন্নয়নও করতে হবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য। অবকাঠামোগত ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির সাথে রাজনৈতিক নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এমন উন্নত পর্যায়ে নিতে যেতে হবে, যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যেন আগ্রহী হয়। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে, তাহলে তৃণমূল থেকেও নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। দলীয় কাউন্সিলে ডেলিগেটদের প্রত্যক্ষ ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে যারা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের একটি বড় অংশ ছাত্ররাজনীতি থেকে উঠে এলেও দীর্ঘদিন ধরে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ছাত্রসংসদ নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলে নারীবান্ধব রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য এটা সহায়ক হবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে বহু নারী রাজনীতিতে উৎসাহিত হয় না। এজন্য প্রয়োজন পুরুষের উন্নত মূল্যবোধ, নৈতিকতার বিকাশ, সুশাসন এবং দেশে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা। প্রচলিত আইনও যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ হতো, তাহলে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেকাংশে কমে যেতো, যদিও বর্তমান আইনটি যুগোপযোগী নয়। আইন কমিশনের এ সংক্রান্ত সুপারিশ আমলে নিয়ে একটি বাস্তবসম্মত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন তৈরী করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার ঠিকমতো হলে দেশে সহিংসতা কমবে, যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নিয়মের মধ্যেও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে। নিয়ম করা যেতে পারে, যাদের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি সহিংসতার অভিযোগ উঠবে, তারা রাজনৈতিক দলের পদ-পদবী থেকে বঞ্চিত হবে এবং যে কোন পর্যায়ের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. ইসলামী দলগুলোকে কট্টরপন্থা পরিহার করতে হবে, নারীর জন্য জায়গা দিতে হবে

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে দেশের আলেম-উলামা, ইসলামপন্থী জনগোষ্ঠী এবং ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোকে কট্টরপন্থা পরিহার করতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উদাহরণগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি-তর্ক আর ফেতনার আশংকার দোহাই দিয়ে নারীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার চর্চা থেকে বিরত রাখার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। নিজদের দল থেকে নারীর অংশগ্রহণ দূরে রেখে দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সহজে সফল হতে পারবে না। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, অন্যকথায় ভোটের রাজনীতিতে অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী ভোটার। রাসূল (সা.)

তাঁর আন্দোলন-সংগ্রামে নারীকে পেছনে রাখেননি। নারী-পুরুষ উভয়কে রেখেই দ্বীনি মিশন পরিচালনা করেছেন। রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শ ও কর্মনীতিকে সামনে নিয়ে এগুতে গেলে নারীকে পেছনে রাখার সুযোগ নেই।

দেশের মুসলিম সমাজে আলেম-উলামা ও ইসলামপন্থীদের একটা সমর্থন থাকলেও ভোটের রাজনীতিতে জনগণ ইসলামী দলগুলোকে খুব একটা সমর্থন করে না। তারপরও ইসলামী দলগুলো যে পরিমাণ ভোট পায়, তাতে তাদের প্রাপ্ত ভোটের অর্ধেকই নারীর ভোট, কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আরো বেশি হবে, যা অনুমান করা যায়; কিন্তু নারীকে গুরুত্ব না দিলে একটা পর্যায়ে নারীদের মধ্যে ভোটের রাজনীতিতে যে সমর্থন, সেটাও থাকবে না। কারণ, এক সময় দেশে শিক্ষার হার কম ছিল। সেই অল্পশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত নারীদেরকে ভুলিয়ে-বালিয়ে কিছুটা হলেও তাদের ভোট আদায় করা গেছে বা যাচ্ছে। যদি নারীদের নিয়ে কাজ না করা হয়, তাদেরকে যদি সুযোগ-সুবিদা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়; তাহলে দেখা যাবে নারীদের ভোট, সমর্থন ও সহযোগিতা থেকে ইসলামপন্থীগণ আস্তে আস্তে বঞ্চিত হবে। কারণ গ্রামীণ সহজ-সরল নারীদের একটা অংশ ইসলামী দলের প্রার্থীদেরকে ভোট দিলেও নারী শিক্ষার অগ্রগতির পর সেই ভোট ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

এক সময় যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতো, সে সময় ইসলামী বিভিন্ন দলের অনুগত ছাত্র সংগঠনের প্রার্থীরা ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রীদের ভোট খুব একটা পেতো না। গ্রামীণ সহজ-সরল নারীদের ছোট একটা অংশ ইসলামী দলকে ভোট দিলেও শিক্ষিত নারীরা মুখ ফিরিয়ে রাখতে চায়। এই যেমন বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠনে দেখা যায়, ইসলামপন্থী প্রার্থীরা নারীদের ভোট পায় না। শিক্ষকদের সংগঠন হোক, চিকিৎসকদের সংগঠন হোক কিংবা সাংবাদিকদের সংগঠন হোক; এসব সংগঠনের নারী সদস্যরা ইসলামপন্থী প্রার্থীদের খুব একটা ভোট দেয় না। ফলে বিষয়টিও মাথায় রেখে নারীদের মধ্যে কাজ বাড়াতে হবে। দলীয় ফোরামে নারীকে উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। আইনি বাধ্যবাধকতা কিংবা লোক দেখানোর কমিটিতে কিছু নারীর নাম রাখার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। নারীর মেধা ও যোগ্যতা থেকে ইসলামপন্থীগণও উপকৃত হতে হলে নারীকে দলে ও রাজনীতিতে গ্রহণ করতে হবে সংকীর্ণ মানসিকতা ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির উর্দ্ধে উঠে।

১০. নারীকে তার মতো কাজ করতে দেওয়া, রাজনীতির জন্য চাপ সৃষ্টি না করা

সবকিছুর পর নারী মাতৃত্বেই বেশি তৃপ্ত হয়। সমাজ, রাজনীতি, বহিঃস্থ কাজে অংশগ্রহণ, চাকুরী ইত্যাদি সবকিছুর পর সে মাতৃত্বেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সন্তানের মুখে সে অনাবিল আনন্দ খুঁজে পায়। ফলে রাজনৈতিক অধিকার

চর্চার চাইতে সংসার ও সন্তান লালন-পালনে নারীর গুরুত্ব বেশি দেওয়া উচিত। এতো আলোচনার পর এখন এমন কথা ও সুপারিশ সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। না, সাংঘর্ষিক নয়। রাজনীতি একটি অধিকার। সেই অধিকার থাকা এবং অধিকার চর্চার পক্ষে আলোচনা করেছি এবং এতে যে মানব সমাজ লাভমান হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অধিকার থাকলেই যে সেই অধিকার চর্চা করতে হবে, এমন তো কথা নয়। কারো বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হলে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের যে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার সে পেয়ে যায়। নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে সেই সুযোগ আদায় করে নেওয়ার জন্য যা করা দরকার তার সবই করা যায়। কিন্তু তাই বলে যে কারো বয়স ২৫ হলেই কি সে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে যাবে? অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; কিন্তু অধিকার সব সময় প্রয়োগ করতে না যাওয়াই উচিত। যদি কেউ অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকে, এই যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা সরকারী কোন কর্মকর্তা, তার কি উচিত হবে নির্বাচনে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক অধিকার উপভোগ করতে যাওয়া? এটা কেউ করতে যায় না। কারণ এটা করতে গেলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কিংবা সরকারী চাকুরী ত্যাগ করতে হয়। এমতবস্থায় নির্বাচনে বিজয়ী হতে না পারলে তার আমও যায়, ছালাও যায়।

একজন নারীকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত তার পরিবার, সংসার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি। রাজনীতি করতে গিয়ে যদি পরিবার ও সংসার নষ্ট হয়, সন্তানদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে এই রাজনীতি ওই নারীর জন্য উপকারী নয়। ইসলামে রাজনীতি করার অধিকার আছে বলেই যে রাজনীতি করতে হবে, এমন তো নয়। সন্তান, সংসার ইত্যাদি সামলানোর পর কিংবা এসব দায়িত্বের পরিধি শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রয়োজনে নারীকে রাজনীতিতে আসা দরকার যদি সে আসতে চায়। নিজের সন্তানকে দেখাশুনা করা, লালন-পালন করাটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সন্তানের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি কাজ একজন মা যতটুকু দেখভাল করতে পারেন, অন্য কেউ ততটা পারে না। তাই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার আগে পরিবারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্চনীয়।

উপসংহার

রাজনৈতিক অধিকারসহ নারীর সব ধরনের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। এসব অধিকার এবং সম্মান ও মর্যাদা নিয়েই জাহেলী যুগের অবসানে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে নারীর নবযাত্রা শুরু হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেসব অধিকার পুরোপুরী স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, কুরআন ও হাদীসের নারী সংক্রান্ত বাণীগুলোর ভুল অর্থ অনুধাবন, ভুলব্যাখা, অপব্যাখা ও ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নারীর সেই নবযাত্রা হোঁচট খায় এবং অধিকার ক্ষুন্ন হয়। ইসলামের বিভিন্ন অপব্যাখ্যার ফলে নারী বৈষম্যের শিকার হয়। ইসলাম, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণার পাশাপাশি স্বার্থপরতার কারণে মুসলিম সমাজে নারী-বিদ্ধেষের বীজ প্রসূত হয় এবং নারী-বিরোধি বিভিন্ন সামাজিক প্রথার প্রচলন ঘটে।

নারী ইস্যুতে অসম্ভবের কিছু নেই। কারণ, নারীকে ইসলাম-প্রদত্ত পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের দেশের মুসলিমদের মাঝে একটি অঘোষিত, নিরব ও যুগপৎ ঐক্য আছে। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকায় আলেম-উলামাগণ এটা স্বীকার করেন যে, ইসলাম নারীকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বয়ানে এটা তুলে ধরে আলেম-উলামাগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে আলেম-উলামা ও ইসলামপন্থীরা তাদের বোনদের পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার বুঝিয়ে দিতে সবার আগেই অপরাগতা প্রকাশ করেন এবং নানা সামাজিক প্রথা ও অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের বোনদেরকে ইসলাম প্রদত্ত উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। নারীকে তার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের দেশের আলেম-উলামা, আস্তিক-নাস্তিক, বুদ্ধিজীবি, মাতব্বর, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক সবার মাঝে একটা অঘোষিত ঐক্য আছে।

সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেউই তার বোনের অধিকার নিজ থেকে বুঝিয়ে দেয় না, এবং বোন সেই অধিকার চাইতে গেলে ভাইয়ের কাছে নানাভাবে অপদস্থ ও অপমানিত হয়। ইসলাম প্রদত্ত নারীর পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকার থেকে জোর করে এবং নানা সামাজিক প্রথা ও অজুহাতের মাধ্যমে বঞ্চিত রাখা হয়েছে নারীকে; আর ইসলাম প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকার এবং বিভিন্ন অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে ফতোয়া এবং কুরআন-হাদীসের ভুল ও অপব্যাখার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

দৈহিক কাঠামো, আকার-আকৃতি, রূপ-লাবণ্য এবং আরো বিভিন্ন দিক থেকে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকৃতি ও জীব জন্তুর জীবন প্রণালিতেও এই প্রভেদ দৃশ্যমান। এই পার্থক্য একান্তই সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত; অধিকারগত নয়। সৃষ্টির বৃহত্তর প্রয়োজনেই নর ও নারীর মধ্যে এই পার্থক্য সাধন করা হয়েছে। নারী সন্তান জন্ম দেয়, লালন-পালন করে, আদর-যত্ন-সোহাগ দিয়ে সেই সন্তানকে বড় করে; পুরুষ সেই নারীর ভরণ-পোষণ দেয়, সন্তানের আহার যোগায়, সেই সন্তান বড় হওয়ার প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণেরও যোগান দেয়। সৃষ্টির এই পার্থক্য আর কর্ম বিভাজনের ফলে নারীকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত থেকে রুখসত দেওয়া হয়নি; নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন উভয়ের জন্যই; সম্পত্তিতে অধিকার উভয়ের জন্যই; উভয়ই আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি; অতএব রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারও উভয়ের জন্যই। মানুষ হিসেবে নারী চিন্তায় ও কর্মে ভোগ করবে যুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতা।

পর্দা ইসলামের বিধান। পর্দা-হিজাবের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নারীকে অরবোধবাসিনী করার নাম ইসলাম নয়। হিজাব কেবলই একটি পোশাকের নাম নয়; হিজাব হলো একটি মূল্যবোধের নাম। হিজাব-নিকাব প্রথার উৎপত্তি হয়েছিলো অন্য সমাজে নারীর চলাফেরাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য; ইসলামের হিজাব সেই উৎপত্তিগত উদ্দেশ্যে নয়; শালীনতা বজায় রেখে নারী যাতে বাইরের জগতের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে, ইসলামের হিজাব সেই উদ্দেশ্যে। মুসলিম সমাজের অনেকে মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের হিজাবকে গ্রহণ করেছে, ইসলামের হিজাব নয়। ইসলামের হিজাব নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করে না, নারীকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, এমনকি যুদ্ধযাত্রা থেকেও বিরত রাখে না। হিজাব হোক শালীনতার পোশাক, অবরুদ্ধতার নয়; নারী-পুরুষ উভয়েই মেনে চলুক পর্দার বিধান, দৃষ্টিকে রাখুক সংযত; গ্রহণ করুক ইসলামের পর্দা প্রথার আসল উদ্দেশ্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে এক সময় বাংলাদেশও অনেক পিছিয়ে থাকলেও এখন ক্রমান্বয়ে উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু নারীর যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে, সেটা আশানুরূপ নয়। নানা প্রতিবন্ধকতা, সুযোগ-সুবিদার অভাব ও মানসিকতার কারণে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের গতি মন্তর। নারীকে রাজনীতিতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন, প্রয়োজন চিন্তার ক্ষেত্রে পরিশুদ্ধতা সাধন। এই মানসিকতা ও বোধ জাগাতে হবে যে, নারী তার কাজের মধ্য দিয়ে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে স্বাক্ষর রাখতে পারে এবং একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনেও ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নারীর অধিকার নিয়ে খুব একটা কাজ না হওয়ায় এবং ইসলামপন্থী ও আলেমসমাজ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকায় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নারীবাদ, নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি তথা নারী ইস্যুতে বেশি কাজ হচ্ছে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঠিকমতো বুঝে না পাওয়ায় কিংবা নারীকে ঠিকমতো বুঝিয়ে না দেওয়ায় পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নারী সোচ্চার হতে গিয়ে স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, নিজেকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকার ভোগের নামে প্রতারিতও হচ্ছে। এই অবস্থার অবসান সম্ভব ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীর পাওয়া অধিকার মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। রাসূল (সা.) এর সময়ে নারী যে অধিকার পেয়েছিল, সেটা বাস্তবায়িত হলে এবং সেই অনুযায়ী কাজ হলে মুসলিম সমাজের নারী পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হবে না অধিকারের জন্য; বরং ইসলামের দেওয়া নারীর অধিকার অন্যরা গ্রহণ করে আরো তৃপ্ত হবে।

একটি দেশ তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে, যখন দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উক্ত সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানের নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও কার্যকর প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হবে। কেননা একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারী সমাজকে সুবিধা বঞ্চিত রেখে দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূলত একটি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা, মনোভাবের প্রতিফলন, সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, উন্নয়ন কৌশল নির্মাণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ থাকা একান্ত বাঞ্চনীয়।

সুতরাং উপর্যুক্ত গবেষণার ফলাফল এ বলা যায় যে, ইসলামে নারীর রাজনীতি নিষিদ্ধ নয়; বরং এর বৈধতা রয়েছে। তবে নারীকে যথাযথ ও প্রকৃত পর্দা ব্যবস্থাপনা পরিপালনের মাধ্যমে বাইরের সকল কর্মে অংশগ্রহণ করতে হবে। সে সাথে পুরুষদের জন্যও পর্দা পরিপালন অত্যাবশ্যক। পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে। অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে তাকে নেতৃত্ব প্রদানের পথের বাঁধা অপসারণ করতে হবে, ইসলামে নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে। বাংলাদেশের নারীদেরও রাজনীতির অধিকার প্রদান করতে হবে, মুক্ত করতে হবে এ পথের সকল বাঁধা-বিপত্তি। তবেই নারী-পুরুষের মেধা ও নেতৃত্বের সমন্বয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে ওঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আকরাম খাঁ, মাওলানা মোহাম্মদ : *মোস্তফা-চরিত*
কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৯৭

২. আখতার, তাহমিনা : *মহিলা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৩. আজাদ, হুমায়ুন : *নারী*
আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

৪. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক : *বাঙালি নারী: সাহিত্যে ও সমাজে*
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০

৫. আলী, সৈয়দ আমীর : *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*
(ভাবানুবাদ: খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান)
জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, জ্ঞান বিতরণীর প্রথম সংস্করণ: ২০১২

৬. আলী, সৈয়দ আমীর : *আরব জাতির ইতিহাস*
(শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ অনূদিত)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৮

৭. আবু শুক্কাহ, আবদুল হালীম : *রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা*
(মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূদিত)
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

৮. আমীন, অধ্যাপক মুহাম্মদ রুহুল : *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব*
বাংলাদেশে ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯১

৯. আল-খাওলী, আল বাহী : ইসলামে নারী
দারুস সালাম বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৫

১০. আল কারযাভী, প্রফেসর ড. ইউসুফ : *আধুনিক যুগ: ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচী*
(মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী অনূদিত)
দি পাইওনিয়ার, ঢাকা, ২০১১

১১. আল বাদাবী, ড. জামাল : *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৭

১২. আল-উছাইমিন, শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ : *সমাজ সংস্কারে নারীর ভূমিকা*
(নুরুল ইসলাম অনূদিত)
শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী, ২০১২

১৩. আল মহল্লী, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ: *তাফসীরে জালালাইন*
(মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম অনুদিত)
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ২০১১

১৪. আল মাহমুদ : *নারী নিগ্রহ*
প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

১৫. আল-মাসুম, ড. মো. আব্দুল্লাহ : *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা: সমস্যা ও প্রসার*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

১৬. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান : *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*

Dhaka University Institutional Repository

আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫

১৭. আস্ সিবায়ী, ড. মুস্তাফা : *ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতায় নারী*
(আকরাম ফারুক অনূদিত)
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১ম সংস্করণ: ১৯৯৮

১৮. আসমা, ড. উম্মে : *জেন্ডার সমতা ও বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার*
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৩

১৯. আহমদ, মওদুদ : *কারাগারে কেমন ছিলাম (২০০৭-২০০৮)*
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৩

২০. আহমদ, মোশতাক : *ইসলাম ও অন্যসব ধর্মে নারী*
দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৪

২১. আহমদ, জাভেদ : *ইসলামে নারীর সামাজিক স্বাধীনতা* (পিএইচডি থিসিস)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮

২২. আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীন : *নারী নির্যাতনের রকমফের*
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ২০০১

২৩. ইব্নু কাসীর : হাফেজ ইমাদুদ্দীন *তাফসীর ইব্নে কাসীর*
(ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত)
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪

২৪. ইসহাক, ইবনে : *সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা.), ১ম খণ্ড*
(শহীদ আখন্দ অনূদিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০

২৫. ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল : *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

২৬. ইসলাম, সালমা : *নারীর ক্ষমতায়ন ও বিশ্ববাস্তবতা*
জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

২৭. উল্লাহ, সা'দ : *নারী: অধিকার ও আইন*
সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৩

২৮. উমরী, সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার : *ইসলামী সমাজে নারী*
(মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূদিত)
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ: ১৯৯৭

২৯. উসমানী, জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তাকি : *ইসলাম ও রাজনীতি*
(মাওলানা আব্দুল হালিম অনূদিত)
মাকতাবাতুল হেরা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬

৩০. উসমানী, জাস্টিস মুফতি মুহাম্মাদ তাকী : *পাশ্চাত্য নারীসমাজ ও ইসলাম*
(মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম অনূদিত)
বইঘর, ঢাকা, ২০১৮

৩১. ওবায়দী, মাওলানা ইসহাক : *যুগে যুগে নারী*
শান্তিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৩২.কবীর, রোকেয়া : *বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রা ও প্রতিবন্ধকতা*
ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

৩৩. কামাল, সুলতানা : *নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি*
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

৩৪.কেলি, রিটা মে ও মেরি বুটিলিয়ার : *রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়*
(নূরুল ইসলাম খান অনূদিত)
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১

৩৫. খানম, অধ্যাপিকা রাশিদা (সম্পাদিত): *সমাজ ও নারী*
এ এইচ ডেভেলাপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ২০১০

৩৬. খালেক, আব্দুল : *নারী*
দীনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৯

৩৭.খালেক, আবদুল : *নারী ও সমাজ*
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫

৩৮. চৌধুরী, নীরদচন্দ্র : *বাঙালী জীবনে রমণী*
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বাবিংশ মুদ্রণ: ১৪২১ বাংলা, কলকাতা (ভারত)

৩৯. জসীম, এহসানুল হক : *বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ*
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৯

৪০. জামান, ফেরদৌস : *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে (১৯৯১-২০০১) নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ* (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

৪১. জামিলা, মরিয়ম : *ইসলাম ও আধুনিক নারী*
(মোফাছ্ছেল আহমদ অনূদিত ও প্রকাশিত), ঢাকা, ১৯৯৬

৪২.জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ : *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা*
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ

৪৩.তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর: *তাফসীরে তাবারী*
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬

৪৪. দেব, চিত্রা : *ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল*
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯

৪৫.নিছা, মোছা: জীবন : *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা* (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭

৪৬.পানিপথী, কাযী ছানাউল্লাহ : *তাফসীরে মাযহারী*
(মাওলানা নাজিমুদ্দীন অনূদিত)
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, নারায়নগঞ্জ, ২০১২

৪৭. পাশা, ড. আব্দুর রহমান রাফাত : নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন
(মাওলানা মাসউদুর রহমান অনূদিত)

Dhaka University Institutional Repository

রাহনুমা প্রকাশণী, ঢাকা, ২০১২

৪৮.পুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা দাস ও উপমা দাস গুপ্ত: *নারী ও বাংলাদেশ*
সূচীপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

৪৯.ফরিদপুরী, আল্লামা শামসুল হক : *ধর্ম ও রাজনীতি*
বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

৫০.ফিরোজ, জালাল : *পার্লামেন্টারী শব্দকোষ*,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ: ২০১০

৫১.বুকাইলি, ড. মরিস : *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*
(আখতার উল আলম অনূদিত)
রংপুর পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা, ১৯৮৮

৫২.বেগম, রোকেয়া : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
(ড. মিজান রহমান সম্পাদিত)
কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২

৫৩. বেগম, মালেকা : *বাংলার নারী আন্দোলন*
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯

৫৪.বেগম, মাহবুবা : *নারীর ভূষণ*
আল-কুরআন গবেষণা সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯

৫৫.বেগম, মোয়াল্লিমা মোরশেদা : *আল-কুরআনে নারীদের ২৫ সুরা*
নারী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪

৫৬. বেগম, রওশন আরা : *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

৫৭.বেগম, রওশন আরা : *বাংলাদেশে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার ও ধর্মের অবস্থান: একটি বিশ্লেষণ* (পিএইচডি থিসিস)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

৫৮. বেগম, সাহিদা : *নারী অধিকার ও বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা*
ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ২০১৬

৫৯.বোভ্যয়ার, সিমোন দ্য : *সেকেন্ড সেক্স*
(ফয়সল মোকাম্মেল অনূদিত)
সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

৬০. মকসুদ, সৈয়দ আবুল : *বাঙালি জাতি, বাঙলি মুসলমান ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ*
সূচীপত্র, ঢাকা, ২০২০

৬১.মজিদী, নূর হোসেন : *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*
কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯

৬২.মর্গান, হেনরি লুই : *আদিম সমাজ*

৬৩. মান্নান, অধ্যাপক মোঃ আবদুল ও শামসুন্নাহার খানম মেরী: *নারী ও রাজনীতি*
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৬

৬৪.মীর, মোস্তফা (সম্পাদিত) : বেগম রোকেয়া রচনাবলী
বর্ণায়ন প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. মুরশিদ, গোলাম : *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*
প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ: ২০১৯

৬৬. মুরশিদ, গোলাম : *হাজার বছরে বাঙালি সংস্কৃতি*,
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৫

৬৭. মোহাম্মদ, আনু : *নারী, পুরুষ ও সমাজ*
সন্দেশ, ঢাকা, ২০০৫

৬৮. মোহাম্মদ, ড. হাসান : *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ : নেতৃত্ব, আদর্শ ও সংগঠন*
একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩

৬৯. মোস্তফা, গোলাম : *বিশ্বনবী*

৭০. রহমান, গাজী শামছুর : *হিন্দু আইনের ভাষ্য*
পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯

৭১. রহমান, ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর : *রাজনীতিতে আলিমসমাজের প্রভাব (বাংলাদেশ: ১৯৭২-২০০১)*
বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: ২০১৮

৭২. রহমান, ড. বিলকিস : *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৩

৭৩. রহমান, ড. মাহবুবা : *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৩য় সংস্করণ: ২০১০

৭৪. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর : *নারী*
খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ৮ম প্রকাশ: ২০০৮

৭৫. রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর : *নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা*
খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

৭৬. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩

৭৭. রশীদ, হারুনুর : *রাজনীতিকোষ*
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০০

৭৮. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ : *তফসীর মা'রেফুল-কোরআন*
(মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৭৯. শামিম, নাজমুল হুদা : *মানবাধিকার ও নারী অধিকার*
মুক্তচিন্তা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

৮০. শাহীন, ফেরদৌস আরা : *সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও নারী সমাজ*
প্রতিভা প্রকাশনী. ঢাকা, ২০১৬

৮১. সিদ্দিকা, ড. মোবার্‌রা : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের অবদান: হানা ক্যাথরিন ম্যলেন্স থেকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭

৮২. সুফী, মোতাহার হোসেন : *বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য*
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৬

৮৩. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান : *বেগম রোকেয়া*

Dhaka University Institutional Repository

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬

৮৪.হক, ড. আবুল ফজল : *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*
টাউন ষ্টোর্স, রংপুর, ২০০০

৮৫. হাই, আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল : *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*
*(*মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত)
নাকিব পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯তম প্রকাশ: ২০০৭

৮৬. হান্নান, শাহ আবদুল : *নারী ও বাস্তবতা*
এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

৮৭.হাশেমী, শাইখ আব্দুল মুনঈম : *আল কুরআনে নারীর কাহিনী*
(হাসান মুহাম্মাদ শরীফ অনূদিত)
মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা, ২য় প্রকাশ: ২০১৪

৮৮. হাসানউজ্জামান, ড. আল মাসুদ (সম্পাদিত): *বাংলাদেশের নারী: বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২

৮৯. হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *বিশ্বসেরা নারী*
উত্তরণ, পরিবেশক মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬

৯০.হাসান, মাওলানা রাকীব : *মহিলা সাহাবীদের সংগ্রামী জীবন*
জনতা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০২

৯১.হিশাম, ইবনে : *সীরাতুন নবী (সা.), প্রথম খণ্ড*
*(*সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ও সম্পাদিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২য় সংস্করণ: ২০০৮

৯২.হুদা, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল : *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*
আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা, ১৯৯৫

৯৩. হেমা, আসমা জাহান : *ইসলামের ছায়াতলে নারী*
আল-এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২

৯৪.হোসেন, শাহানারা : *ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী: রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৪

৯৫.হোসেন, সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত : *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন*
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ২০১২

৯৬.Ahmed, Moudud : *Democracy and The Challenge of Development: A Study of Political and Military Intervention in Bangladesh*
The University Press Limited, Dhaka, 1995

৯৭. Akbar, Mohammad Faisal : *Family Dominanance on Political Parties in Bangladesh: A Comparative Analysis*(M.Phil Thesis)
Political Science Dept, Dhaka University, 2019

৯৮.Bakhtyar, Dr Maryam : *Female Leadership in Islam*
Islamic Azad University, Iran, 2012

Dhaka University Institutional Repository

৯৯. Clinton, Hillary : *Living History*
Headline Book, London, 2003

১০০. Hitti, Philip : *History of the Arabs*
Sent Martin Press, London, 1951

১০১. Hilloowala, Yasmin : *Women's Role in Politics in the Medieval Muslim World*
The University of Arizona, 1969

১০২. Hannan, Shah Abdul : *Islam and Gender: The Bangladesh Perspective*
Bangladesh Institute of Islamic Thought, 2016

১০৩. Hashmi, Tajul Islam : *Women and Islam in Bangladesh*
Macmillan Press Ltd, New York, 2000

১০৪. Jahan, Rounaq : *Political Parties in Bangladesh: Challenges of Democratization*
Prothoma, Dhaka, 2015

১০৫. Lady, Rewben : *The Social Structure of Islam*
Cambrize University Press, London, 1971

১০৬. Nahar, Nazimun : *Women Empowerment in Local Government in Bangladesh: A Study of Keshabpur Upazila of Jessore District,* (M.Phil Thesis), Political Science Dept, Dhaka University, 2019

১০৭. Smith, Robartson : *Kinship and Marriage in Early Arab*
Cambrize University Press, 1903

১০৮. Wadud, Amina : *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*
Oxford University Press; 1999

১০৯. *ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা*, ঢাকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৪

১১০. উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, সংখ্যা-৩, ২০০০

১১১. *জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ সংখ্যা

১১২. *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা*, ঢাকা

১১৩. *লোকপ্রশাসন সাময়িকী*, একাদশ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৮, ঢাকা